বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয়

সনাতন গোস্বামী

শম্পা বুক হোম
৯ এণ্টনী বাগান লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

তৃতীয় সংস্করণ : এপ্রিল, ১৯৯৪

প্রকাশক :
শম্পা চক্রবর্ত্তী
৯ এণ্টনী বাগান লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রাপ্তিস্থান ঃ

দে বুক স্টোর
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭৩

পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

মহাজাতি প্রকাশন
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

মুদ্রণে :
শ্রীমুদ্রণ
১ খাসমহল রোড
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

এন. সি. চক্রবর্তী
৯ এণ্টনী বাগান লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, এম. এ., ডি. ফিল.

শ্রীচরণেষু—

ভূমিকা

অধ্যাপক শ্রীমান সনাতন গোস্বামী বৈষ্ণব তত্ত্ব ও সাহিত্য সম্বন্ধে এই গ্রন্থ রচনা করেছেন মানসিক আরাম উপভোগের জন্য। কিন্তু এটি অনেকাংশে তত্ত্বাশ্রয়ী হওয়ার ফলে জিজ্ঞাসু পাঠকও এর থেকে আশানুরূপ তত্ত্বরস দোহন করে নিতে পারবেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্য নানাদিক দিয়ে বাঙালীর এক প্রকার মৌলিক ধ্যান-ধারণা বলে গৃহীত হলেও লেখক প্রাচীন বৈদিক সংহিতা থেকে শুরু করে পৌরাণিক ও উত্তর-পৌরাণিক ঐতিহ্য ও ধর্মসাধনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে আদি রসাশ্রিত ভক্তিসাধনার উৎস ও প্রবাহের ঐতিহাসিক বিবর্তন নির্দেশ করেছেন। বৈষ্ণবধর্মকে বাদ দিয়ে বৈষ্ণবসাহিত্যের আলোচনা সম্ভব নয় এবং শুধুমাত্র শিল্পরসভোগের মানদণ্ডে বাংলার বৈষ্ণবসাহিত্য বিচারযোগ্য নয়। এর সঙ্গে দু-তিন হাজার বছরের যে বিশেষ ধরণের জীবন-চেতনা ও পারমার্থিক রসসাধনার সংযোগ রয়েছে, লেখক সংক্ষেপে সেই ধারাবাহিকতার মৌলিক স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেছেন। এই অংশে ফুটনোট কণ্টকিত "দুর্দান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্তের" বাহ্বাস্ফোট দেখাবার সুযোগ ছিল। কিন্তু লেখক গবেষক হবার অনিবার্য প্রলোভন দমন করে সহজভাবে বৈষ্ণব দার্শনিকতা, রসতত্ত্ব ও কাব্যকথার যে নিপুণ পরিচয় দিয়েছেন, তার জন্য তাকে অভিনন্দিত করি এবং একদা তিনি আমার ছাত্র ছিলেন, এজন্য গৌরব বোধ করি।

লেখক গ্রন্থটির নাম দিয়েছেন 'বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয়'। বাংলার প্রাক্‌চৈতন্য ও উত্তর-চৈতন্য বৈষ্ণব পদাবলীর কায়া ও কান্তি বিশ্লেষণ তাঁর মূল উদ্দেশ্য। সুতরাং প্রসঙ্গক্রমে তিনি যাবতীয় বৈষ্ণবরসগ্রন্থ বিশ্লেষণ করেছেন, বৃন্দাবনের চৈতন্য পরিকরদের গ্রন্থাদি তাঁকে এ বিষয়ে দীপবর্তিকার মতো সাহায্য করেছে। বৈষ্ণবপদের শুধু কাব্য-সৌন্দর্য ব্যাখ্যা নয়, তার তাত্ত্বিক দিকটিও উপেক্ষিত হয় নি। আবেগের জল মিশিয়ে ও বিস্ময়ের শর্করা সংযোগ করে তিনি বৈষ্ণব কবিতাকে নিছক রোমান্টিক ও ভূতলচারী মর্ত্যমানসিকতার গজকাঠি দিয়ে মাপতে পারতেন এবং তাতে সাধারণ পাঠকসমাজ খুশীও হত। কিন্তু আনন্দের কথা, তিনি সে সহজিয়া পথ পরিত্যাগ করে অকারণে দুরূহকে লঘু করতে চাননি। বস্তুতঃ বৈষ্ণবকাব্যের তত্ত্ব ও কাব্য—দুটির মধ্যে সমানুপাতিক সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়েছে বলে গ্রন্থখানি পাঠক সমাজে স্বীকৃতি পাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

যাঁরা নখদর্পণে আকাশের প্রতিফল দেখতে চান এবং বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর স্বাদ পেতে চান, তাঁরা এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি একটু নেড়েচেড়ে দেখতে পারেন। হয়তো ছাত্রসমাজ এর লক্ষ্য, কিংবা নয়। কিন্তু এর দ্বারা অনেক জিজ্ঞাসু অ-ছাত্র ব্যক্তিও যে উপকৃত হবেন, এ বিষয়ে আমি দৃঢ়নিশ্চয়। লেখকের গ্রন্থখানি রসিকজনের প্রীতি আকর্ষণ করুক এই কামনা জানাই।

ইতি—

শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

২৩।৭।৭৩

সূচীপত্র

বিষয়-সূচী — পৃষ্ঠাঙ্ক

বৈষ্ণবধর্মের গোড়ার কথা — — ১—১২

বাংলার বৈষ্ণবধর্ম : প্রাক্‌চৈতন্য যুগে — ১৩—১৬

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের তাৎপর্য — ১৭—২৪

(বহিরঙ্গ কারণ ১৭—১৯, অন্তরঙ্গ কারণ ১৯, চৈতন্য স্বরূপ ১৯—২০, স্বরূপের শ্লোকে তিন কারণের উল্লেখ ২১, রাধা-প্রেমের তাৎপর্য ২১—২১, প্রথম অন্তরঙ্গ কারণ ২১, দ্বিতীয় কারণ ২২, তৃতীয় কারণ ২৩, দিব্যোন্মাদ অবস্থায় চৈতন্যদেব ২৪।)

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের মূলসূত্র — — ২৫—৪০

(কৃষ্ণতত্ত্ব ২৫, গোপীতত্ত্ব ২৬, রাধাতত্ত্ব ২৭, প্রেমতত্ত্ব ২৮, প্রেমবিলাস বিবর্ত ২৯, ভক্তিতত্ত্ব ৩০, শক্তিতত্ত্ব ৩২, সাধ্য-সাধনতত্ত্ব ৩৩, অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব ৩৬, পুরুষার্থ ৩৬, জীবতত্ত্ব ৩৬, সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্ব ৩৮।)

প্রেমতত্ত্ব — ৪০—৪৫

ভক্তির তাৎপর্য ৪০, শুদ্ধভক্তি থেকে প্রেমের উৎপত্তি ৪১, কৃষ্ণপ্রীতির স্তরভেদ—প্রেম ৪২, স্নেহ ৪৩, মান ৪৩, প্রণয় ৪৩ রাগ ৪৩, অনুরাগ ৪৪, ভাব ৪৪, মহাভাব ৪৪, দিব্যোন্মাদ ৪৫।

ভক্তিরস — — ৪৬—৫৪

রস কি ৪৬, ভক্তিরসের রসতাপত্তি ৪৬, রস ও ভাবের পার্থক্য ৪৬, দেবাদিবিষয়ারতির রসত্ব হয় কি ভাবে ৪৭, আনন্দই রস ৪৭, লৌকিক রতি কেন রস হয় না ৪৮, ভক্তিরসের সংজ্ঞা ৪৯, মুখ্য ও গৌণ ভক্তিরস ৫০, পঞ্চরস—শান্ত ৫০, দাস্য ৫১, সখ্য ৫১, বাৎসল্য ৫২, মধুর ৫২, সাধারণী, সমঞ্জসা ও প্রৌঢ়া মধুরা রতি ৫৩, মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্‌ভা ৫৩, বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ ৫৪, এদের ভেদ ৫৪।

ভক্তিরসের উপাদান — ৫৫—৫৭

রসের স্বরূপ ৫৫, রসনিষ্পত্তি ৫৫, শ্রীকৃষ্ণই আস্বাদ্য ও আস্বাদক ৫৫, রসই আনন্দ ৫৫, ভক্তিরসের স্বরূপ ৫৫, বিভাব-আলম্বন ও উদ্দীপন ৫৬, অনুভাব ৫৬, সাত্ত্বিক ভাব ৫৬, ব্যভিচারী ভাব ৫৭।

নায়কভেদ — ৫৮—৬০

নায়ক স্বরূপ ৫৮, নায়ক চার প্রকার — ধীরোদাত্ত ৫৮, ধীরললিত ৫৮, ধীরোদ্ধত ৫৯, ধীরশান্ত ৫৯, পতি ও উপপতি ৫৯, অনুকূল, শঠ, দক্ষিণ ও ধৃষ্ট ৫৯-৬০, নায়ক সংখ্যা ৬০।

নায়ক-সহায় ভেদ — ৬১—৬৩

সংজ্ঞা ও গুণ ৬১, পঞ্চ সহায়—চেট, বিট, বিদূষক, পীঠমর্দ ও প্রিয়নর্মসখ্যা ৬৩।

নায়িকা প্রকরণ — ৬৪—৮৩

স্বকীয়া ও পরকীয়া ৬৪, শ্রেষ্ঠ আট জন ৬৫, কন্যকা ও পরোঢ়া ৬৪, সাধনপরা, দেবী ও নিত্যপ্রিয়া ৬৫, শ্রীরাধা ৬৬, রাধার পাঁচ প্রকার সখী ৬৭, নায়িকা কাকে বলে ৬৮, মুগ্ধা মধ্যা ও প্রগল্ভা নায়িকা ৬৮, ধীরা, অধীরা ও ধীরাধীরা নায়িকা ৬৮, মধ্যা নায়িকাই শ্রেষ্ঠা ৬৯, অষ্ট নায়িকা—অভিসারিকা ৭০, বাসকসজ্জিকা ৭৪, উৎকণ্ঠিতা ৭৫, বিপ্রলব্ধা ৭৬, খণ্ডিতা ৭৮, কলহান্তরিতা ৭৯, প্রোষিতভর্তৃকা ৮১, স্বাধীনভর্তৃকা ৮১, নায়িকা সংখ্যা ৮৩।

নায়িকার দূতীভেদ — ৮৪—৮৫

স্বয়ংদূতী ও আপ্তদূতী ৮৪, স্বাভিযোগ—বাচিক, আঙ্গিক ও চাক্ষুষ ৮৪, আপ্তদূতী—অমিতার্থা, নিসৃষ্টার্থা, পত্রহারী ৮৪, সখী ৮৪, সখী ও মঞ্জরীর পার্থক্য ৮৫।

মধুর বা শৃঙ্গার রসভেদ — ৮৬—৯৭

মধুর রসের উপাদান ৮৬, বিপ্রলম্ভ—পূর্বরাগ ৮৬, মান ৯১, প্রেমবৈচিত্ত্য ৯৪, প্রবাস ৯৫, সম্ভোগ ৯৬।

পদাবলীর রসপর্যায় — ৯৮–১১৬

...ংপর্ব ৯৮, গৌরচন্দ্রিকা ৯৮, বাল্যলীলা ১০২, আক্ষেপানুরাগ ১০৫, নিবেদন ১০৮, মাথুর ১১০, ভাবসম্মিলন ১১২, প্রার্থনা ১১৫।

কবি-পরিচিতি — ১১৭–২০৯

চণ্ডীদাস ১১৭, বিদ্যাপতি ১৫২, জ্ঞানদাস ১৭১, গোবিন্দদাস ১৯০।

পদাবলীর নানাদিক — ২১০–২৪৫

তত্ত্বের রসপ্রকাশ ২১১, প্রাক্, সমসাময়িক ও পরচৈতন্য বৈষ্ণব পদাবলীর তুলনা ২১২, রোমান্টিকতা ও বৈষ্ণব কবিতা ২১৮, লীলাশুক ও বৈষ্ণব কবি ২১৬, ছন্দ ২১৯, অলঙ্কার ২২১, গীতিকবিতা ২৩২, গীতিনাট্য ২৩৭, সমুদ্রগামী নদীর ন্যায় ২৩৮, ব্রজবুলি ২৪০, কীর্তন ২৪৪।

॥ বৈষ্ণব ধর্মের গোড়ার কথা ॥

১

ধর্ম মানবের অতি মৌল বিশ্বাস। আদিম প্রভাতে এই বিরাট সৃষ্টিবৈচিত্র্যের দিকে দিকে তাকিয়ে বিস্মিত মানুষ এই অপার কর্মকাণ্ডের পিছনে কোন মহাশক্তির লীলা অনুভব করেছিল। প্রাচীন মানুষ সমুন্নত শক্তির অসীম বৈচিত্র্যের অন্তরালে দেবতার অস্তিত্ব কল্পনা করেছে। কখনো মূর্তির মাধ্যমে দেবতার রূপ বিধৃত হয়েছে। কখনো বা অমূর্ত দেব-মহিমাকে নানা সূক্তের মাধ্যমে প্রকাশের চেষ্টা দেখা গেছে। মানব সেই দেববাচক মহান শক্তির সন্তুষ্টি বিধানের জন্য দিত আহুতি, উচ্চারণ করত নানা স্তুতিমূলক সূক্ত। জ্ঞান, কর্ম, ভক্তির ত্রিবিধ চেতনার পথে সেই পরম সত্তার অস্তিত্বকে জানার আগ্রহ-ই নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে। জ্ঞানের দ্বারা দেবতার অস্তিত্ব অনুভব করে তার সন্তুষ্টির জন্য কর্মের পথে দিত আহুতি, আর ভক্তির পথে চলত পরমস্বরূপের মহিমার উপলব্ধি, তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ। আর্যমানব বিভিন্ন দেবতার কাছে শরণ নিয়েছে। বেদে তিন স্তরের দেবতা কল্পিত হয়েছে—ভূলোক, দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষের। পৌরাণিক যুগে দেবতাসংখ্যা দাঁড়িয়েছে তেত্রিশ কোটিতে। কিন্তু সে অন্য কথা।

বিষ্ণুকে অবলম্বন করে বৈষ্ণব ধর্মের গোড়াপত্তন। বিষ্ণু দ্যুলোকের অন্যতম দেবতা। অবশ্য বৈষ্ণব অর্থে প্রথমে কোনো ধর্মসম্প্রদায়কে বোঝাতো না। বাজসনেয়ী সংহিতা, তৈত্তিরীয় সংহিতা, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, শতপথ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি গ্রন্থে বৈষ্ণব অর্থে 'বিষ্ণুর আশ্রিত' (belonging to Visnu)। কোন ধর্মসম্প্রদায় অর্থে গীতাতেও শব্দটি প্রযুক্ত হয় নি, হয়েছে মহাভারতে। স্বর্গারোহণ পর্বের ৬/৯৭ শ্লোকে বলা হয়েছে—

'অষ্টাদশপুরাণানাং শ্রবণাৎ যৎ ফলং ভবেৎ।
তৎ ফলং সমবাপ্নোতি বৈষ্ণবোনাত্র সংশয়ঃ ॥'

—অষ্টাদশ পুরাণগুলি শ্রবণ করলে যে পুণ্যফল লাভ হয়, সেরূপ ফল বৈষ্ণবও পান। এই শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত বলে অনেকে মনে করেন। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর কয়েকটি লেখ ও মুদ্রায় বৈষ্ণব নামটির উল্লেখ পাওয়া যায় ('পরম বৈষ্ণব')। বিষ্ণু থেকে উদ্ভূত 'বৈষ্ণব' শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায় পঞ্চম খৃষ্টাব্দের কয়েকটি লেখ ও মুদ্রায়। গুপ্তরাজগণ 'পরম ভাগবত' উপাধি গ্রহণ করেন।

বেদে বিশিষ্ট পারিভাষিক অর্থে ভক্তি শব্দটি উল্লিখিত হয় নি। তবু ভক্তির ভাবটি কোন কোন সূক্তে অনুভব করা যায়। বেদের মন্ত্রে দেবতাদের উদ্দেশ্যে উক্ত প্রার্থনায় কোন কোন ক্ষেত্রে দেবতার প্রতি ভালোবাসার সুরও অনুরণিত। ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে ইন্দ্রকে স্বাদু ও প্রণীতি অর্থাৎ প্রণয়-আনন্দদায়ক বলা হয়েছে। (৮।৬৮।১১)—'যস্য তে স্বাদু সখ্যং স্বাদ্বী প্রণীতিরদ্রিবঃ।' আর একটি সূক্তে (১০।৪৩।১-২) ইন্দ্রের সহিত মিলনের

আকাঙ্ক্ষায় পতি-পত্নীর মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। আর একটি সূক্তে (৭।৮৬।২-৪) বরুণ স্তুতিতে ভক্তের আকুতিতে প্রেমিকার অনুভূতি লক্ষিত হয়।

বেদে ভক্তির আভাস সামান্যই পাওয়া যায়। কিন্তু উপনিষদের যুগে ভক্তির লক্ষণ বিশিষ্ট রূপ পায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে যে, প্রিয়া স্ত্রীর দ্বারা আলিঙ্গিত হয়ে যে বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদহীন সুখানুভূতি, পরম পুরুষের দ্বারা আলিঙ্গিত হয়েও সেরূপ বাহ্যজ্ঞানহীন অনুভূতি লাভ করা যায় (৪।৩।২১)। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে—'রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।' (২।৭)—তিনিই প্রেমময় এবং সেই প্রেমময়কে লাভ করে সকলেই আনন্দিত হয়। 'ভক্তি' কথাটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের শেষ শ্লোকে (৬।২৩)। শ্লোকটি এই—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থা প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

—দেবতাতে (অর্থাৎ পরমেশ্বরে) যার পরম ভক্তি আছে, এবং পরমেশ্বরে যেরূপ, গুরুতেও সেরূপ (ভক্তি আছে)। পূর্ব কথিত শাস্ত্রসমূহ সেই মহাত্মার নিকটই প্রকাশ পায় (অন্য কাহারো নিকটে নয়)।

বিভিন্ন উপনিষদে ভক্তিমূলক উপাসনার কথা রয়েছে। তাই ভক্তিধর্ম যে শুধু পৌরাণিক যুগের সৃষ্টি এ বিষয়ে দ্বি-মত রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেন—"ব্রহ্মবিদ্যার আনুষঙ্গিকরূপেই ভারতবর্ষে প্রেমভক্তির ধর্ম আরম্ভ হয়।" গবেষকের মতে—"Thus the cult of bhakti is adumbrated in the Vedic hymns and partly developed in the Upanisads. It blossoms forth in the epics and later devotional literature, it is not satisfied with the impersonal Bhrahman of the Upanisads but converts Brahman into the Personal God or Isvara." (The Cultural Heritage of India, Vol IV, P. 146)।

বৈষ্ণব ধর্মের একটি বৈশিষ্ট্য—নামে বৈষ্ণব ধর্ম হলেও, আসলে তা কৃষ্ণকথা। এর কারণ, প্রথমস্তরে, বিষ্ণুকে অবলম্বন করে বৈষ্ণব ধর্মের বিকাশ। দ্বিতীয় স্তরে, কৃষ্ণ বিষ্ণুর অংশাবতার বলে পরিগণিত হন। তৃতীয় স্তরে, কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। অন্যরা তাঁর অংশ মাত্র। বাসুদেব, ভগবত প্রভৃতি তাঁরই নামভেদ মাত্র। অতএব, সমস্ত মাধুর্যের ভগবত্ত্বাসার, রসিকশেখর, পরমকরুণ কৃষ্ণকথার ইতিবৃত্ত রচনার প্রচেষ্টায় আমাদের উজিয়ে যেতে হবে প্রথমে বিষ্ণুকাহিনীতে।

ভক্তির তাৎপর্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—'সত্তাবিশেষের প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসা সমন্বিত তীব্র আকর্ষণমূলক মনোবৃত্তি'। বৈদিক যুগে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান ধর্মক্রিয়ার বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল বলে ভক্তিসাধনা সম্যক্ স্ফূর্তিলাভ করে নি। কারো কারো মতে, ভক্তিবাদের মূল অনার্য সমাজসম্ভূত। বৈদিক ধর্মাচরণের সঙ্গে এই ধারা মিলিত হয়ে বিস্তৃততর ও গভীরতর হয়। ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত ঃ

"ভক্তিকেন্দ্রিক ধর্মসম্প্রদায়গুলি সাধারণতঃ কোনও বৈদিক দেবতাবিশেষকে আশ্রয় করিয়া আত্মপ্রকাশ করে নাই। শিব ও যক্ষনাগাদি লৌকিক দেবতাগোষ্ঠী বা বাসুদেব, কৃষ্ণ প্রভৃতি মনুষ্যপ্রকৃতি দেবতানিচয়কে কেন্দ্র করিয়াই এই সকল উপাসকমণ্ডলী ক্রমশঃ গঠিত হয়।"

২

ঋগ্বেদের পাঁচ ছয়টি সূক্তে বিষ্ণুর উল্লেখ। তিনি প্রধান দেবতা হলেও প্রধানতম দেবতা নন। তবে 'বিষ্ণু' এই নামের মধ্যেই তাঁর শক্তিমত্তার পরিচয় নিহিত। ম্যাকডোনেলের মতে, "The name is most probably derived from Vis, 'be active', thus meaning 'the active one." আদিত্য-বিশেষ বিষ্ণু তাঁর ত্রিপদ দ্বারা সমগ্র জগত ব্যাপ্ত করে আছেন।

বিষ্ণোর্নু' কং বীর্যাণি প্র বোচং
যঃ পার্থিবানি বিমমে রজাংসি।
যো অস্কভায়দুত্তং সধস্থং
বিচক্রমাণস্ত্রেধোরুগায়ঃ ॥

—'আমি এখন বিষ্ণুর মহাশক্তির কথা বলব, যিনি পৃথিবী-মণ্ডল ব্যাপ্ত করেছেন, যিনি ব্যাপ্ত করেছেন গগনমণ্ডল তাঁর তিনপদ দ্বারা।' বেদে বিষ্ণু ত্রিবিক্রম, উরুক্রম, উরুগায় -প্রভৃতি নামে পরিচিত। যিনি বিস্তৃত ভাবে বিচরণশীল—তিনিই উরুক্রম, উরুগায়।

বিষ্ণুর তৃতীয় পদ সম্পর্কে বলা হয়েছে, প্রজ্জ্বলিত অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল সেই পদস্থলে দেবতার আবাস। আচমন মন্ত্রে :

ওঁ বিষ্ণু তদ্বিষ্ণু পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্ ॥

—সেই বিষ্ণুর পরমপদ আকাশে বিস্তৃত চক্ষুর ন্যায়, সূরগণ যা সর্বদা দর্শন করেন।

ঋক্ সংহিতার অন্যত্র বলা হয়েছে :

ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং।
সমূঢ়মস্য পাংসুরে ॥ ১।২২।১৭

—বিষ্ণু জগতে তিন পদ বিক্ষেপ করেন। সমগ্র জগত তাঁর ধূলিময় পদ দ্বারা ব্যাপ্ত হ'য়ে আছে। যাস্ক তাঁর 'নিরুক্তে' ঔর্ণনাভ মুনির উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। ঔর্ণনাভের মতে, বিষ্ণু সূর্য ; তাঁর ত্রিপাদ বিক্ষেপ সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যা বোঝায়। 'শতপথ ব্রাহ্মণে' বলা হয়েছে, ধনুর্ছিলার আঘাতে বিষ্ণুর ছিন্নমস্তক সূর্যরূপে প্রতিভাত। ঋগ্বেদে বিষ্ণুর এক নাম শিপিবিষ্ট (surrounded with rays)। বিষ্ণুর নব্বইটি ঘোড়া ; প্রত্যেকটির আবার চারটি করে নাম। এ থেকে বছরের ৩৬০ দিন ও চারটি ঋতুর সন্ধান পাওয়া যায়। এ থেকে বোঝা যায় যে, বিষ্ণু সূর্য অথবা সূর্যশক্তি সম্পন্ন।

বেদে বিষ্ণুর অন্য পরিচয়—তিনি ইন্দ্রের সখা ; ইন্দ্রের সঙ্গে তাঁর নাম যুক্ত করে বলা হোত—ইন্দ্র-বিষ্ণু।

পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, সূর্যই বেদোক্ত বিষ্ণুর রূপ কল্পনার মূল উৎস। সূর্য আদিত্য অর্থাৎ অদিতির পুত্র। আদিত্যসূর্য ঋগ্বেদে সপ্ত, অষ্ট বা অসংখ্য নামে কল্পিত হয়েছেন। বিষ্ণু তেমন একটি নাম। বেদে বিষ্ণু ত্রিবিক্রম, উরুক্রম, উরুগায় নামে পরিচিত। এর অর্থ-যিনি চিন্তিতভাবে বিচরণশীল। বস্তুত 'ত্রেধা নিদধে পদং' অর্থাৎ তিনবার পদক্ষেপের কল্পনায় সূর্যের ত্রিপোদবিক্ষেপের কথাই বলা হয়েছে। এই ইংগিত থেকেই আবার বামনরূপী বিষ্ণুর কল্পনা। 'শতপথ ব্রাহ্মণে' বামনরূপী বিষ্ণুর কাহিনী আছে। তিনি কৌশলে অসুরদের কাছ থেকে স্বর্গ, মর্ত, পাতাল অধিকার করেন। পরবর্তীকালে পুরাণের বামনরূপী বিষ্ণু কর্তৃক বলিকে ছলনার কাহিনী এখান থেকে এসেছে। আবার ধনুকের ছিলা দ্বারা বিষ্ণুর মস্তক ছিন্ন হওয়ার কাহিনী পরবর্তী কালে কৃষ্ণের প্রয়াণ কাহিনীর মূল-স্বরূপ। এ ছাড়া শতপথ ব্রাহ্মণে বিষ্ণু, আদিত্য ও যজ্ঞ অভিন্নরূপে কল্পিত হয়েছেন। 'স যঃ স বিষ্ণুর্যজ্ঞঃ স। স যঃ স যজ্ঞো'সৌ স আদিত্যঃ'—যিনি বিষ্ণু তিনিই যজ্ঞ এবং যিনি যজ্ঞ, তিনিই আদিত্য।

উপনিষদে ধর্ম চেতনার বিবর্তন ঘটল। বেদে যখন যে দেবতার বন্দনা করা হয়েছে, তখন সেখানে সেই দেবতাই প্রাধান্য পেয়েছেন। অবশ্য ঋগ্বেদে এক সত্তার অস্তিত্ব চেতনার অস্ফুট প্রকাশও লক্ষ্য করা হয়। উপনিষদে পরমপুরুষ এক এবং অদ্বিতীয়-ও বটেন। তিনি হলেন ব্রহ্ম। অন্যান্য দেবতা এই ব্রহ্মেরই শক্তি। তিনি অজর, অক্ষর ;—মহাজাগতিক বস্তুনিচয়ে তাঁরই প্রকাশ। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে, অল্পে সুখ নেই ; ভূমাই সুখ। বৃহদারণ্যক উপনিষদ বলেন, ব্রহ্ম হচ্ছেন বিজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ। তৈত্তিরীয় উপনিষদের বক্তব্য : 'সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্ ব্রহ্ম।' উপনিষদের এই দর্শন সম্পর্কে একটু কৌতূহলী হওয়ার দরকার এজন্য যে, পরবর্তীকালে বৈষ্ণব দর্শনে কৃষ্ণই ব্রহ্ম, তিনিই ভূমাস্বরূপ—এই তত্ত্ব ব্যক্ত হয়েছে।

বিষ্ণুপুরাণে এসে উপনিষদের ব্রহ্ম ও পুরাণের বিষ্ণু অভেদরূপে প্রতিপাদিত হলেন। উপনিষদের মূল বক্তব্য—ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়। বিষ্ণুপুরাণেও বলা হোল—বিষ্ণুর থেকে এ জগতের উৎপত্তি ; জগত তাঁতেই সংস্থিত , তিনিই জগতের নিয়ন্তা ; তিনিই জগত।

বিষ্ণোঃ সকাশাৎ সম্ভূতং জগৎ তত্রৈব সংস্থিতম্।
স্থিতিসংযমকর্তাসৌ জগতোঽস্য জগচ্চ সঃ॥ ১।১।৩৫

বিষ্ণুপুরাণে বিষ্ণুর মহিমা বিষয়ে প্রবক্তা পরাশর বলেন, হিরণ্যগর্ভ, হরি, শঙ্কর, বাসুদেব, অচ্যুত, পুরুষোত্তম, নারায়ণ, ব্রহ্ম প্রভৃতি বিষ্ণুর বিভিন্ন নামভেদ মাত্র। বিষ্ণু এক, অনন্ত, শাশ্বত, অপরিবর্তমান, সর্বব্যাপী, পরমাত্মাস্বরূপ। ভাগবতপুরাণে বিষ্ণুর মহিমা আরো ব্যাপকভাবে কীর্তিত হোল। তবে তার আগে বিষ্ণু, কৃষ্ণ, নারায়ণ, বাসুদেব, ভগবত—ইত্যাদি নামগুলির পারস্পরিক সংযোগ নিয়ে কিছু আলোচনা করা দরকার।

৩

কৃষ্ণের এক নাম বাসুদেব। এ নামটিও প্রাচীন বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন। পালিগ্রন্থ 'নিদ্দেশে' বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের সঙ্গে বাসুদেব উপাসনারও উল্লেখ আছে। এতে

বোঝা যায় যে, এ গ্রন্থ রচিত হওয়ার আগেই এ উপাসনা জনসমাজে প্রচলিত ছিল। পানিনি'র সূত্রে বাসুদেবের ভগবত্তা বিশ্বাসের কথা আছে। তাঁর অনুগামী সম্প্রদায়কে তিন বাসুদেব বলে উল্লেখ করেন। পতঞ্জলি পাণিনী সূত্রের ভাষ্য রচনাকালে মন্তব্য করেছেন :

'অথবা নৈষা ক্ষত্রিয়াখ্যা সংজ্ঞেষা এর ভগবতঃ—অথবা এ ক্ষত্রিয়ের নাম নয়, ভগবানের নাম।' তাহলে পাণিনির আগে থেকেই বাসুদেবের উপাসনা প্রচলিত ছিল, এ সিদ্ধান্ত করা যায়। ভাণ্ডারকরের সিদ্ধান্ত—খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে অন্ততঃ এ সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল। কয়েকটি শিলালিপি থেকেও এ সিদ্ধান্ত বলবৎ হয়। রাজপুতানার ব্রাহ্মী অক্ষরে উৎকীর্ণ ঘোষাণ্ডী লিপিতে (২০০—১৫০ খৃঃ পূঃ) বাসুদেব ও সঙ্কর্ষণের মন্দিরের উল্লেখ পাওয়া যায়। আনুমানিক ২০০ খৃঃ পূঃ বেসনগর লিপিতে উল্লেখ আছে, দিয়ারপুত্র হেলিওডোরাস নিজেকে 'পরম ভাগবত' আখ্যা দেন। তিনি গরুড়ধ্বজ প্রতিষ্ঠা করেন। বৈষ্ণবধর্মের ইতিহাস অনুসন্ধানে এই গরুড়ধ্বজ এবং ব্রাহ্মী অক্ষরে উৎকীর্ণ লিপির গুরুত্ব অত্যধিক। সাত্বত ধর্মের মূল আদি সত্তা বৈদিক বিষ্ণু নন, তিনি সাত্বত বা বৃষ্ণিবংশসম্ভূত ভগবান বাসুদেব কৃষ্ণ। ইনি ঐতিহাসিক পুরুষ—জীবদ্দশায় ধর্মস্থাপন এবং পরবর্তীকালে দেবতাজ্ঞানে পূজিত। ঐকান্তিক শব্দের অর্থ বাসুদেব-কৃষ্ণে একান্ত ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণ। শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় এই ঐকান্তিক ভক্তের উল্লেখ আছে। বাসুদেব-কৃষ্ণ তাঁর প্রিয় সখা অর্জুনকে এই মতাবলম্বী হ'তে বলেছেন—"মন্মনা ভব মদ্ভক্ত মদ্যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়হসি মে॥" নারদ-পাঞ্চরাত্রেও এই একায়ন বা ঐকান্তিক ভক্তদের সম্পর্কে বলা হয়েছে—"মোক্ষণ্যায় বৈ পন্থা এতদন্যো ন বিদ্যতে। তস্মাৎ একায়নং নাম প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥" খৃঃ পূঃ ১০০ অব্দে নানাঘাট শিলালিপিতে অন্যান্য দেবতার সঙ্গে বাসুদেব ও সঙ্কর্ষণের উল্লেখ আছে। দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দে বাসুদেব নামে যে রাজা রাজত্ব করেন, তাঁর নামাঙ্কিত কতকগুলি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। অক্ষয়কুমার দত্ত মনে করেন যে, পূর্বপ্রচলিত বাসুদেব নামানুসারে ঐ রাজার অনুরূপ নাম রাখা হয়। ঘটজাতকে বাসুদেবের গল্প আছে। গীতায় কৃষ্ণ নিজেকে বৃষ্ণিবংশজাত বাসুদেব বলেছেন— 'বৃষ্ণিনাং বাসুদেবোঽস্মি।' মহাভারতের শান্তিপর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, ভাগবতধর্মের প্রবর্তক স্বয়ং সূর্য—'সাত্বতম্ বিধিমাস্থায় প্রাক সূর্যমুখ-নিঃসৃতম্। (১২।৩৩৫।১৯)। ডঃ রায়চৌধুরীর মতে, দেবকীপুত্র ও ঘোর আঙ্গিরস-শিষ্য বাসুদেব কর্তৃক ভাগবত বা একান্তিক ধর্ম মথুরা অঞ্চলে প্রচারিত হয়েছিল। আঙ্গিরস সূর্যোপাসক ছিলেন। সেই সূত্রেই সূর্য কর্তৃক ভাগবত ধর্মের প্রবর্তনার ইঙ্গিত।

মহাভারতে দু'জন বাসুদেবের উল্লেখ আছে। একজন হলেন পৌণ্ড্ররাজা বাসুদেব, অন্যজন সঙ্কর্ষণ-ভ্রাতা বাসুদেব বা কৃষ্ণ। দ্রৌপদীর বিবাহসভায় দু'জনেই উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয় বাসুদেবই ঈশ্বররূপে প্রতীত। ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত অনুমান করেন যে, আদিতে সূর্যের নাম ছিল বাসুদেব। বিষ্ণুর সঙ্গে বাসুদেব নাম যুক্ত হয়। মহাভারতে (১২।৩৪১।৪১) কৃষ্ণ-বাসুদেবের সঙ্গে সূর্যের সাদৃশ্যের কথা বলা হয়েছে। পতঞ্জলিও বৃষ্ণিজাতির নেতা বাসুদেব এবং ভগবান বাসুদেবের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। আবার ঘটজাতকেও বাসুদেব নাম পাওয়া যায়। অন্যদিকে, 'নিদ্দেশ' গ্রন্থ ও পতঞ্জলি প্রদত্ত

তথ্য থেকে জানা যায় যে, বাসুদেব নামটি ছিল ভগবানের। যাদব-জাতির উপাস্য দেবতা বাসুদেব। তাঁদের বিশ্বাস ছিল, বাসুদেব আদিত্যস্বরূপ বিষ্ণুর অবতার।

মেগাস্থিনিসের ভারতভ্রমণ বৃত্তান্তে উপাস্য দেবতা হেরাক্লিসের উল্লেখ করেছেন। এই হেরাক্লিস সম্ভবতঃ হরি। বাসুদেবের এক নাম আবার হরি। ভাণ্ডারকর মনে করেন যে, বাসুদেব কাহ্বায়ন গোত্রভুক্ত ছিলেন। কৃষ্ণের নামের সঙ্গে এই গোত্রের নাম এক হওয়াতে কৃষ্ণ ও বাসুদেব অভিন্ন প্রতিপাদিত হন। ডঃ দাশগুপ্ত মনে করেন যে, বৃষ্ণিরাজা বাসুদেবের সঙ্গে ভগবান বাসুদেবও অভিন্ন হয়ে যান।

৪

ঋগ্বেদের ৮।৭৪ সূক্তটির রচয়িতা কৃষ্ণ। তিনি বৈদিক ঋষি। ছান্দোগ্য উপনিষদে কৃষ্ণকে দেবকীর পুত্র বলা হয়েছে। এই দেবকীপুত্র কৃষ্ণ এবং ভাগবতধর্মের প্রবর্তক বাসুদেব সম্ভবতঃ অভিন্ন। কহ্বায়ন নামটিই তার প্রমাণ। ঘটজাতকে কৃষ্ণ যোদ্ধা; কিন্তু ছান্দোগ্য উপনিষদে তিনি ঋষি, ঘোর আঙ্গিরসের শিষ্য মহাভারতের কৃষ্ণ একদিকে যোদ্ধা, অন্যদিকে ঋষি। মহাভারতে কৃষ্ণ বাসুদেব, দেবকীপুত্র এবং সাত্বত-প্রধানরূপেও পরিচিত; তাঁর দেবত্ব-ও সর্বত্র স্বীকৃত। তবে কেউ কেউ মনে করেন যে, কৃষ্ণের দেবত্বজ্ঞান মহাভারত প্রথম রচনা কালে ছিল না। কৃষ্ণকে দ্রৌপদীর 'গোপীজন-বল্লভ' উক্তিটি প্রক্ষিপ্ত। কৃষ্ণ ভাগবতে পূর্ণব্রহ্ম বলে কথিত হ'লেও আদিপুরাণ বিষ্ণুপুরাণে তিনি বিষ্ণুর অংশমাত্র। অবশ্য অংশাবতার কৃষ্ণের বিস্তৃত পরিচয় বিধৃত আছে সেখানে। জৈনমতে, কৃষ্ণ পার্শ্বনাথের (৮১৭ খৃঃ পূঃ) পূর্ববর্তীকালের। নবম খৃষ্টাব্দে রচিত আনন্দগিরির 'শঙ্করবিজয়' গ্রন্থে বাসুদেব ও কৃষ্ণের নাম এবং উপাসনার কথা আছে। এ গ্রন্থে কৃষ্ণ ভক্ত নামক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপাস্য। কালিদাসের মেঘদূতে (পূর্বমেঘ। ১৫ শ্লোক) উজ্জ্বলকান্তি ময়ূরপুচ্ছধারী গোপবিষ্ণুর (অর্থাৎ কৃষ্ণের) উল্লেখ আছে। চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দের এক গুর্জর রাজার দানপত্রে কৃষ্ণের উল্লেখ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দে প্রাপ্ত লিপিতে কৃষ্ণনাম পাওয়া যায়। ঐ সময়ের আগেই তিনি প্রধান দেবতারূপে পরিগণিত হয়েছিলেন সন্দেহ নাই। এমন কি খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে অন্ততঃ কৃষ্ণ-বাসুদেবের আখ্যান জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ সমাদৃত ছিল, একথা পতঞ্জলির উক্তিতে জানা যায়। 'ললিতবিস্তর' নামে একখানি অতি প্রাচীন বুদ্ধচরিত আছে। এই গ্রন্থে ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য, কুবের, রুদ্র প্রভৃতি দেবতার সঙ্গে কৃষ্ণের নামও আছে। এই কৃষ্ণ অবশ্যই দেবতা। অক্ষয়কুমার দত্ত নানা প্রমাণ দৃষ্টে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, "রাধাঘটিত উপাখ্যান ও বর্তমান কৃষ্ণোপাসক সম্প্রদায় সমুদায় তাদৃশ প্রাচীন নয় বটে, কিন্তু কৃষ্ণের দেবত্ব-কথা অপেক্ষাকৃত প্রাচীন তাহার সন্দেহ নাই।"

কৃষ্ণতত্ত্ব নিরূপণে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীমদ্ভাগবতের রচনাকাল অনেকের মতে, খৃঃ পূঃ ২য় বা তৃতীয় শতকে। সেখানে বিশ্বরূপ দর্শনে ভীত অর্জুন কৃষ্ণকে বিষ্ণু বলে সম্বোধন করেছেন। বিভূতিযোগ অধ্যায়ে কৃষ্ণও নিজেকে আদিত্য-গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিষ্ণু বলে উল্লেখ করেছেন—'আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং

রবিরংশুমান।' আবার তিনি নিজেকে 'বৃষ্ণিনাং বাসুদেবোঽস্মি'-ও বলেছেন। গীতায় ভক্তিবাদ বিশদভাবে বিবৃত। এ কারণে গীতাকে ভক্তিশাস্ত্রের বেদ বলা হয়। ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করে তাঁতেই তদ্‌গতচিত্ত হ'লে তাঁর করুণা পাওয়া সম্ভব: 'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যাসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥' (১৮।৬৫-৬)

'ভগবত' শব্দটি আনন্দ ও সুখের আকরস্বরূপ। ঋগ্বেদে ও অথর্ববেদে এ নামটি পাওয়া যায়। মহাভারতে বিষ্ণু বা বাসুদেব অর্থে 'ভগবত' শব্দ ব্যবহৃত। ভগবত অর্থে বাসুদেব অনুগামী ধর্মসম্প্রদায় বোঝায়। রামানুজের গুরু যামুনাচার্যের মতে, ভগবতকে যাঁরা সত্ত্বভাবে উপাসনা করেন, তাঁদের বলা হয় ভাগবত। ভগবান্ বিষ্ণুই যে ভগবত, একথা বিষ্ণুপুরাণেই উল্লেখ আছে। আবার এই বিষ্ণুই হলেন নারায়ণ। মহাভারতের শান্তিপর্বের নারায়ণীয় পর্বাধ্যায়ে উল্লিখিত হয়েছে যে, ভক্তিধর্মের আদিপুরুষ নারায়ণ বা হরি। এই নারায়ণ বা হরি আবার সাত্বত বংশোদ্ভূত বাসুদেব-কৃষ্ণের অন্য নাম। বাসুদেবই নারায়ণের আদি পুরুষ এবং একান্ত ভক্তদের নিকট তিনি প্রকট হন। গীতায় কৃষ্ণও অর্জুনকে সেই ইংগিত দিয়েছেন—"ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্। বিবস্বান মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ। এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ। স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ॥ স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগো প্রোক্ত পুরাতনঃ। ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্॥ —আমি এই যোগের কথা বিবস্বানকে বলেছিলাম, বিবস্বনে তাঁর পুত্র মনুকে, মনু ইক্ষ্বাকুকে শিক্ষা দেন। এবং পরম্পরাক্রমে রাজর্ষিগণ এই যোগের অধিকারী হন। কালক্রমে এই যোগ নষ্ট হয়ে যায়। তাই আমি আমার একভক্ত ও সখাকে এর উত্তম রহস্য জানাচ্ছি।" ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৯০ তম সূক্তের ঋষি ও দেবতা এই পুরুষ-নারায়ণ। তিনি একই সময়ে ব্রহ্মাণ্ডকে আবৃত এবং তাকে অতিক্রম করে আছেন—'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ। স ভূমিং সর্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্। —পুরুষের সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু ও সহস্র চরণ। তিনি পৃথিবীকে পরিব্যাপ্ত করে দশ অঙ্গুলি পরিমাণ অতিরিক্ত হয়ে অবস্থান করেন।' "ঈশ্বরের এই যে যুগপৎ তন্ময়ত্ব (immanence) এবং অতিরিক্তত্ব (transcendence) কল্পনা—ইহাই অনুবাক্‌টির গভীর অর্থবৈশিষ্ট্য।" (ড. জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)। বিভিন্ন নাম—বিশেষ করে বাসুদেব ও দুই কৃষ্ণ—কোন এক সময় অভিন্ন হয়ে গেছে। মহাভারতের বনপর্বের ১৮৮-৯ অধ্যায়ে নারায়ণ, বিষ্ণু ও বাসুদেবের একাত্মতার আভাস পাওয়া যায় এবং কৃষ্ণই শ্রেষ্ঠ দেবতারূপে পরিগণিত হয়ে যুগে যুগে ভক্তির অর্চনা পেয়ে আসছেন। এ বিষয়ে ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত যে সিদ্ধান্ত করেছেন, তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য: "But it is not possible to assert definitely that Vasudeva, Krisna the warrior and Krisna the sage were not three different persons, who in the Mahabharata were unified and identified, though it is quite probable that all the different stand of legends refer to one identical person."

কিন্তু ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত করেছেন যে, "বৈষ্ণবধর্ম-সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠতম উপাস্য দেবতা বিষ্ণুর প্রকৃত রূপ প্রধানতঃ তিনটি বিভিন্ন দেবসত্তার, যথা মনুষ্য প্রকৃতি দেবতা বাসুদেব কৃষ্ণের, আদিত্য বিষ্ণুর এবং নারায়ণের একীকরণের ফলেই পূর্ণ পরিণতিলাভ করিয়াছিল। দেবতার পূর্ণরূপের বিকাশে গোপালকৃষ্ণ রূপটিও ন্যূনাধিক অংশগ্রহণ করিয়াছিল।" (পঞ্চোপাসনা)।

যা হোক, বিষ্ণু, নারায়ণ, ভগবত, বাসুদেব, কৃষ্ণ—বিভিন্ন নামরূপ অবলম্বন করে বৈষ্ণবধর্মের যে উদ্ভব ও বিকাশ সূচিত হয়েছিল, নানা বিবর্তনের মধ্যে তার প্রবাহ থেমে থাকে নি। তখন থেকে বৈষ্ণবধর্ম পুষ্পিত হ'য়ে উঠতে থাকল কৃষ্ণমাধুর্যের রসসিঞ্চনে।

৫

'শ্রীমদ্‌ভাগবত' মহাগ্রন্থে কৃষ্ণের জীবনলীলাচিত্র উজ্জ্বলরূপে অঙ্কিত হয়েছে। ভাগবতে নানা অবতারের উল্লেখ থাকলেও 'কৃষ্ণস্তু স্বয়ং ভগবান'—তিনি স্বয়ং ভগবান। দশম স্কন্ধের নব্বই অধ্যায়ব্যাপী পরিসরে কৃষ্ণের নরাকারে লীলা-কাহিনীর বিশদ পরিচয়। ভাগবতে কোন অসাধারণ মহামানবকে দেবত্বে উন্নীত করা হয় নি, মাধুর্যের ভগবত্তাসার দেবতা কৃষ্ণের মানবীকরণ করা হয়েছে। গীতার দার্শনিক ভক্তিবাদ ভাগবতে লীলারসাত্মক কাব্যে পরিণত হয়েছে। কৃষ্ণের জন্ম, বাল্য, কৈশোর, পৌগণ্ড, যৌবন—প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থার চিত্র আছে এতে।

তাসামাবির ভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মান মুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথঃ ॥

—পীতাম্বরধারী, মাল্যভূষিত, স্মিত বদন, সাক্ষাৎ মন্মথেরও মন্মথ শৌরী আবির্ভূত হলেন। ইনিই ভাগবতের কৃষ্ণ। ভাগবতে প্রেমভক্তির—গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের লীলার বিশদ পরিচয় আছে। তবে এতে রাধার স্পষ্ট উল্লেখ নেই। কিন্তু একজন প্রধানা গোপীর কথা আছে। সেই প্রধানা গোপী হলেন রাধা—পরবর্তীকালে এরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 'রাধা' নামের সূচনাও সেই শ্লোকে। শ্লোকটি এই :

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নোবিহায় গোবিন্দ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥

—ভগবান ঈশ্বর হরি এ'র দ্বারা আরাধিত হয়েছেন। সে কারণে গোবিন্দ আমাদের পরিত্যাগ করে প্রীত হয়ে এ'কে এই নিভৃত স্থানে নিয়ে এসেছেন।

এই 'অনয়ারাধিতঃ' কথাটির ভিতরে রাধার আভাস। তবে হরিবংশে গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

ভাগবত গ্রন্থখানি বৈষ্ণবভক্তের কাছে বেদস্বরূপ। ডঃ সুশীলকুমার দে সিদ্ধান্ত করেছেন : "The Bhagabata is thus one of the most remarkable mediaeval documents of mystical and passionate religious devotion, its eroticism and poetry bringing back warmth and colour into religious life".

'রাধা' নামের স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় মহাকবি হালের 'গাথা সপ্তশতীতে'। প্রথম খ্রীষ্টাব্দে রচিত এই গ্রন্থে কৃষ্ণের ব্রজলীলা বিষয়ক কয়েকটি পদ আছে। একটি পদে রাধাকে অন্য গোপী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। পদটি এই :

মুহমারুএণ তং কণ্‌হ রাহীআএ গোরঅং অবণেন্তো।
এতানং বল্লবীণং অন্নাণ বি গোরঅং হরসি ॥ (১৮৯)

—কৃষ্ণ, তুমি মুখের ফুঁ দিয়ে রাধিকার চোখ থেকে যে গোরজ দূর করছ, এতে অন্য গোপীদের গৌরব হৃত হচ্ছে।

আর একটি সূক্তিতে গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের নর্তনক্রিয়ারত অবস্থার বর্ণনা আছে :

ণচ্চণ-সলাহণ-নিহেণ পাস-পরিসংঠিআ নিউণ-গোবী।
সরসি-গোবিআণ চুম্বই কবোল-পডিমা-গঅং কণ্‌হং। (২:১৪)

—পার্শ্বে দাঁড়ানো নিপুণ গোপী নৃত্যচ্ছলে সমান অনুরাগসম্পন্না গোপীদের কপোলে প্রতিবিম্বিত কৃষ্ণমূর্তিকে চুম্বন করছে।

আর একটি সূক্তে কৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা ও প্রেমলীলার সংকেত দ্যোতিত হয়েছে (৫।৪৭)—

জই ভমসি ভমসু এমেহ কণ্‌হ সোহগ্‌গ-গব্বিরো গোট্‌ঠে।
মহিলাণং দোসগুণে বিচারঅউং জই খমোসি ॥

—হে কৃষ্ণ, সৌভাগ্যগর্বে গর্বিত হয়ে যদি এভাবে গোষ্ঠে ভ্রমণ করতে হয়, তবে ভ্রমণ কর। তাতে তুমি যদি মহিলাদের দোষগুণের বিচার করতে সমর্থ হও (অর্থাৎ সমর্থ হবে না)।

আরো কয়েকটি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ব্রজগোপীদের বিহারলীলা, যশোদার বাৎসল্যবোধ, বিহারভূমি যমুনাতটের উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া গাথা সপ্তশতীর পঞ্চম শতকের তিনটি সূক্তে বামনরূপী ও ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর উল্লেখ পাওয়া যায়।

এ গ্রন্থের আরো কয়েকটি সূক্তিতে কৃষ্ণের প্রেমলীলার বিশদ পরিচয় পাওয়া যায়। বৈষ্ণবধর্মের ইতিহাসে গাথাসপ্তশতী অতি উল্লেখযোগ্য উপাদান জুগিয়েছে।

খ্রীষ্টীয় দশম শতকের শেষে ক্ষেমেন্দ্রের 'দশাবতার চরিতে' কৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গে রাধার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে—

প্রীত্যৈ বভূব কৃষ্ণস্য শ্যামানিচয়চুম্বিনঃ।
জাতী মধুকরস্যের রাধৈবাধিকবল্লভা ॥

—যদিও শ্রীকৃষ্ণ বহু গোপবধূর প্রতি আসক্ত ছিলেন, তথাপি ভ্রমরের প্রীতি যেমন জাতী ফুলের প্রতি অধিক হয়ে থাকে, সে রূপ রাধাই তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয়তমা ছিলেন।

জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে'র মঙ্গলাচরণ শ্লোকটি এরূপ :

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ
র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃ কেলয়ঃ ॥

"—হে রাধে! আকাশ মেঘাবৃত, তমালবৃক্ষ সকলের ছায়ায় বনভূমি সমূহ অন্ধকারে আবৃত, রাত্রিকাল উপস্থিত, এই কৃষ্ণ নিতান্ত ভীরু, সুতরাং একে তুমিই সঙ্গে করে নিয়ে যাও।" নন্দের এই প্রকার আদেশ শুনে পথিমধ্যে যে কুঞ্জগৃহ আছে, সেই অভিমুখে চলিত শ্রীরাধা ও মাধবের নিগূঢ় কেলিসমূহ বিজয়ী হোক।" গীতগোবিন্দে রাধাকৃষ্ণলীলার যে বিচিত্র সমারোহ, তার পূর্বসূত্র জানা যায় না। তবে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের প্রথম সমাগমে এই চিত্রই বর্ণিত হয়েছে।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, পদ্মপুরাণ, মৎসপুরাণ প্রভৃতি পুরাণগ্রন্থসমূহে রাধাকৃষ্ণ লীলাকাহিনীর পরিচয় পাওয়া যায়। বৃহদ্‌গৌতমীয় তন্ত্রে উল্লিখিত একটি পদে শ্রীরাধাতত্ত্ব বিশদভাবে বর্ণিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ এর একটি সূত্র অবলম্বনেই পরবর্তীকালে শ্রীরাধিকা-তত্ত্ব বিস্তারিত করেছেন। পদটি এই :

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তি সম্মোহিনী পরা॥

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে রাধাকৃষ্ণলীলার বিস্তৃত পরিচয়। নারদের ভক্তিসূত্র ও শাণ্ডিল্যসূত্রে বৈষ্ণব ভক্তিবাদের নিগূঢ় রসটি অনুভূত হয়। শাণ্ডিল্য সূত্রে বলা হয়েছে—ঈশ্বরে প্রগাঢ় প্রেমই ভক্তি (সা পরাণুরক্তিরীশ্বরে)। বল্লবীযুবতীগণ জ্ঞানের অভাব-বশতঃই ঈশ্বরকে লাভ করেছিল। নারদের ভক্তিসূত্রে আছে, পরমপুরুষ প্রেমস্বরূপ, অমৃতস্বরূপ (সা তস্মিন্ প্রেমরূপা, অমৃতস্বরূপা চ)। তাঁকে লাভ করলে মানুষ তৃপ্ত পায়, আত্মারাম হয়। ব্রজগোপীদের ভাবেই পরানুরক্তির সম্যক স্ফুরণ হয়। নারদের ভক্তিসূত্রে ঈশ্বর আসক্তি একাদশ পর্যায়ে বিভক্ত—গুণমাহাত্ম্য, রূপ, পূজা, স্মরণ, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, কান্তা, আত্ম-নিবেদন, তন্ময়, বিরহ। পরবর্তীকালের গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের নববিধা ও পঞ্চরসাত্মক ভক্তিসাধনার আভাস এতে পাওয়া যায়।

আনন্দবর্ধনের 'ধ্বন্যালোক' (৯ম শতক) নামক রসশাস্ত্রে রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক দুটি পদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটি পদ :

তেষাং গোপবধূবিলাস সুহৃদাং রাধারহঃ সাক্ষিণাং
ক্ষেমং ভদ্র কলিন্দ রাজতনয়াতীরে লতাবেশ্মনাম্।
বিচ্ছিন্নে স্মরতল্প কল্পন বিধিচ্ছেদোপযোগেহধুনা
তে জানে জরঠীভবন্তি বিগলন্নীল ত্বিষঃ পল্লবাঃ॥

বৃন্দাবন থেকে দূত এসেছেন। কৃষ্ণ তাঁকে জিজ্ঞেস করছেন, "ভদ্র, গোপবধূগণের বিলাসসুহৃদ, রাধার গোপন কেলিবিলাসের সাক্ষী কালিন্দী তীরবর্তী সেই লতাকুঞ্জগুলির কুশল ত? স্মরশয্যারচনার প্রয়োজন আর নেই, ছেদনেরও প্রয়োজন আর নেই। তাই হয়ত পল্লব শুকিয়ে ঝরে পড়ছে।" আলোচ্য পদ্‌টিতে শ্রীরাধাতত্ত্ব সুন্দররূপে প্রকাশিত।

আর একটি পদ এই :

দুরারাধ্যা রাধা সুভগ যদনেনাপি মৃজতঃ
তবৈতৎ প্রাণেশাজঘনবসনেনাশ্রু পতিতম্।

কঠোরং স্ত্রীচেতস্তদলমুপচারৈর্বিরম হে
ক্রিয়াৎ কল্যাণং বো হরিরনুনয়েষ্বেবমুদিতঃ ॥

—রাধার আরাধনা যে বড়ই দুঃখের, তাহা সত্য, কারণ, হে সুভগ! তোমার যে বড়ই প্রিয়তমা—তাঁহারই পরিহিত বস্ত্রেরই অঞ্চল দিয়া তুমি আমার এই নয়নের পতিত অশ্রুধারা মুছাইতেছ, (আর বলিতেছ) স্ত্রীলোকের হৃদয় বড়ই কঠোর, থাক, আর প্রিয়বচন বা নব নব সেবার উপচার দ্রব্যের আবশ্যক নাই, তুমি বিরত হও। বহুবার অনুনয়কালে শ্রীরাধা যাঁহাকে এইরূপ বলিয়াছিলেন, সেই হরি তোমাদিগের মঙ্গলবিধান করুন।" (অনুঃ মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ)।

এই দুটি শ্লোক আনন্দবর্ধনের স্বরচিত নয়। পূর্ব প্রচলিত কোন গ্রন্থ থেকেই তিনি নিয়েছিলেন। তবে কোন্ গ্রন্থ, তা তিনি উল্লেখ করেন নি। তর্কভূষণ মহাশয়ের সিদ্ধান্তঃ "শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী সংস্কৃত কাব্য ও নাটকে শ্রীরাধার নাম কতদিন হইতে পাওয়া যায়, তাহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে নির্ণয় করা কঠিন। ...খ্রীষ্টজন্মের পরবর্তী নবম শতাব্দী হইতেই সংস্কৃত সাহিত্যে শ্রীরাধার নাম ও সংক্ষিপ্ত চরিত্র দেখিতে পাওয়া যায়।"

লীলাশুক বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের 'কৃষ্ণকর্ণামৃত'-এ রাধাকৃষ্ণ-লীলার পরিপূর্ণ ও উজ্জ্বল চিত্রায়ণ। চৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণকালে 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' ও 'ব্রহ্মসংহিতার' সন্ধান পেয়ে সেগুলি বাংলা দেশে নিয়ে আসেন। প্রথমোক্ত গ্রন্থের পরতে পরতে লীলারসমাধুর্য ঘনীভূত। পরবর্তী বৈষ্ণবধর্ম ও সাহিত্যের উপর এর প্রভাব অসীম। নীলচলবাসের শেষ দ্বাদশ বৎসর বিপ্রলম্ভ অবস্থায় থাকাকালে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের প্রথম শতকের ৩২, ৪০, ৪১ ও ৬৮ সংখ্যক শ্লোক আবৃত্তি করে নিজ বিরহবেদনা প্রকাশ করতেন। শ্লোকগুলি এরূপঃ ত্বচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুতমিত্যবৈহি / মচ্চাপলং চ মম বা বাধিগম্যম্। তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলী বিলাসি / মুগ্ধং মুখাম্বুজমুদীক্ষিতুমীক্ষণাভ্যাম্ ॥ (১।৩২)

—তোমার কিশোর মূর্তি ত্রিভুবনে অদ্ভুত বলে জানি। আমার চপলতার কথা আমার ও তোমারও জানা। হে মুরলীধর, তোমার দুর্লভ মুখপদ্মখানি দু' নয়ন ভরে দেখবার জন্য আমি কি করব?

হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধো / হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো।
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম / হা হা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে ॥ (১।৪০)

—হে দেব, হে দয়িত, হে ভুবনের একমাত্র বন্ধু/ হে কৃষ্ণ, হে চপল, হে করুণার একমাত্র সিন্ধু,
হে নাথ, হে রমণ, হে নয়নাভিরাম/ কখনতোমাকে আমি দেখতে পাব?

এই প্রসঙ্গে দাক্ষিণাত্যের আলোয়ার সম্প্রদায়ের উল্লেখ সবিশেষ প্রয়োজন। বৈষ্ণবের কান্তাভাবসাধনার পুষ্টিতে এ'দের দান যথেষ্ট। আলোয়ার ভক্ত নিজেকে নায়িকা ও ভগবানকে নায়করূপে কল্পনা করে মধুর রসের পদ রচনা করেছেন। বিরহের বেদনা ও মিলনের ব্যাকুলতা এই সব পদে ঘনীভূত রসরূপ পেয়েছে। এদের ভজন তত্ত্বের পথে নয়, প্রেমের পথে। অন্যতম শ্রেষ্ঠ-ভক্ত অণ্ডাল রঙ্গনাথকে জীবনস্বামী জ্ঞান করতেন। খৃঃ প্রথম শতক থেকেই আলোয়ারগণের এই ভজনরীতির পরিচয় পাওয়া যায়। চৈতন্য মহাপ্রভু

দাক্ষিণাত্যে গিয়ে আলোয়ার সম্প্রদায়ের ভাবসাধনার দ্বারা সম্ভবতঃ প্রভাবিত হয়ে থাকবেন। কারণ দাক্ষিণাত্য থেকে ফিরে এসে তিনি গোপীভাবের ভজন প্রবর্তন করেন। আলোয়ার সম্প্রদায়ের যে দ্বাদশজন আচার্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন, তাঁদের মধ্যে প্রাচীনতম হলেন সারযোগী।

৬

অষ্টম শতাব্দীর শেষপাদে শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব। বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যায় তিনি জানালেন: ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়; ব্রহ্মই সত্য, জগত মিথ্যা; ব্রহ্মের কোন ভেদ নেই; তিনি নির্গুণ; মায়া অনির্বাচ্য। শঙ্করাচার্যের এই অদ্বৈতমতের প্রতিক্রিয়া দেখা দিল রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্ব ও বল্লভের ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে।

রামানুজের ভাষ্যের নাম শ্রীভাষ্য ও তাঁর মতবাদের নাম—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। তিনিই সর্বপ্রথম ভক্তিকে দার্শনিক প্রতিষ্ঠা দান করেন। রামানুজের মতে: ব্রহ্ম এক। কিন্তু তিনি নির্গুণ ও নির্বিশেষ নন। জীব ও জগৎ ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন নয়; আবার ভিন্নও নয়। তিনি করুণাময় ও ভক্ত-বৎসল। মানবের কর্তব্য: ব্রহ্মকে ভক্তি ও উপাসনা করা। রামানুজ বলেন যে, ব্রহ্ম-শরণাগতিতেই মুক্তি অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপপ্রাপ্তি ঘটে। এদিক থেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য। তাছাড়া রামানুজের মতে, জীব ও মায়াশক্তি ব্রহ্মের স্বরূপশক্তির অতিরিক্ত বস্তু; কিন্তু গৌড়ীয়মতে এ দুই শক্তি স্বরূপাতিরিক্ত নয়।

মধ্বাচার্য দ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর বেদান্তভাষ্যের নাম—পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন। মধ্বের মতে, ব্রহ্ম ও জীবে ভেদ বর্তমান; ব্রহ্ম ও জীব—উভয়ই সত্য। ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ, উপাদান কারণ নন। ব্রহ্মের স্বরূপানন্দের উপলব্ধিতেই মুক্তি। মুক্ত অবস্থাতেও ব্রহ্মে-জীবে নিত্য ভেদ বর্তমান থাকে।

নিম্বার্ক দ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। তাঁর বেদান্তভাষ্যের নাম—'বেদান্ত পরিজাত সৌরভ।' নিম্বার্কের মতে, জীব-ব্রহ্মের মধ্যে একই সঙ্গে ভেদ ও অভেদের সম্বন্ধ বিদ্যমান। কারণরূপ ব্রহ্মের সঙ্গে কার্যরূপ জগতের ভেদাভেদ-সম্বন্ধ নিত্য বর্তমান। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ সকল কল্যাণগুণের আকর। পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে অংশী ও অংশের সম্পর্ক। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্বের সঙ্গে নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বা ভেদাভেদ-বাদের সাদৃশ্য আছে।

বল্লভ তাঁর অনুভাষ্যে শুদ্ধাদ্বৈতাবাদের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মতে, জীব ও জগৎ দুইই সত্য, দুইই ব্রহ্মময়। অগ্নি ও তার দাহিকাশক্তির মধ্যে যে সম্পর্ক, ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে সে সম্পর্ক। ব্রহ্ম জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ—দুইই। বল্লভের মতে, ভক্তিমার্গ দুটি—মর্যাদা ও পুষ্টি। শাস্ত্রশাসনের পথ মর্যাদার; কৃষ্ণের মাধুর্য ও লীলাসম্ভোগের অভিলাষ পুষ্টিমার্গের। শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, সেবা, অর্চনা ও স্তুতি—ভগবানের অনুগ্রহ লাভের উপায় এই ছয়টি। বল্লভের মতে, গোপীজনবল্লভ ব্রহ্মই শ্রীকৃষ্ণ।

বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম—প্রাক্‌চৈতন্য যুগ

বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। ভারতের বৈষ্ণব ধর্মের সাধারণ ধারার সঙ্গে এর পার্থক্য যথেষ্ট। শিলালিপি, মন্দির-চিত্র ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলার বৈষ্ণব ধর্মের গোড়াকার ইতিহাসটি আমরা জানতে পারি। বাংলাদেশে প্রচলিত কৃষ্ণলীলা কাহিনী বেশ প্রাচীন বলে পণ্ডিত মহলের ধারণা।

বাংলার বিষ্ণুর উপাসনার প্রাচীনতম নিদর্শন সম্ভবতঃ বাঁকুড়ার নিকটবর্তী শুশুনিয়া পাহাড়ের গুহালিপি ও গুহার গায়ে অঙ্কিত বিষ্ণুচক্র। আনুমানিক ৪০০ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ মহারাজ চন্দ্রবর্মার এই লিপিতে চক্রস্বামী বিষ্ণুর উপাসনার পরিচয় আছে। পঞ্চম শতকের প্রথম দিকে বগুড়া জেলার বালগ্রামে গোবিন্দস্বামীর মন্দির, এই শতকের দ্বিতীয়পাদে উত্তরবঙ্গে শ্বেতবরাহস্বামী ও কোকামুখস্বামীর মন্দির, ষষ্ঠ শতকের প্রথম পাদে ত্রিপুরা জেলায় প্রদ্যুম্নেশ্বর শিবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। সপ্তম শতকে ত্রিপুরায় অনন্ত নারায়ণের উপাসনার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই শতকে পরম বৈষ্ণব ও পুরুষোত্তম উপাসক শ্রীধারণরাতের বিবরণ জানা যায়। এছাড়া প্রাপ্ত অসংখ্য মূর্তির সাক্ষ্যে জানা যায় যে, বিষ্ণুর উপাসনা এ যুগে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। পাহাড়পুরের কৃষ্ণলীলা চিত্র এর প্রমাণ। এই লীলা প্রায় দেড় হাজার বছরের পুরানো বলে অনেকে মনে করেন। দ্বাদশ শতকে ভোজবর্মাদেবের বেলাবো অনুশাসনে ব্রজলীলার ('গোপীশতকেলিকারঃ') স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে।

গুপ্ত, পাল ও সেন বংশের রাজত্বকালে বাংলাদেশে বৈষ্ণবধর্মের যথেষ্ট প্রসার হয়। গুপ্তরাজগণ ছিলেন বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত 'পরম ভাগবত' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। পাল নৃপতিগণ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হলেও বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি অনুদার ছিলেন না। খালিমপুর লিপিতে ধর্মপালদেবের নন্দদুলাল মন্দিরের উল্লেখ দেখা যায়। নারায়ণ পালের রাজত্বকালে দিনাজপুরের গরুড়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাছাড়া এ যুগে যত দেবমূর্তি পাওয়া গেছে, তাদের অধিকাংশই বিষ্ণুমূর্তি। সেন বংশের রাজত্বকালে বৈষ্ণবধর্ম দু'ভাবে সমৃদ্ধ হয়—বিষ্ণুর দশাবতার রূপ ও কৃষ্ণলীলার বিচিত্র বিকাশে। সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিজয় সেন প্রদ্যুম্নেশ্বর শিবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। লক্ষ্মণসেন-ও ছিলেন পরম বৈষ্ণব।

শুধু মন্দির ও মূর্তিই নয়, সাহিত্যের মাধ্যমেও কৃষ্ণলীলার জনপ্রিয়তা বিশেষ বৃদ্ধি পায়। দশম শতকে কৃত 'কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়' নামক সংস্কৃত পদ-সঙ্কলন গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক চারটি পদ আছে। পরবর্তী বৈষ্ণব ভাবের স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায় এ পদগুলিতে। এছাড়া এ গ্রন্থের একটি পদ পরবর্তী পদাবলী সাহিত্যের অভিসার বিষয়ক পদ রচনার উৎস স্বরূপ। পদটি এই :

মার্গে পঙ্কিনি তোয়দান্ধতমসে নিঃশব্দ সঞ্চারকং
গন্তব্যা দয়িতস্য মেহদ্য বসতির্মুগ্ধেতি কৃত্বা মতিম্।
আজানূদ্ধৃত নূপুরা করতলেনাচ্ছাদ্য নেত্রে ভৃশং
কৃচ্ছ্রাল্লব্ধ পদস্থিতিঃ স্বভবনেপন্থানমভ্যস্যতি॥

—ঘন অন্ধকার সমাচ্ছন্ন পঙ্কিল পথে নিঃশব্দ পদচারণায় অভিসারে যেতে হবে—এই মনে করে এক মুগ্ধা রমণী নূপুরকে জানু পর্যন্ত তুলে, নয়ন যুগল করতলের দ্বারা আচ্ছাদন করে অতি আয়াসে নিজ ঘরের মধ্যে পথ চলার অভ্যাস করছে।

সেন রাজত্বকালে দ্বাদশ শতকে সংকলিত শ্রীধর দাসের 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' রাধাকৃষ্ণপ্রেম-লীলা চিত্রিত হয়েছে। এ সব পদে রাধাপ্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব ব্যঞ্জিত হয়েছে। বৈষ্ণব পঞ্চরসাত্মক পদই আছে এতে। লক্ষণসেন, তাঁর পুত্র কেশবসেন ও সভাকবিদের পদ দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে সঙ্কলন গ্রন্থখানা। বিভিন্ন প্রকার নায়িকা ও অভিসারের উদাহরণমূলক পদ পাওয়া যায় এতে। এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি জয়দেব ছিলেন রাজা লক্ষণসেনের সভাকবি। তাঁর 'গীতগোবিন্দে' রাধাকৃষ্ণলীলার চূড়ান্ত পরিচয়। হরির স্মরণে মন সরস করা এবং বিলাসকলায় কৌতূহল—এ দুয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখে জয়দেবের মধুর কোমলকান্তপদাবলী 'গীতগোবিন্দ' রচিত। 'যদি হরিস্মরণে সরসং মনো / যদি বিলাস কলাসু কুতূহলম্ / মধুর কোমলকান্ত পদাবলীরম / শৃনু তদা জয়দেব সরস্বতীম্॥' দশাবতার স্তোত্রের মধ্যে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপের কিছু পরিচয় থাকলেও কবি লীলামাধুর্যেরও পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। রাধাপ্রেমের বৈচিত্র্য—বিরহের বেদনা, আবার বসন্তকালীন রাসের উচ্ছ্বল আনন্দ ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে গীতগোবিন্দে। গীতগোবিন্দের মধুর কোমলকান্ত পদাবলী পরবর্তীকালের বৈষ্ণবধর্ম ও সাহিত্যের আকরস্বরূপ। স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদের সঙ্গে জয়দেবের পদও সর্বদা আস্বাদন করতেন। বৈষ্ণব পদাবলীর ভাব ও গঠন পারিপাট্যের উপরও গীতগোবিন্দের একচ্ছত্র প্রভাব। 'রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃ কেলয়ঃ'—গীতগোবিন্দের এই সুর পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলীতে প্রসারিত হয়েছে।

চতুর্দশ শতকে সঙ্কলিত 'প্রাকৃত পৈঙ্গলের' অনেক পদ রাধাকৃষ্ণলীলারসের পুষ্টিসাধন করেছে। একটি পদে বিরহার্ত হৃদয়ের সুর ধ্বনিত। আর একটি পদে রাধাকৃষ্ণের নৌকাবিলাস কাহিনী আভাসিত :

আরে রে বাহহি কাহ্ন নাব / ছোড়ি ডগমগ কুগতি ন দেহি।
তই ইথি ণইহি সংতার দেহি / জো চাহসি সো লেহি॥

—হে কৃষ্ণ, নৌকা বাও, চঞ্চল ডগমগির কুগতি আমাকে দিও না। তুমি এই নদীতে পাড়ি দাও, তারপর তুমি যা চাও, তা নিও।

বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে' রাধাকৃষ্ণলীলা-বৈচিত্র্য বাঙ্ময় রসরূপ পেয়েছে। গীতগোবিন্দের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হলেও আদিমধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন এই কাব্যখানিকে নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবগণ বিশেষ আমল দিতে চান না।—তাঁদের মতে, বৈষ্ণব মতবিরোধী তত্ত্ব এতে প্রকাশিত, বৃন্দাবনের নওলকিশোর নয়, গ্রাম্য গোঁয়ার কৃষ্ণের কামকেলির স্থূল প্রকাশ এতে। কিন্তু গ্রন্থখানিকে একেবারের নস্যাৎ করা চলে বলে আমাদের মনে হয় না। কৃষ্ণের সম্ভোগলীলা ও ঐশ্বর্যের চিত্র গীতগোবিন্দে আছে। আর প্রাক্-চৈতন্যযুগে সম্ভোগাখ্য শৃঙ্গার রসের প্রাধান্য ছিল। বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের প্রাধান্য পরচৈতন্য যুগে। তাছাড়া চৈতন্যোত্তর গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্বের দৃষ্টিতে দেখলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ত্রুটি থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাসের কৃতিত্ব এখানেই যে, রাধার যে বিস্তৃত জীবনচিত্র তিনি অঙ্কিত করেছেন, তাতে রাধা অজ্ঞাত-যৌবনা অবস্থা থেকে পরিশেষে-মহাভাবস্বরূপিনী কমলিনীতে রূপান্তরিতা। বৈষ্ণব পদাবলীতে এই রাধার চিত্রই আমরা পাই দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদে।

'শ্রীমদ্ভাগবত' গ্রন্থখানা বাংলার বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনে যথেষ্ট প্রাণ সঞ্চার করেছে। মালাধর বসু ভাগবতের দশম-একাদশ-দ্বাদশ স্কন্দ অবলম্বনে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' রচনা করেন। গ্রন্থটি— 'তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন। চতুর্দশ দুই শকে হইল সমাপন ॥' এই গ্রন্থে মালাধর কৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপ অপেক্ষা মাধুর্যরূপের প্রতি অধিকতর প্রবণতা দেখিয়েছেন। 'নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ'—এই ছত্রটি পরবর্তী কান্তাপ্রেমসাধনার প্রেরণা স্বরূপ। স্বয়ং চৈতন্যদেব মালাধরের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

প্রাক্‌চৈতন্যযুগে রাধাকৃষ্ণলীলারসাত্মক পদরচনায় বিদ্যাপতির অবদান অনস্বীকার্য। (এ'র সম্পর্কে পৃথক আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

এই প্রসঙ্গে কিছু লৌকিক প্রেমকবিতার কথাও উল্লেখ করতে হয়। কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়, সদুক্তিকর্ণামৃত, অমরুশতক, ধ্বন্যালোকে ধৃত বিভিন্ন লৌকিক প্রণয়-মূলক পদ বৈষ্ণব প্রেমচেতনার পুষ্টিসাধনে সহায়তা করেছে। মূলে এসব পদ যে উদ্দেশ্যেই রচিত হোক না কেন, স্বয়ং চৈতন্যদেব ও রসজ্ঞ ভক্তগণ এই সব পদে আধ্যাত্মিকতা আরোপ করেছেন। তার ফলে এ পদগুলি নতুন মহিমায় উন্নীত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ শীলা ভট্টারিকার একটি পদের উল্লেখ করা যায়ঃ

যঃ কৌমারহরঃ স এবহি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা—
স্তে চোন্মীলিত মালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥

—যে আমার কৌমার্যহরণ করেছিল, সেই আজো আমার বর; সেই চৈত্রনিশি, সেই বিকশিত মালতীর সুরভি, সেই কদম্ববনের প্রৌঢ় বাতাস আজো আছে; আমিও সেই আছি, তথাপি রেবানদীতটের বেতসী তরুতলে যে সব সুরতব্যাপারের লীলাবিধি, তাতেই আমার চিত্ত সম্যক্‌ উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে।

রাধাভাবে আবিষ্ট চৈতন্যদেব জগন্নাথ ক্ষেত্রে প্রান্ত হ'য়ে বৃন্দাবনের জন্য উৎকণ্ঠিত হ'য়ে বারবার এ শ্লোক আবৃত্তি করেন—'নাচিতে নাচিতে প্রভুর হইল ভাবান্তর। হস্ত তুলি শ্লোক পড়ে করি উচ্চস্বর ॥' উদ্ধৃত শ্লোকটির আধ্যাত্মিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন রূপ গোস্বামী ঃ—কুরুক্ষেত্রে সকলে সমাগত, কিন্তু সেই কোলাহলে রাধা অতৃপ্ত, কালিন্দী-পুলিনবিপিনের জন্য তাঁর মন উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছে। শ্রীরূপ গোস্বামীকৃত শ্লোকটি এরূপঃ

প্রিয় সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত—
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গম সুখম্‌।
তথাপ্যন্তঃ খেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিন বিপিনায় স্পৃহয়তি ॥

—হে সহচরি, সেই প্রিয় কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে মিলিত হয়েছেন। তথাআমিও সে-ই রাধা। এই আমাদের উভয়ের সঙ্গম সুখ। তথাপি যে বনমধ্যে মধুর মুরলীর পঞ্চম স্বর মেলা হোত, সেই কালিন্দী পুলিন বিপিনের জন্য আমার মন স্পৃহা করে (আকাঙ্ক্ষা করে)।' 'এই

শ্লোক মহাপ্রভু পড়ে বারবার। স্বরূপ বিনে কেহ অর্থ না বুঝে ইহার ॥......পূর্বে যেন কুরুক্ষেত্রে সব গোপীগণ। কৃষ্ণের দর্শন পায়া আনন্দিত মন ॥ জগন্নাথ দেখি প্রভুর সে ভাব উঠিল। সেই ভাবাবিষ্ট হৈয়া ধুয়া গাওয়াইল ॥ অবশেষে রাধা কৃষ্ণে কৈলা নিবেদন। সেই তুমি সেই আমি সেই নব সঙ্গম। তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন। বৃন্দাবনে উদয় করছে আপনার চরণ।......আমা লইয়া পুনঃ লীলা কর বৃন্দাবনে। তবে আমার মনোবাঞ্ছা হয়ত পূরণে ॥'

চৈতন্যপূর্ব বাংলাদেশে ভাগবত ধর্মের বহুল প্রচার হয়েছিল। এই ভাগবতধর্ম প্রচারে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর অবদান যথেষ্ট বলে অনেকে মনে করেন। 'মাধবেন্দ্র পুরীর কথা অকথ্য কথন। মেঘদরশনে যাঁর হয় অচেতন ॥' —চৈতন্যচরিতামৃতকারের উক্তি। চৈতন্য ভাগবতে আছে 'ভক্তিরসের আদি মাধবেন্দ্র সূত্রধার।' মাধবেন্দ্র পুরীর তের জন শিষ্যের মধ্যে পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি, অদ্বৈতাচার্য ও ঈশ্বর পুরীর দ্বারা ভারতের পূর্বাঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্মের গতি তীব্রতর হয়। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের সিদ্ধান্তঃ মাধবেন্দ্র ও তাঁর শিষ্যদল শ্রীচৈতন্যের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন। বাংলার বৈষ্ণবধর্ম যে চৈতন্যরূপী মহাবৃক্ষে পরিণত হয়েছিল মাধবেন্দ্রপুরী তার বীজস্বরূপ। গবেষকের মতে—"The Radha-Krisna cult seems to have originated with Madhavendra Puri Gosvamin, from whom his disciple Isvara Puri Gosvamin inherited it. He transmitted it to his disciple Sri Caitanya, whose followers developed it into a full grown system with a philosophy and theology of its own." কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায়—

> শ্রীচৈতন্য মালাকার পৃথিবীতে আনি। ভক্তি-কল্পতরু রূপিলা সিঞ্চি ইচ্ছাপানি ॥
> জয় শ্রীমাধব-পুরী কৃষ্ণপ্রেমপূর। ভক্তি-কল্পতরুর তেঁহো প্রথম অঙ্কুর ॥
> শ্রীঈশ্বরপুরী রূপে অঙ্কুর পুষ্ট হৈল। আপনে চৈতন্যমালী স্কন্ধ উপজিল ॥

ভক্তগণের বিশ্বাস, অদ্বৈতাচার্যের হুঙ্কারে স্বয়ং ভগবান চৈতন্যচন্দ্ররূপে আবির্ভূত হন। ঈশ্বরপুরী চৈতন্যদেবের দীক্ষাগুরু। অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ—এই দুই প্রভু চৈতন্য-মতবাদ প্রচারে সমাধিক সক্রিয় ছিলেন। চৈ, চ,-র ভাষায়—

> বৃক্ষের উপরি শাখা হৈল দুই স্কন্ধ।
> এক অদ্বৈত নাম—আর নিত্যানন্দ ॥
> সেই দুই স্কন্ধে বহু শাখা উপজিল।
> তার উপশাখাগণে জগৎ ছাইল ॥

এছাড়া চন্দ্রশেখর, শ্রীবাস, মুকুন্দ, গোপীনাথ, নরহরি সরকার, নৃসিংহ এবং আরো অনেকে ভাগবতকথা শ্রবণ ও কীর্তন করতেন। অবশ্য নানা বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়েই তাদের ভক্তিধর্মের অনুশীলন করতে হোত। এরপর চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বৈষ্ণব প্রেমধর্মের ইতিহাসে যুগান্তর এল। ভক্তির শীর্ণ-খাতে শোনা গেল প্লাবনের উত্তাল কলরোল।

॥ শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের তাৎপর্য ॥

১

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব মধ্যযুগের বঙ্গদেশে এক অতি স্মরণীয় ঘটনা এবং তা যুগ-প্রয়োজনেই। বৈষ্ণবভক্তের দৃষ্টিতে, তিনি স্বয়ং ভগবান—মানবমূর্তিতে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন, মানবলীলার মাধ্যমে তাঁর অনন্ত রসস্বরূপের অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য। আর অভক্তের দৃষ্টিতেও চৈতন্যচন্দ্রের আবির্ভাব বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এবং তা সমকালীন যুগের ও জীবনের প্রয়োজনে। বহিঃশক্তির প্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সমাজে অতি মাত্রায় রক্ষণশীলতার কূর্ম-প্রবৃত্তি, ধর্মের নামে মানুষে মানুষে ভেদাভেদের উপদ্রবে মানবতার নিদারুণ অপমান, জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে বিরাট ফাটল, ধর্মের মৌল বৈশিষ্ট্যের কথা ভুলে গিয়ে আচার-সর্বস্বতার বাড়াবাড়ি, সমাজ ও সংস্কৃতির ভিত্তিমূলে পচনশীল বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনকে তমসাবৃত করে তুলেছিল। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব সাধারণ মানুষকে মর্যাদা দিলেন, মানবতার মুক্তিমন্ত্রে তাদের উদ্বোধিত করলেন, ঐশ্বর্য ও প্রতাপ নয়, যথার্থ মনুষ্যত্বের উদ্বোধনে সমাজ ও সংস্কৃতির যথার্থ বিকাশ সম্ভব—এই আদর্শ সঞ্চারিত করলেন প্রতিটি মানুষের মনে, প্রেমের অমৃতধারায় সিক্ত মানুষই যথাযথ ভেদাভেদ জ্ঞানশূন্য হয়ে এক ও অখণ্ড ঐক্য মন্ত্রে যুক্ত হতে পারে, সে পথ দেখালেন। তিনি জানালেন, জাতি, ধর্ম, গোত্র, ঐশ্বর্য—কোনটাই নয়, মনুষ্যত্বের যথার্থ উদ্বোধনই দেবত্বলাভের পথ। চৈতন্যদেব প্রচারিত প্রেমের ও করুণার বাণী বস্তুতঃ জগতে নব-মানবধর্মের প্রতিষ্ঠা দান করল। চৈতন্যের আবির্ভাবে তাই বাঙালী জাতি নবজীবনচেতনায় উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল।

ষোড়শ শতকের জাতীয় জীবনের প্রবল ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ তরঙ্গতটে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব। নবদ্বীপ, তথা সারা বাংলাদেশ, তখন ধর্মের গ্লানিতে পরিপূর্ণ। শুষ্ক জ্ঞান-মার্গে বিচরণে, আচার-বিচারের বাড়াবাড়িতে মানুষ তখন রত। তখন ভক্তি-বিবর্জিত সকল সংসার—'না বাখানে যুগধর্ম কৃষ্ণের কীর্তন।' ভক্তিধর্মের ব্যাখ্যানে বা শ্রবণে তখন কারো অনুরক্তি ছিল না। শুধু—

> সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে।
> কৃষ্ণপূজা বিষ্ণুভক্তি কারো নাহি বাসে॥
> বাশুলী পূজয়ে কেহ নানা উপচারে।
> মদ্য মাংসে দিয়া কেহ যক্ষপূজা করে॥
> নিরবধি নৃত্যগীত-বাদ্য কোলাহল।
> না শুনি কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল॥

(চৈ. ভা.—আদি, ২য় অধ্যায়)

জাতীয় জীবনের এ হেন বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়েছিল অবশ্য রাজনৈতিক কারণে। বৈদেশিক শক্তির আক্রমণে পর্যুদস্ত বাঙালীর নৈরাশ্য তাকে অন্ধ তামসিকতার মধ্যে নিক্ষেপ করল। সেই বিশৃঙ্খল পটভূমিকায় দুষ্কৃতের বিনাশ সাধন করে ধর্মসংস্থাপনের জন্য 'সিংহগ্রীব সিংহবীর্য সিংহের হুংকার' নিয়ে স্বয়ং কৃষ্ণ চৈতন্যরূপে নদীয়ায় অবতীর্ণ হলেন। চৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত আছে :

কলিযুগে যুগধর্ম নামের প্রচার।
তথি লাগি পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার ॥
তপ্তহেম সম কান্তি প্রকাণ্ড শরীর।
নব মেঘ জিনি কণ্ঠধ্বনি যে গভীর ॥

শ্রীরূপ গোস্বামী 'বিদগ্ধমাধব' নাটকে করুণাবতার শ্রীচৈতন্যদেব সম্পর্কে লিখেছেন :

অনর্পিত চরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বল রসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দর দ্যুতিকদম্ব সন্দীপিতঃ
সদা হৃদয় কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গদেব নামপ্রেম বিতরণে জগৎকে ধন্য করেছিলেন। তিনি জাতির মগ্ন চৈতন্যকে আপন জীবন-সাধনার দ্বারা পুনরুজ্জীবিত করে তুলেছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃত-কারের ভাষায় চৈতন্যদেব :

বাহু তুলি হরি বলি প্রেম দৃষ্টে চায়।
করিয়া কল্মষ নাশ প্রেমেতে ভাসায় ॥

বৈষ্ণব সাধক-কবি মহাপ্রভুর এই করুণাঘন মূর্তির কথা স্মরণ করেছেন :

পরশ মণির সাথে কি দিব তুলনা রে
পরশ ছোঁয়াইলে হয় সোনা।
আমার গৌরাঙ্গের গুণে নাচিয়া গাহিয়া রে
রতন হৈল কত জনা। (পরমানন্দ)

ভক্তের ইচ্ছায় ধরাতলে অবতীর্ণ চৈতন্যচন্দ্ররূপী কৃষ্ণ—'আপনি আচরি ভক্তি করেন প্রচার। নাম বিনা কলিকালে ধর্ম নাহি আর ॥' কবিরাজ গোস্বামী এ সম্পর্কে আরো বলেছেন :

আপনে আস্বাদে প্রেম নাম সঙ্কীর্তন ॥
সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্তন সঞ্চারে।
নাম প্রেম মালা গাঁথি পরাইল সংসারে ॥
এই মত ভক্তভাব করি অঙ্গীকার।
আপনি আচরি ভক্তি করিল প্রচার ॥

কোন উপদেশের মাধ্যমে নয়, আপন জীবন সাধনার কষ্টিপাথরে মহাপ্রভু নাম-প্রেমের মাহাত্ম্য প্রকট করে তুললেন। মহাপ্রভু কমলা, শিব ও বিধির দুর্লভ প্রেমধন জগতকে

দান করলেন। সাধারণ ভক্তদের প্রভু নামকীর্তন করতে বলতেন, ধর্মোপদেশের গুরুভারে তাদের সাধনার পথ কণ্টকিত করেন নি। কিন্তু অন্তরঙ্গ জীবনে তিনি রসাস্বাদনে মগ্ন থাকতেন :

বহিরঙ্গ সনে করে নাম সংকীর্তন।
অন্তরঙ্গ সনে করে রস আস্বাদন ॥

এই ভাবে মহাপ্রভু আচণ্ডালে নাম-প্রেম বিতরণের দ্বারা জাতির প্রাণকেন্দ্রকে আবার স্বচ্ছ করে তুললেন। সমগ্র বাংলাদেশে মহাপ্রভুর দিব্য জীবনসম্ভূত ভাবপ্লাবনে বাঙালী-হৃদয়ের মরাগাঙ দুকূল ছাপিয়ে গেল--'শান্তিপুর ডুবুডুবু নদে ভেসে যায়।' নিঃসন্দেহে ষোড়শ শতকের বাঙালীর জাতীয় জীবনের প্রাণচৈতন্য হলেন করুণাসাগর শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব।

২

কিন্তু এহো বাহ্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণবভক্তের কাছে মহাপ্রভুর আবির্ভাবের তাৎপর্য অন্য। ভূ-ভার হরণের নিমিত্ত চৈতন্যদেবের আবির্ভাব হয়েছিল, এটি বহিরঙ্গ কথা।

প্রেম নাম প্রচারিতে এই অবতার।
সত্য এই হেতু কিন্তু এহ বহিরঙ্গ ॥

কেন না— স্বয়ং ভগবানের কর্ম নহে ভার হরণ', কিংবা, 'যুগধর্ম প্রবর্তন নহে তাঁর কাম।' 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং'—সেই কৃষ্ণই চৈতন্যচন্দ্ররূপে—নবদ্বীপে উদিত। তাঁর ক্ষেত্রে—'আনুষঙ্গ কর্ম এই অসুর মারণ।' পূর্ণ ভগবান্ যখন আবির্ভূত হন, তখন অন্য সব অবতারও তাঁতে এসে মিলিত হন। তখন গূঢ় কারণের সঙ্গে আনুষঙ্গিক ভূ-ভার হরণ ইত্যাদি কর্তব্যও এসে উপস্থিত হয়। কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় :

কোন কারণে হৈল সবে অবতারে মন।
যুগধর্ম কাল হৈল সেকালে মিলন ॥

অতএব, চৈতন্যদেবের নামপ্রেম বিতরণের কারণে আবির্ভাব, এটি সামান্য বা বহিরঙ্গ কারণ। অন্তরঙ্গ কারণ স্বতন্ত্র :

অবতরি প্রভু প্রচারিলা সংকীর্তন।
এহো বাহ্য হেতু—পূর্বে করিয়াছি সূচন ॥
অবতারের আর এক আছে মুখ্য বীজ।
রসিকশেখর কৃষ্ণের সেই কার্য নিজ ॥
সেই রস আস্বাদিতে হৈল অবতার।
আনুসঙ্গে কৈল সব রসের প্রচার ॥

৩

ভক্তগণের মতে, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের মুখ্য কারণ—রাধাকৃষ্ণলীলা-রসাস্বাদন স্বরূপের কড়চায় আছে :

রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিঃ হ্লাদিনীশক্তিরস্মাৎ-
একাত্মনাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতি সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥

—'রাধা কৃষ্ণের প্রণয়বিকৃতি স্বরূপ, তাঁরই হ্লাদিনীশক্তি, অতএব একাত্ম। কিন্তু তা সত্ত্বেও পূর্বে লীলানিমিত্ত তাঁরা দেহভেদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। অধুনা আবার তাঁরা একাত্মতা-প্রাপ্ত হয়েছেন। রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত প্রকট কৃষ্ণস্বরূপ সেই চৈতন্যকে প্রণাম করি।'

গৌড়ীয় বৈষ্ণবভক্তের মতে, রাধাকৃষ্ণের অদ্বয় স্বরূপে বিলাসরস আস্বাদনের নিমিত্ত চৈতন্যদেবের আবির্ভাব। শ্রীরূপ গোস্বামীর উক্তির আলোকে কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন :

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি ॥
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞি।
ভাব আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঞি ॥

বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি গরীব খাঁর একটি পদে এই তত্ত্বটি সার্থক কাব্যরূপ লাভ করেছে :

শরমে শরম পালায়ে গেল।
রাই কানু দুটি তনু য্যামন দুধে জলে ম্যাশায়ে গেল ॥···
জানি কার রূপ পাথারে চাঁদ গৌর হয়েছে ॥

রাধাকৃষ্ণ মূলে এক ; লীলার জন্য তাঁদের এই দ্বিধা সত্তা। রাধাকৃষ্ণের এই অভিন্নত্বের তত্ত্ব শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পরিস্ফুট হয়েছে নিম্ন ভাষায় :

রাধা পূর্ণ শক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ ॥
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কোন ভেদ ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ ॥

এই দ্বিধাসত্তাই চৈতন্যদেবে আবার ঐক্য প্রাপ্ত হয়েছে। লীলারস আস্বাদনের গূঢ় কারণটি ব্যক্ত হয়েছে স্বরূপ দামোদরের একটি শ্লোকে :

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ-
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভ সিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥

—শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা কিরূপ, শ্রীরাধা কর্তৃক আস্বাদ্য আমার অদ্ভুত মধুরিমাই বা কিরূপ, আমাকে অনুভব করে শ্রীরাধার সুখই বা কিরূপ—এরই লোভে শচীগর্ভরূপ সিন্ধুতে রাধাভাবযুক্ত গৌরাঙ্গের আবির্ভাব। চৈতন্যচরিতামৃতকারের ভাষায়—

এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ।
বিজাতীয় ভাবে তাহা নহে আস্বাদন॥
রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার বিনে।

সেই কারণেই,

প্রেমভক্তি শিখাইতে আপনে অবতরি।
রাধাভাবকান্তি দুই অঙ্গীকার করি॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্বরূপে কৈল অবতার।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী মহাপ্রভুর আবির্ভাবের এই অন্তরঙ্গ কারণ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। চৈতন্যতত্ত্ব ব্যাখ্যার আগে তিনি রাধার প্রেমমহিমা বিশ্লেষণ করেছেন:

রাধিকা হবেন কৃষ্ণের প্রণয় বিকার।
স্বরূপ শক্তি হ্লাদিনী নাম যাঁহার॥
হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ॥

(চৈ. চ. আদি ৪র্থ)

কবিরাজ গোস্বামী আরো বলেছেন:

হ্লাদিনীর সার প্রেম প্রেম সার ভাব।
ভাবের পরম কাষ্ঠা নাম মহাভাব॥
মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী।
সর্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি॥ (ঐ)

কান্তাশিরোমণি শ্রীরাধিকার নামের তাৎপর্য সম্পর্কে চৈতন্যচরিতামৃতকারের উক্তি:

কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে॥
কিম্বা প্রেমরসময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় এক রূপ॥
কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে॥

(চৈ. চ. আদি, ৪র্থ)

কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধিকাতেই নিবিষ্ট; রাধিকাও কৃষ্ণের বাঞ্ছাপূরণের জন্য সতত চেষ্টিত। তা সত্ত্বেও পূর্বে রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের লীলারস আস্বাদন-তৃষ্ণা পূর্তিলাভ করে নি। চৈতন্যদেবের আবির্ভাব সেই কারণেই—

এই মত পূর্বে কৃষ্ণ রসের সদন।
যদ্যপি করিল রস নির্য্যাস চর্বণ ॥
তথাপি নহিল তিন বাঞ্ছিত পূরণ।
যাহা আস্বাদিতে যদি করিল যতন ॥

এই তিন আস্বাদন তৃষ্ণার প্রথম তৃষ্ণাতেই কৃষ্ণ মনে করেন :

রাধিকার প্রেমে আমায় করায় উন্মত্ত ॥
না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।

স্বয়ং সচ্চিদানন্দ রসঘনবিগ্রহ বিষয়-জাতীয় কৃষ্ণের আশ্রয়-জাতীয় সুখের জন্য তৃষ্ণা জাগে। চৈতন্যদেবে একাধারে এই বিষয় ও আশ্রয়ের সমাবেশ—

সেই প্রেমার রাধিকা পরম আশ্রয়।
সেই প্রেমার আমি হই কেবল বিষয় ॥
বিষয় জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ।
আমা হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ে আহ্লাদ ॥
আশ্রয় জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়।
যত্নে নারি আস্বাদিতে কি করি উপায় ॥
কভু যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয়।
তবে এই প্রেমানন্দে অনুভব হয় ॥

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের দ্বিতীয় কারণ সম্পর্কে চৈতন্যচরিতামৃতকার বলেছেন :

স্ব-মাধুর্য দেখি কৃষ্ণ করেন বিচার ॥
অদ্ভুত অনন্তপূর্ণ মোর মধুরিমা।
ত্রিজগতে ইহার কেহ নাহি পায় সীমা ॥
এই প্রেম দ্বারা নিত্য রাধিকা একলি।
আমার মাধুর্যামৃত আস্বাদে সকলি ॥…
দর্পণাদ্যে দেখি যদি আপন মাধুরী।
আস্বাদিত হয় লোভ আস্বাদিতে নারি ॥
বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ উপায়।
রাধিকাস্বরূপ হৈতে তবে মন ধায় ॥

কৃষ্ণের অদ্ভুত ও অনন্ত মধুরিমা আস্বাদ করে রাধার সুখের সীমা নেই। কৃষ্ণেরও লোভ লাগে ; মৃগনাভী কস্তুরির ন্যায়—'আপনি আপনি চাহে করিতে আলিঙ্গন।' 'রূপ দেখি আপনার কৃষ্ণ হয় চমৎকার আস্বাদিতে মনে ওঠে কাম।' কিন্তু নিজেই নিজের মধুরিমা আস্বাদন করতে পারেন না। একমাত্র রাধাই পারেন—কৃষ্ণের মাধুর্যের নিত্য নবায়মান সুরভি উপলব্ধি করতে। তাই নিজের মাধুর্য উপলব্ধির তৃষ্ণাতেই শ্রীরাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করে চৈতন্যচন্দ্ররূপে কৃষ্ণের আবির্ভাব।

গৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবের তৃতীয় কারণটি আরো নিগূঢ়। কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন :

অত্যন্ত নিগূঢ় এই রসের সিদ্ধান্ত।
স্বরূপ গোসাঞি মাত্র জানেন একান্ত ॥
যেবা কেহ অন্যজনে সে তাঁহা হৈতে।
চৈতন্য গোসাঞির অত্যন্ত মর্ম যাতে ॥

এই নিগূঢ় কারণটি হোল : কৃষ্ণের মধুরিমা আস্বাদ করে রাধার সুখই বা কিরূপ, তা জানার অভীপ্সা। লোকধর্ম, বেদধর্ম, দেহধর্ম, গৃহ-কর্ম সব উপেক্ষা করে কৃষ্ণসুখ হেতু গোপীদের কৃষ্ণভজন, প্রেমসেবন—শুদ্ধ অনুরাগ বশেই। এই গোপীদের মধ্যে আবার 'রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি। যাহার মহিমা সর্ব শাস্ত্রেতে বাখানি ॥' মনে রাখতে হবে—এই অনুরাগ নিছক কাম নয়, শুদ্ধ প্রেম। চৈতন্যচরিতামৃতকারের ভাষায় কাম ও প্রেমের পার্থক্য নিম্নরূপ :

কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ ॥
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥
কামের তাৎপর্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য মাত্র প্রেম মহাবল ॥

'প্রেম সেবনে' গোপীগণের মধ্যে সর্বোত্তমা রাধিকার প্রেমের গূঢ়ত্ব ও গাঢ়ত্ব অনেক বেশি। রাধিকার প্রেমের দ্বারাই কৃষ্ণমাধুর্য সর্বাপেক্ষা বেশি পুষ্ট হয়। আবার কৃষ্ণ-মাধুর্য অনুভব করে রাধারও সুখের সীমা থাকে না। কৃষ্ণের লোভ জাগে রাধার সেই সুখ আস্বাদনের জন্য :

আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ ॥
নানা যত্ন করি আমি নারি আস্বাদিতে।
সে সুখ মাধুর্য ঘ্রাণে লোভ বাড়ে চিতে ॥
রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার।
প্রেমরস আস্বাদিল বিবিধ প্রকার ॥

এই হচ্ছে গৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবের তৃতীয় কারণ। এই তিনটি কারণেই রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব :

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি ব্রজেন্দ্রকুমার।
রসময়মূর্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার ॥
সেই রস আস্বাদিতে কৈল অবতার।
আনুষঙ্গে কৈল সব রসের প্রচার ॥

প্রকট কালের শেষ দ্বাদশ বৎসর মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ অবস্থায় কাল কাটত। রাধাভাবে বিভাবিত চৈতন্যদেবের সেই আর্তির চিত্র বাণীর রূপ লাভ করেছে বৈষ্ণব পদাবলী ও চৈতন্যজীবনী গ্রন্থসমূহে। কবিরাজ গোস্বামী তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় এই আর্তির চিত্র অঙ্কিত করেছেন ঃ

রাধিকার ভাবমূর্তি প্রভুর অন্তর।
সেইভাবে সুখ-দুঃখ ওঠে নিরন্তর ॥
শেষ লীলায় প্রভুর বিরহ উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ ॥
রাত্রে প্রলাপ করে স্বরূপের কণ্ঠ ধরি।
আবেশে আপন ভাব কহেন উঘারি ॥

মহাপ্রভুর দিব্যজীবন সাধনায় রাধা-ভাবের আনন্দ-বেদনা প্রত্যক্ষ রূপ লাভ করেছিল। ফলে বৈষ্ণবভক্ত চৈতন্যদেবের মধ্যেই রাধার বেদনামাধুর্য অনুভব করেছেন; বৈষ্ণব মহাজনগণ রাধার মিলন-বিরহের চিত্র আঁকতে চৈতন্যদেবের দিব্যভাবের মিলন-বিরহের চিত্র এঁকে-ছেন। চৈতন্যদেব সম্পর্কে ভক্তকবি তাই অঞ্জলি দিয়েছেন নিম্ন ভাষায় ঃ

যদি গৌরাঙ্গ না হইত কি মেনে হইত
কেমনে ধরিতাম দে।
রাধার মহিমা প্রেমরস সীমা
জগতে জানাত কে ॥
মধুরবৃন্দা-বিপিন-মাধুরী
প্রবেশ চাতুরি সার।
বরজ-যুবতী ভাবের ভকতি
শকতি হইত কার ॥

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের মূলসূত্র

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব এক অপূর্ব ঘটনা। বহিরঙ্গে নাম-সংকীর্তন এবং অন্তরঙ্গে রস-আস্বাদন দ্বারা তিনি চিত্তলোকে এক দিব্যভাবের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। তাঁর আচরিত প্রেমধর্মও এক আশ্চর্য সম্পদ। ঋগ্বেদের কাল থেকে ভারতে ভক্তিধর্মের বীজ উপ্ত এবং ক্রম প্রসারিত হয়ে মহীরূপ ধারণ করেছে সন্দেহ নেই। আচার্য শঙ্করের বেদান্তমতের প্রতিবাদে রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্ব ও বল্লভ—এই চারজন আচার্য যে ভক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা দান করলেন, চৈতন্যপ্রভুর ভক্তিধর্ম তার থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইতোপূর্বে জীবের আচরণীয় চতুবর্গের মধ্যে মুক্তিকেই শ্রেষ্ঠ বা সার বলা হয়েছে। রামানুজ প্রভৃতি বৈষ্ণব মহাজনগণও ভক্তিকে মুক্তির সাধন বলেছেন। মহাপ্রভুই সর্বপ্রথম বল্লেন যে, ভক্তিই চরম ও পরম পুরুষার্থ এবং তা সাধ্য। সুতরাং মহাপ্রভুর প্রচারিত প্রেমধর্ম জগত ও জীবনে এক অভিনব বাণী বহন করে আনল। তাঁর অনুপ্রেরণায় বৃন্দাবনের গোস্বামী প্রভুদের দ্বারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের তাত্ত্বিকতার বিশাল বনস্পতি মাথা তুলে দাঁড়ালো। শ্রীজীব গোস্বামীর ষট সন্দর্ভ, শ্রীসনাতন গোস্বামীর ভাগবত টীকা, শ্রীরূপ গোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণি ও ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন ও রস-তত্ত্বের রূপ নির্ণীত হ'ল। আর এ সবের মূলে আছেন রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীগৌরসুন্দর। বস্তুতঃ অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বই হোল গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের মূল ভিত্তি প্রতিষ্ঠা। সেই সঙ্গে গড়ে উঠল প্রেমতত্ত্ব, রসতত্ত্বের অপরূপ প্রাকার। বর্তমান ক্ষেত্রে সেই দার্শনিক ভিত্তি ও রসতত্ত্বের কিছু পরিচয় সংক্ষেপে দেওয়া গেল।

।। কৃষ্ণতত্ত্ব ।।

'অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ। ব্রহ্ম-আত্মা-ভগবান তিন তার রূপ।' কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ রসঘন বিগ্রহ, মাধুর্যের ঘনীভূত সার। তিনি সর্বৈশ্বর্য, সর্বশক্তি ও সর্বরসপূর্ণ। রসরূপে তিনি আস্বাদ্য, রসিকরূপে আস্বাদক। তিনি নিজে আনন্দ অনুভব করেন, অন্যকেও অনুভব করান। তিনি স্বপ্রকাশ। তাঁর অনন্তশক্তির অসংখ্য বৈচিত্র্য আছে। তার মধ্যে চিৎ, জীব ও মায়া—এই তিন শক্তি প্রধান। চিৎ শক্তির অন্য নাম স্বরূপ শক্তি। স্বরূপ শক্তির আবার তিন রূপ—সৎ, চিৎ, আনন্দ। সদংশে সন্ধিনী, আনন্দাংশে হ্লাদিনী এবং চিদংশে সম্বিৎ শক্তির শুদ্ধসত্ত্ব প্রকাশ। সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ অনাদি, আবার সকলের আদি, সকল কারণের কারণ। তিনি লীলা করেন আনন্দলাভের উদ্দেশ্যে। লীলা শব্দের অর্থ খেলা। এই লীলার মধ্যে আবার নরলীলা সর্বোত্তম—'কৃষ্ণের যতেক লীলা, সর্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাঁহার স্বরূপ।' কৃষ্ণের মাধুর্যেরও পরিসীমা নেই। 'যেরূপের এক কণ ডুবায় সব ত্রিভুবন, সর্ব প্রাণী করে আকর্ষণ।' স্বয়ং কৃষ্ণের 'আপন মাধুর্য হরে আপনার মন। আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন।' আর এই মাধুর্যই ভগবত্তার সার। কৃষ্ণ অখিল-রসামৃতসিন্ধু, শৃঙ্গাররসরাজ, অপ্রাকৃত নবীনমদন, আত্মপর্যন্ত-সর্ব-চিত্তহর, সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ। তিনি আবার কারুণ্যের পূর্ণতম বিকাশ। এই করুণা বশে মায়াবদ্ধ জীবকে উদ্ধারের জন্য নররূপে তাঁর আর্বিভাব—'লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর স্বভাব,।

শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম, স্বরাট, আপ্তকাম, অন্য নিরপেক্ষ। তিনি স্বরূপে অবস্থান করেন। আবার জীব ও মায়াশক্তিতে তিনিই প্রকাশিত। তিনি রসস্বরূপ—আস্বাদ্য, রসিকরূপে আস্বাদক। হ্লাদিনী শক্তির সর্বানন্দাতিশয়কে তিনিই পরম কৌতুকে ভক্ত হৃদয়ে সঞ্চারিত করেন। ভক্তহৃদয়ে সেটাই কৃষ্ণপ্রীতিরূপে বিরাজিত ও বিকাশিত।—"সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন। ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥" আর এই রসাস্বাদনের অভিপ্রায়েই চৈতন্যরূপে তাঁর আবির্ভাব—'আনের আছুক কাজ আপনে শ্রীকৃষ্ণ। আপন মাধুর্যপানে হইয়া সতৃষ্ণ॥ স্বমাধুর্য আস্বাদিতে করেন যতন। ভক্তভাব বিনা নহে তাহা আস্বাদন। ভক্তভাব অঙ্গীকরি হৈলা অবতীর্ণ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে সর্বভাবে পূর্ণ॥'

॥ গোপীতত্ত্ব ॥

গুপ্-ধাতুর অর্থ রক্ষা করা। যাঁরা কৃষ্ণকেও বশীকরণ যোগ্য প্রেম রক্ষা করেন, তাঁদের গোপী বলা হয়। গোপীগণ আত্মবুদ্ধিসম্পন্না নহেন। কৃষ্ণ-সুখের জন্যই তাঁদের সদা সর্বদা চেষ্টা। 'কৃষ্ণ সুখের তাৎপর্য—গোপীভাববর্য।' গোপীদের এই প্রেমকে প্রাকৃত কাম বলা যায় না। কাম ক্রীড়া সাম্যে এ নাম। কৃষ্ণের বংশী নিনাদে সমাজ-সংসারের সব আকর্ষণ গোপীর কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। ব্রজগোপী-সকলেই কৃষ্ণের স্বরূপ শক্তির অংশ।

সেবার প্রকার ভেদে গোপী আবার দু'প্রকার—সখী ও মঞ্জরী। সখী রাধার সমজাতীয়া। তিনি স্বীয় দেহ দ্বারাও কৃষ্ণের সেবা করেন। তিনি কৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি। কিন্তু মঞ্জরী নিজাঙ্গ দিয়ে কৃষ্ণের সেবা করেন না। রাধাকৃষ্ণের মিলনের আনুকূল্য-বিধান তাঁর প্রধান কর্তব্য। রাধাকৃষ্ণের লীলারস পুষ্টির জন্য অন্তরঙ্গ সেবার অধিকার মঞ্জরীর। অন্তরঙ্গ সেবায় এদিক থেকে সখীদের চেয়ে মঞ্জরীদের অধিকার বেশী। তবে সাধারণ ভাবে সখী ও মঞ্জরী—উভয়েই সখী নামে অভিহিতা। লীলা বিস্তার ও পুষ্টি সাধন করেন সখী—

সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার॥
সখী বিনা এই লীলা পুষ্ট নাহি হয়।
সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়॥…
সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
কৃষ্ণসহ নিজ লীলায় নাহি সখীর মন॥
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজ কেলি হইতে তাহে কোটি সুখ পায়॥

কৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তি শ্রীরাধা। তা সত্ত্বেও গোপীদের প্রয়োজন কেন? কারণ—'বহু কান্তা নহে বিনা রসের উল্লাস।' রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকল্পলতা, আর সখীগণ তার পাতা, ফুল ইঃ;—"রাধার স্বরূপ-কৃষ্ণ-প্রেমকল্পলতা। সখীগণ হয় তার পল্লব-পুষ্প-পাতা।" কৃষ্ণকে তাঁরা যে সেবা করেন, তা নিজ নয়, কৃষ্ণসুখের জন্য।—"কৃষ্ণ মোরে কান্তা করি, কহে তুমি প্রাণেশ্বরী, মোর হয় দাসী অভিমান॥"

।। রাধাতত্ত্ব ।।

রাধা কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির পূর্ণতম বিকাশ, কৃষ্ণের স্বরূপ শক্তির অংশ। কৃষ্ণ অংশী, রাধা অংশ। মৃগমদ ও তার গন্ধ, অগ্নি ও তার দাহিকাশক্তির মধ্যে যেমন ভেদ নেই, রাধাকৃষ্ণও তেমনি অবিচ্ছেদ্য :

রাধা পূর্ণ শক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ ॥
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কোন ভেদ ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ ॥

রাধা সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে :

হ্লাদিনীর সার প্রেম প্রেম সার ভাব।
ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব ॥
মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্বগুণ খনি কৃষ্ণ কান্তা শিরোমণি ॥

রাধা মূল কান্তা শক্তি— লক্ষ্মী, মহিষী ও ব্রজাঙ্গনারূপের বিস্তার রাধা থেকে। এই বিস্তারের কারণ 'বহু কান্তা নহে বিনা রসের উল্লাস।' কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধিকাতেই বর্তমান, রাধা-ও কৃষ্ণের বাঞ্ছা পূর্ণ করেন। রাধা সর্বদা কৃষ্ণগতপ্রাণা :

কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে ॥
কিম্বা প্রেম রসময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় একরূপ ॥
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে ॥

রাধা কৃষ্ণের শক্তির অংশ হলেও লীলা রস পুষ্টির জন্য রাধার প্রেমের উৎকর্ষ অধিক প্রকাশিত। সব ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের খনি কৃষ্ণ রাধার প্রেমে উন্মত্ত হয়ে ওঠেন—'রাধিকার প্রেম গুরু, আমি-শিষ্য-নট।' রাধার গূঢ়, গহন প্রেমের আকর্ষণ-শক্তিই কৃষ্ণকে বশীভূত করে।

রাধা নায়িকা, চন্দ্রাবলী প্রতিনায়িকা। দুজনের মধ্যে পার্থক্য হোল—রাধার প্রেম স্বসুখবাসনাগন্ধলেশশূন্য, কৃষ্ণপ্রীতিবিধানই একমাত্র তাঁর লক্ষ্য। কিন্তু চন্দ্রাবলীর কৃষ্ণপ্রীতিতে আত্মসুখ লাভের কিছু ইচ্ছা বর্তমান।

তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্বথাধিকা।
মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতি বরীয়সী ॥ (উ. নী.)

—রাধা ও চন্দ্রাবলী—এই দুজনের মধ্যে রাধাই সর্বশ্রেষ্ঠ। কারণ ইনি অতুলনীয় গুণশালিনী এবং মহাভাবস্বরূপিণী।

মধুরা, কিশোরী, মহাভাব-স্বরূপা, অপাঙ্গ দৃষ্টিচঞ্চলা, উজ্জ্বলস্মিতা, সৌভাগ্যরেখাযুক্তা, সঙ্গীতনিপুণা, বিদগ্ধা, বিনীতা, লজ্জাশীলা, ধৈর্যশীলা, গম্ভীরা, কৃষ্ণপ্রেয়সী শ্রেষ্ঠা, রম্যবাক্—ইত্যাদি পঁচিশটি গুণে রাধা ভূষিতা।

।। প্রেমতত্ত্ব ।।

কৃষ্ণের অনন্ত শক্তির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে হ্লাদিনীশক্তি। হ্লাদিনী শক্তির অর্থ আনন্দস্বরূপ ও আনন্দদায়ী শক্তি। হ্লাদিনীর সার প্রেম। তাই প্রেম পরম আস্বাদ্য—'রতিরানন্দরূপৈব'। হ্লাদিনীর আস্বাদ্য চিদানন্দ। তাও পরম আস্বাদ্য। তাই প্রেমকে বলা হয়—'আনন্দচিন্ময় রস'। প্রেমের এই আনন্দ একাধারে আস্বাদ্য ও আস্বাদক—নিজেকে নিজে আস্বাদন করতে পারে, অন্যকেও করাতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, কৃষ্ণ রস স্বরূপ—'রসো বৈ সঃ।' তিনি অখিলরসামৃতসিন্ধু—সব রসের বিষয় ও আশ্রয়। তিনি নিত্য, শাশ্বত, অপ্রাকৃত হয়েও আস্বাদ্যরূপে সকলের চিত্তে আকাঙ্ক্ষার উদ্‌গাতা। কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা তাই দুই কারণেই। তিনি শৃঙ্গার-রসরাজ, সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথনকারী। রাধার প্রেমসাধনার চরম স্তর মহাভাব। তাঁর সান্নিধ্যে তাই কৃষ্ণের মাধুর্যের চরমতম প্রকাশ—'রাধা সঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ।'

প্রেম অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তু। প্রাকৃত জীবের পক্ষে এই প্রেম লাভ করা সম্ভব নয়। প্রাকৃত চিত্তের মালিন্য দূরীভূত হলে শুদ্ধ সত্ত্বের বৃত্তি বিশেষ প্রেমের প্রকাশ সম্ভব। সাধন ভক্তির ফলে এর উদ্বোধন হয়। প্রেমের উদয়ে লৌকিক কামনাবাসনা, দূরীভূত হয়ে যায়।

'প্রীতির্ণ যাবন্ময়ি বাসুদেবে ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবৎ'—ভগবান বাসুদেবে যতক্ষণ না প্রীতি আবির্ভাব হয়, ততক্ষণ দেহসম্বন্ধ থেকে কেউ মুক্তিলাভ করতে পারে না। প্রীতির মুখ্যফল ভগবৎ-দর্শন (ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি)। হরিপ্রেমে মত্ত ব্যক্তি নিজের সুখদুঃখ কিছুই জানেন না, তিনি শুধু পরমানন্দে মত্ত থাকেন—

ভাবোন্মত্তো হরেঃ কিঞ্চিন্ন বেদ সুখমাত্মনঃ।
দুঃখঞ্চেতি মহেশানি পরমানন্দ আপ্লুতঃ॥

(নারদ পঞ্চরাত্র)

কাম ও প্রেমের তাৎপর্য সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ লৌহ আর হেমের মধ্যে যে ব্যবধান, কাম ও প্রেমের মধ্যেই তাই—

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

প্রেম যখন অধিকতর পরিপক্ক হ'তে থাকে, তখন কয়েকটি স্তর লক্ষ করা যায়। চৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছেঃ

সাধন ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হৈলে তাঁরে প্রেম নাম কয়॥
প্রেম বৃদ্ধি ক্রমে স্নেহ মান প্রণয়।
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয়॥
যৈছে বীজ, ইক্ষু, রস, গুড়, খণ্ডসার।
শর্করা, সিতা, মিশ্রি, উত্তম মিশ্রি আর॥

মহাভাব প্রেমস্তরের সর্বোচ্চ তল। এটি একটি পারিভাষিক শব্দ। এই অবস্থায় রাধা ও কৃষ্ণ—উভয়ের চিত্ত বিগলিত হয়ে এমন একীভূত হয়ে যায় যে, দুটি চিত্ত যে ভিন্ন, তা জানা যায় না, এমন কি ভেদের ভ্রমও জন্মে না। কৃষ্ণপ্রিয়া ব্রজগোপীদেরই এই মহাভাব সংবেদ্য—"ব্রজদেব্যেকসংবেদ্যো মহাভাবাখ্যযোচ্যতে ॥" মহাভাব দু'প্রকার—রূঢ় ও অধিরূঢ়। রূঢ় মহাভাব মহাভাবের প্রথম স্তর। এ অবস্থায় সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়। মহাভাব রূঢ় অপেক্ষা অনির্বচনীয় রূপধারণ করলে হয় অধিরূঢ় মহাভাব। এ আবার দু'প্রকার—মোদন ও মাদন। মোদন অর্থে মিলন জনিত আনন্দ, আর মাদন অর্থে মিলন জনিত মত্ততা বোঝায়। মোদন বিরহে মোহন নামে অভিহিত হয়। —'সম্ভোগে মদন বিরহে মোহন নাম তাঁর।' মাদন—তথা মোহন—ভাবের পরম-কাষ্ঠা অর্থাৎ গাঢ়তম স্তর বা চরম পরিণতি। ইহা কেবল শ্রীমতী রাধিকাতেই সম্ভব—

সর্বভাবোদ্গমোল্লাসী মাদনোহয়ং পরাৎপরঃ।
রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃ সদা॥ (উ. নী.)

॥ প্রেমবিলাসবিবর্ত ॥

'বিবর্ত' শব্দের তিনটি অর্থ—পরিপাক, ভ্রম, বিপরীত। প্রেমবিলাসবিবর্তে এই তিনটি অর্থই সুপ্রযুক্ত। রায় রামানন্দের সঙ্গে সাধ্য-সাধন তত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে রায় কান্তাপ্রেম সর্বসাধ্যসার, রাধার প্রেম সাধ্য-শিরোমণি—একথা বলার পর চৈতন্যদেব রাধাকৃষ্ণের লীলাবিলাসমহত্ত্ব সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তখন রায় স্বরচিত একটি সঙ্গীত প্রভুকে শোনান। গানটি—

পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥
ন সো রমণ না হাম রমণী।
দুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি॥
এ সখি সে সব প্রেম কাহিনী।
কানু ঠামে কহবি বিছুরহ জানি॥
না খোঁজলুঁ দূতী, না খোঁজলুঁ আন।
দুহু কেরি মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ॥
অবসোই বিরাগ তুহুঁ ভেল দূতী।
সুপুরুষ প্রেম কি ঐছন রীতি॥

"ন সো রমণ না হাম রমণী। দুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি॥"—এই উক্তির মধ্যে প্রেমবিলাসবিবর্তের মূল রহস্য সংগুপ্ত। রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিলাস যখন চরম অবস্থায় উন্নীত হয়, অর্থাৎ পরিপক্কতা লাভ করে, তখন দুটি লক্ষণ প্রকাশ পায়—ভ্রম, বিপরীত অবস্থা। ভ্রান্তির ফলে তখন কে রমণ, কে রমণী—এ বোধ লোপ পেয়ে যায়। তখন তন্ময়তাবশে নায়ক-নায়িকা বিপরীত আচরণ করে। তখন রাধা নিজেকে রমণজ্ঞানে ও কৃষ্ণ নিজেকে

রমণীজ্ঞানে তদ্রূপ আচরণ করেন। বিলাসের অতি মাত্র পরিপক্ক অবস্থায় রাধাকৃষ্ণের এরূপ আত্মবিস্মৃতি ঘটে—ভেদজ্ঞান লুপ্ত হয়ে উভয়ে একমনা হয়ে যান।

॥ ভক্তিতত্ত্ব ॥

পরতত্ত্ব কৃষ্ণ রসস্বরূপ— তিনি আনন্দচিন্ময়, লীলাময়, মাধুর্যের রসঘন বিগ্রহ। সেই আনন্দস্বরূপ কৃষ্ণের সেবা-বাসনার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হওয়ার উপায় ভক্তি। ভক্তিই ভজন। একমাত্র ভক্তির দ্বারাই ভগবান প্রাপণীয়—'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ'। চৈতন্য চরিতামৃতে আছে :

কর্মতপ যোগজ্ঞান, বিধিভক্তি জপ-ধ্যান,
ইহা হইতে মাধুর্য দুর্লভ।
কেবল যে রাগমার্গে, ভজে কৃষ্ণ অনুরাগে
তারে কৃষ্ণ মাধুর্য সুলভ ॥

ভক্তির সূত্রেই উপলব্ধ হয় যে, রসস্বরূপ সেই পরমতত্ত্ব সমস্ত জিজ্ঞাসা, উপলব্ধি, আনন্দের একমাত্র উৎস,—পরমাগতি ও পরমাসম্পৎ। রসঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভই ভক্তের একমাত্র লক্ষ্য। অহৈতুকী ভক্তির উৎকর্ষ বশেই তা সম্ভব। চৈতন্যদেব শিক্ষাষ্টকে বলেছেন :

ন ধনং ন জনং সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভগবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী সদা ত্বয়ী ॥

—হে জগদীশ্বর, আমি ধন, জন, সুন্দরী বণিতা, কবিতা কিছুই চাই না। শুধু তোমাতেই যেন জন্মজন্মান্তর ধরে আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে।

নরোত্তমঠাকুর বলেছেন : সেই সে পরম ধর্ম পুরুষের হয়।
কৃষ্ণপদে অহৈতুকী ভক্তি সু-নিশ্চয় ॥

শ্রীরূপ গোস্বামী উত্তম ভক্তির এই লক্ষণ নির্দেশ করেছেন—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

—অন্যাভিলাষিতাশূন্য, জ্ঞানকর্মাদিদ্বারা অনাবৃত অথচ আনুকূল্যাত্মক কৃষ্ণ-অনুশীলনকে উত্তম ভক্তি বলে। এ ছাড়া তিনি আরো বলেছেন যে, যিনি শাস্ত্র পড়ে এবং শাস্ত্রযুক্তি দিয়ে কৃষ্ণই যে শ্রেষ্ঠ আরাধনার ধন, এ কথা বোঝেন এবং বুঝিয়ে দিতে পারেন, তিনিই উত্তম ভক্ত।

ভক্তি দু' ধরণের—সাধ্যভক্তি ও সাধন ভক্তি। সাধ্য ভক্তিকে বলা হয় রাগাত্মিকা ভক্তি। এই প্রেমভক্তি স্বতঃস্ফূর্ত—কোন সাধন-ভজনের, লোকধর্ম, দেহধর্ম, বেদধর্মের অপেক্ষা রাখে না। ব্রজগোপীদের প্রেম এ-জাতীয়। নিত্য বৃন্দাবনের নিত্য পরিকরবৃন্দের স্বাতন্ত্র্যময়ী রাগাত্মিকা ভজন তাঁদের নিত্য আত্মধর্ম, স্বভাবসিদ্ধ। কিন্তু নিত্য অনু-স্বভাব জীবের পক্ষে কৃষ্ণভক্তি সাধন-সাপেক্ষ। এই সাধন-ভক্তি আবার দু'প্রকার—বৈধি ভক্তি, রাগানুগা ভক্তি।

রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়।
বৈধী ভক্তি বলি তারে সর্বশাস্ত্রে কয় ॥

বিধিমার্গের পথিক শাস্ত্রের অনুশাসন অনুসারে ভজনে প্রবৃত্ত হন। এ স্তরে ভগবানের ঐশ্বর্য ও মহিমার স্মৃতি ভক্তের মনে জাগরূক থাকে। কিন্তু ঐশ্বর্য জ্ঞানে বিধিমার্গে ভজন করে ব্রজভাব পাওয়া যায় না—চতুর্বিধা মুক্তি পেয়ে বৈকুণ্ঠ লাভ করে মাত্র।

কৃষ্ণ বলেন— 'ঐশ্বর্যজ্ঞানে সব জগত মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য শিথিল প্রেমে নহে মোর প্রীত॥

শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, বন্দন, পাদসেবন, পূজন, আত্মনিবেদন, দাস্যতা, সখ্যতা—এই নববিধা ভক্তির কোন একটি অবলম্বনে সাধক ভজন করেন—

শ্রবণং কীর্তনম্ বিষ্ণোঃ স্মরণম্ পাদসেবনম্।
অর্চনম্ বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম নিবেদনম্॥

সাধন ভক্তির বিবিধ অঙ্গের কথা বৈষ্ণবশাস্ত্রে বলা হয়েছে। বৈষ্ণব মতে, এই অঙ্গ চৌষট্টি প্রকার। তাদের মধ্যে পাঁচটি অঙ্গকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে।—

সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, ভাগবত শ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকল সাধনশ্রেষ্ট এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্পসঙ্গ॥

কিন্তু রাগানুগা ভক্ত শাস্ত্রযুক্তি না মেনে ব্রজপরিকরগণের আনুগত্য স্বীকার করে অসমোর্দ্ধ-মাধুর্যময় কৃষ্ণের ভজন করেন। ভক্তের নিকট রাগাত্মিকা ভক্তি পরম সাধ্যবস্তু। এই সাধ্যের জন্য সাধন হবে রাগানুগ ভাবে অর্থাৎ অনুরূপ রাগে রুচি উদ্বোধিত করে লীলা-রস আস্বাদন করা। রাগাত্মিকা ও রাগানুগা প্রসঙ্গে শ্রীরূপ গোস্বামী বলেছেন :

ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা॥
বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু।
রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে॥

—পরম অভীষ্ট বস্তুতে যে স্বাভাবিক পরম আবিষ্টতা (তৃষ্ণা) তাকে রাগ বলে। এই রাগময়ী ভক্তিকেই রাগাত্মিকা ভক্তি বলে। ব্রজবাসীজনের মধ্যে প্রকাশ্যভাবে অভিব্যক্ত যে রাগাত্মিকা ভক্তি, তার অনুগত ভক্তিকে বলে রাগানুগা ভক্তি।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন :

রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম।
তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্॥
লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্রযুক্তি না মানে রাগানুগার প্রকৃতি॥

রাগানুগা ভক্তিমার্গের সাধক ভগবানকে নিতান্ত আপনার জন বলে মনে করেন। মাধুর্যের সার, শুদ্ধসত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা-ই বৈষ্ণব সাধকের প্রধান কাম্য। কিন্তু নিত্যসিদ্ধ

প্রেম জীবের সাধ্য নয় বলে জীব গোপীর অনুগত হয়ে সেই পরম বিগ্রহের আনন্দময় লীলা-বৈচিত্র্য উপলব্ধি করে। তাই-ই রাগানুগা ভক্তি। রাগানুগা ভক্তির উদাহরণ :

দুহুঁ মুখ নিরখিব দুহুঁ অঙ্গ পরশিব
সেবন করিব দোঁহাকার ॥
ললিতা বিশাখা সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে
মালা গাঁথি দিব নানা ফুলে।
কনক সম্পুট করি কর্পূর তাম্বুল ভরি
জোগাইব অধর যুগলে ॥

॥ শক্তিতত্ত্ব ॥

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥
সূর্য্যাংশ কিরণ যৈছে অগ্নি জ্বালাচয়।
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন শক্তি হয় ॥

কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি বৈচিত্র্য বর্তমান। তার মধ্যে তিনটি শক্তি প্রধান—চিৎ শক্তি, জীব শক্তি ও মায়া শক্তি। চিৎ শক্তির অন্য নাম স্বরূপ শক্তি—কারণ চিৎ শক্তি সর্বদা কৃষ্ণের স্বরূপে অবস্থান করে। একে অন্তরঙ্গা শক্তিও বলা হয়। কারণ এই শক্তির বলেই লীলাময় ভগবান অন্তরঙ্গ লীলা-বিলাস করেন। কৃষ্ণ স্বরূপে সৎ, চিৎ ও আনন্দময়। স্বরূপ শক্তিরও তাই তিনটি রূপ—

আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি ॥

সন্ধিনী শক্তির বলে ভগবান নিজের ও অপরের অস্তিত্ব রক্ষা করেন ; সম্বিৎ শক্তির দ্বারা তিনি জানতে পারেন, জানাতেও পারেন ; হ্লাদিনী শক্তির দ্বারা ভগবান কৃষ্ণ নিজে আনন্দ অনুভব করেন ও অপরকেও করান। এই হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেমের সার ভাব, ভাবের সার মহাভাব। রাধিকা এই মহাভাব স্বরূপিণী। চিৎশক্তির অনন্ত বৈভব বর্তমান। শুদ্ধ সত্ত্বময় বৈকুণ্ঠাদি ধাম ও তার নিত্য পরিকরগণ ভগবানের হ্লাদিনী, সম্বিৎ ও সন্ধিনীময় স্বরূপ শক্তির প্রকাশ। কৃষ্ণের লীলার সহায় কারণে চিৎশক্তির অন্য প্রকাশ যোগমায়া রূপে।

জীব শক্তিকে বলা হয়েছে তটস্থা শক্তি—'জীবশক্তি তটস্থাখ্য নাহি তার অন্ত।' কারণ জীবশক্তি অন্তরঙ্গা চিৎশক্তি ও বহিরঙ্গা মায়াশক্তি—কোনটিরই অন্তর্গত নয়, অথচ যে কোন দিকেই যেতে পারে। মায়ার আবরণ ছিন্ন করে জীব কৃষ্ণমুখীন হ'তে পারে ; আবার মায়াপাশে আবদ্ধ হ'য়ে কৃষ্ণবিমুখী হ'য়ে জগৎ-সংসারকেই একান্ত আপন বলে মগ্ন থাকতে পারে।

মায়াশক্তি বহিরঙ্গা শক্তি, জগৎ সৃষ্টির কারণ স্বরূপ। এই শক্তির অবস্থান প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে—'তাঁহার বৈভবানন্ত প্রাকৃতের গণ।' অন্তরঙ্গা চিৎশক্তির কাছে মায়াশক্তি যেতে

পারে না—যেমন পারে না, আলো ও অন্ধকার একসঙ্গে থাকতে। মায়ার দুটি বৃত্তি—গুণমায়া, জীবমায়া। গুণমায়া জগতের গৌণ উপাদান কারণ। সত্ত্ব, রজ ও তম—তার তিন বৈশিষ্ট্য। জীবমায়া জগতের গৌণ নিমিত্ত কারণ—তা জীবকে মায়াপাশে আবদ্ধ করে কৃষ্ণ-বিমুখী করে তোলে। 'কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥' এ প্রচেষ্টা কৃষ্ণের মাধুর্যকে আরো ঘনীভূত ও আকর্ষণযোগ্য করে তুলবার জন্য। তা ছাড়া ভগবানের অনন্ত শক্তি এক রূপেরই বহুধা বিচিত্র প্রকাশ মাত্র—'অনন্তরূপে একরূপ কিছু নাহি ভেদ।'

॥ সাধ্যসাধন তত্ত্ব ॥

দাক্ষিণাত্যে গোদাবরী তীরে রায় রামানন্দের সঙ্গে আলোচনাকালে চৈতন্যদেব তাঁকে সাধ্যসাধনতত্ত্ব সম্পর্কে দিক-নির্ণয় করতে বলেন। সাধ্যবস্তু অর্থে—আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমই যে আমদের চরম ও পরম সাধ্যবস্তু—রায় রামানন্দের আলোচনায় তা প্রকাশ পায়। এই প্রেম আসলে প্রেমভক্তি।

রামানন্দ কিন্তু প্রথমেই শেষ কথাটি না বলে একেবারে মূল থেকে আরম্ভ করেছেন। প্রথমেই বললেন—'স্বধর্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়।' স্বধর্মাচরণ আসলে ভক্তি নয়। কিন্তু বিষ্ণু-আরাধনার হেতু বলে তাতে ভক্তির আরোপ করা হয়। বিষ্ণুপুরাণে ভগবান বলেছেন—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষকারণম ॥

—সেই পরম পুরুষ বিষ্ণুকে বর্ণাশ্রমধর্মীরা যে বিধিমতে আরাধনা করেন, তা ছাড়া তাঁকে তুষ্ট করার আর কোন পন্থা নেই। কিন্তু চৈতন্যদেব তাকে 'এহো বাহ্য' বললেন। কারণ এ হোল বিধিমার্গে ধর্মাচরণের কথা, এটা বহিরঙ্গ ব্যাপার, এতে দেহাবেশও বর্তমান। এরপর রামানন্দ বললেন, 'কৃষ্ণে কর্মার্পণ সাধ্যসার।' এ বিষয়ে গীতায় উক্ত হয়েছে—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্ ॥

—হে কৌন্তেয়, তুমি যে কর্ম কর, যা ভোজন কর, যে যজ্ঞ কর, যা দান কর, যে তপস্যা কর, তার সব কিছুই আমাকে অর্পণ কর। মহাপ্রভু তাকেও বাহ্যবস্তু বলে অভিহিত করলেন। কারণ এ কর্মার্পণ প্রকৃতপক্ষে বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের সচেতন প্রয়াসে, অতএব তা আত্মবোধের কথা। রায়ের পরের কথা—'স্বধর্ম ত্যাগ সাধ্যসার'। গীতার এইটি শেষ কথা। শ্রীভগবান অর্জুনকে বললেন—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

—সব ধর্ম ত্যাগ করে একমাত্র আমারই শরণ নাও। শোক কোরো না। আমিই তোমাকে সকল পাপ থেকে মুক্ত করব।

ভগবান এই বাণীকে বলেছেন সর্বগুহ্যতম—'সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচ।'

শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত হয়েছে—

আজ্ঞায়ৈব গুণান্ দোষাণ্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ ॥

—ধর্মের গুণ এবং অধর্মের দোষ জেনেও আমার আদিষ্ট সব ধর্মকে ত্যাগ করে যে আমার ভজনা করে সেই শ্রেষ্ঠ সজ্জন (সাধু)। কিন্তু প্রভু তাকেও 'এহো বাহ্য' বললেন। কারণ, এই ধর্মত্যাগ হৃদয়ের ঐকান্তিকতার বশে নয়, কৃষ্ণ উপদেশ দিয়েছেন তাই। তাছাড়া মোক্ষবাঞ্ছা ভক্তিমার্গের অন্তরায়। মহাপ্রভুর মতে, ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্বর্গই অজ্ঞান বা কৈতব। কৈতব শব্দের অর্থ বঞ্চনা। অন্য ত্রিবর্গের তো কথাই নেই, এমন কি মোক্ষকামীও ভগবানের করুণা উপলব্ধিতে অসমর্থ। মুক্তি পঞ্চবিধা— সালোক্য, (সমান লোকপ্রাপ্তি), সারূপ্য (সমরূপ প্রাপ্তি), সামীপ্য (সম অবস্থান প্রাপ্তি), সার্ষ্টি (সম ঐশ্বর্যপ্রাপ্তি), সাযুজ্য (ঈশ্বরে লয় প্রাপ্তি)। এর কোনটাই ভক্তের কাম্য নয়। মহাপ্রভুর মতে—

অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ বাঞ্ছা আদি সব ॥
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হয়েছে—

সালোক্যসার্ষ্টিসারূপ্যসামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥

—আমার সেবাকামীরা সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য, সাযুজ্য—এই পঞ্চবিধ মুক্তি পেলেও গ্রহণ করে না।

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদি চতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোহণ্যৎ কালবিপ্লুতম্ ॥

—আমার সেবায় যারা পূর্ণচিত্ত, তারা বিনাশশীল স্বর্গ তো দূরের কথা, সালোক্যাদি চতুঃপ্রকার মুক্তিও চায় না। এরপর রামানন্দ বললেন—'জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তি সাধ্যসার'। এই উক্তির সমর্থনে তিনি গীতার নিম্ন শ্লোকটি উদ্ধৃত করলেন—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥

—ব্রহ্মকে যিনি লাভ করেছেন, তাঁর আত্মা প্রসন্নতা লাভ করে। তিনি শোকও করেন না, আকাঙ্ক্ষাও করেন না। সকল জীবের প্রতি তাঁর সম দৃষ্টি। আর তিনি আমাতে পরাভক্তি লাভ করেন। এখানে ভক্তির কথা থাকলেও প্রভু তাকে 'এহো বাহ্য' বললেন। কারণ, যে ভক্তি জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে, সেখানে প্রেমের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ সম্ভব নয়, জ্ঞানই সেখানে সব পথ জুড়ে বসে থাকে। রায় পরে বললেন, 'জ্ঞানশূন্যা ভক্তি সাধ্যসার।' রায় রামানন্দের এই উক্তির সমর্থনে ভাগবতের এই উক্তি—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্তাম্।
স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্‌মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥

—জ্ঞানলাভের ইচ্ছা ত্যাগ করে যাঁরা শরীর, মন ও বাক্যে সদাচারী হয়ে সজ্জন মুখে তোমার কথা শুনে জীবন ধারণ করেন, তাঁরা প্রায়শঃ তোমাকে জয় করেন, যদিও ত্রিলোকে তুমি অজেয়। এর অর্থ হোল, ঈশ্বরতত্ত্ব সম্পর্কে কোন জ্ঞান লাভের চেষ্টা না করে ভগবৎ কথা শ্রবণে প্রেমের আবির্ভাব হতে পারে। এবার প্রভু বললেন, 'এহো হয়'। কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়। তাই প্রভু বললেন, 'আগে কহ আর।' এরপর রায় বললেন—'প্রেমভক্তি সর্বসাধ্যসার।' এই বক্তব্যের সমর্থনে রায় নিজকৃত দুটি শ্লোক উদ্ধার করলেন। তার একটি—

কৃষ্ণভক্তিরস ভাবিতা মতিঃ
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং
জন্ম কোটি সুকৃতৈর্ন লভ্যতে ॥

—যদি কোথাও কৃষ্ণভক্তি পাওয়া যায়, তাহলে কৃষ্ণভক্তিরসে বিভাবিত মন কিনে নাও। তাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাই তার একমাত্র মূল্য। কোটি জন্মের সুকৃতি দিয়েও তা পাওয়া যায় না। সেই পরম রসসমুদ্রকে আস্বাদনের একমাত্র উপায়—অহৈতুকী প্রেম—'প্রেম মহাধন। কৃষ্ণকে মাধুর্য রস করায় আস্বাদন ॥' এমন কি যাঁরা ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করেছেন, তাঁরাও এই মাধুর্যের লোভে কৃষ্ণ ভজনায় প্রবৃত্ত হন। এই প্রেমভক্তিকে প্রভু বললেন, 'এহো হয়।' কিন্তু আরো কিছু শুনতে চাইলেন—'আগে কহ আর।' তখন রায় রামানন্দ প্রেমভক্তির বিভিন্ন স্তর—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—প্রেম সম্পর্কে বললেন। দাস্য প্রেম সম্পর্কে প্রভু 'এহো হয়' বললেন। সখ্য, বাৎসল্য, মধুর প্রেমকে তিনি উত্তম বললেন। সঙ্গে সঙ্গে আরো কিছু আছে কিনা জানতে চাইলেন। রায়ের মতে, 'কান্তা প্রেমই সর্বসাধ্যসার।' এরপর রায় গোপীতত্ত্ব, কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব, প্রেমবিলাস-বিবর্ত পর্যন্ত আলোচনা করলেন। রায়ের শেষ কথা—'রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি'। তখন প্রভু বললেন—'সাধ্যবস্তুর অবধি এই হয়।'

কৃষ্ণতত্ত্ব রাধাতত্ত্ব প্রেমতত্ত্ব সার।
রসতত্ত্ব লীলাতত্ত্ব বিবিধ প্রকার ॥
এত তত্ত্ব মোর চিত্তে কৈলে প্রকাশন।
ব্রহ্মারে বেদ যেন পড়াইল নারায়ণ ॥

এরপর মহাপ্রভু সাধনতত্ত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন—'সাধ্যবস্তু সাধন বিনু কেহ নাহি পায়। কৃপা করি কহ দেখি পাবার উপায় ॥' এ সাধন জীবের প্রয়োজনে। জীবের পক্ষে গোপীদের অনুগত সাধনে কৃষ্ণের অনুগ্রহ লাভ সম্ভব—'সখি ভাবে তাঁরে যেই করে অনুগতি ॥ রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়। সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায় ॥'

॥ অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব ॥

ব্রহ্ম ও জীবের সম্বন্ধ নির্ণয়ে বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন মত পোষণ করেন। শঙ্করাচার্যের মতে, জীব-ব্রহ্মের অভেদ সম্পর্ক; ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়, জগৎ মিথ্যা প্রতিভাসমাত্র। আচার্য মধ্বর মতে, জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদের সম্পর্ক। আচার্য রামানুজ অদ্বৈতবাদী। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনে, জীব ও ব্রহ্মের সম্পর্ক যুগপৎ ভেদ ও অভেদের। এ ভেদাভেদ-বাদ অচিন্ত্যনীয়। বাসুদেব সার্বভৌম ও প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে বেদান্ত বিচার এবং সনাতন গোস্বামীকে উপদেশ দান কালে মহাপ্রভুর এই অভিমত প্রকাশ পায়।

গৌড়ীয় মতে, জীব অংশ, কৃষ্ণ অংশী। কৃষ্ণের অনন্তশক্তি। তার মধ্যে—স্বরূপ, মায়া ও জীব—এই তিনটি শক্তি প্রধান। জীব-জগৎ কৃষ্ণের এই জীবশক্তির অংশ।

অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য ভাসে।
তৈছে জীব গোবিন্দের অংশ প্রকাশে ॥

জীব কৃষ্ণের তটস্থা শক্তির অংশ। অন্তরঙ্গা চিৎশক্তি ও বহিরঙ্গা মায়াশক্তি—এ দুয়ের মধ্যে এর অবস্থান। জীবের সঙ্গে ব্রহ্মের যে সম্বন্ধ, তা হোল—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থ শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥
সূর্যাংশ কিরণ যেন অগ্নি জ্বালাচয়।

জীব স্বরূপে ব্রহ্মের নিত্যদাস। ভগবানের অহৈতুকী সেবা তার একান্ত কর্তব্য। কিন্তু বহিরঙ্গা মায়ার কবলে পতিত হ'লে জীব অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তির বিমুখী হয়। অথচ জীব ও ব্রহ্ম চিদ্রূপে এক। জীব অনুচৈতন্য, ব্রহ্ম বিভুচৈতন্য। চিৎ-বস্তু রূপে জীব ও ব্রহ্মে অভেদ; আবার অনু ও বিভুর মানদণ্ডে জীব-ব্রহ্মের ভেদ বর্তমান। এই ভেদাভেদ সম্বন্ধ বুঝানোর জন্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন :

মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কোন ভেদ ॥

জীব-ব্রহ্মের সম্পর্কও তদ্রূপ। মৃগনাভি কস্তুরী ও তার সুগন্ধ—এ দুটিকে স্বতন্ত্র মনে করা যায় না। আবার দূরবর্তী স্থানে রক্ষিত কস্তুরীর সুগন্ধ যখন পাওয়া যায়, তখন সেই সুগন্ধ যে কস্তুরীর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য—একথাও মনে করা যায় না। কিন্তু দেখা গেছে, কস্তুরী ও তার গন্ধকে পৃথক করা যায় না। তেমনি অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তি সম্পর্কেও একই কথা। উষ্ণত্বের দিক থেকে স্ফুলিঙ্গ অগ্নির সঙ্গে অভেদমূলক, কিন্তু তাকে অগ্নিও বলা যায় না। জীব ও ব্রহ্মেরও তেমনি যুগপৎ ভেদ ও অভেদের সম্বন্ধ। এই ভেদাভেদ আবার অচিন্ত্যনীয়। এ কারণে এ তত্ত্বের নাম অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব। সমগ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের সার সূত্র এই তত্ত্ব।

॥ পুরুষার্থ ॥

পুরুষার্থ অর্থে অভীষ্ট বা আকাঙ্ক্ষিত বস্তু বুঝায়। আমরা এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব ভার নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি। পার্থিব মানুষ

আমরা সুখের জন্য লালায়িত। ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে মানুষ সুখের সন্ধানে রত। প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুবর্গকে সুখ প্রাপ্তির চরম উপায় বলে বর্ণনা করেছেন। কেউ ইন্দ্রিয়জ সুখ, কেউ অর্থজ সুখ, কেউ স্বধর্মাচরণের মাধ্যমে সুখের অন্বেষণ করেন। আবার কেউ কেউ এই জগৎ-সংসারকে অনিত্য মনে করে ইহলোকের সুখ অপেক্ষা মোক্ষের পদে পারলৌকিক সুখ লাভের সাধনা করেন। কিন্তু মহাপ্রভু এসে জগৎ-সংসারকে নতুন কথা শোনালেন। তিনি জানালেন—অন্য তিন বর্গের তো যথার্থ পুরুষার্থতা নেইই, এমন কি মোক্ষেরও নেই। তিনি বললেন:

অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ বাঞ্ছা আদি সব॥
তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হইতে কৃষ্ণ-ভক্তি হয় অন্তর্ধান॥

মহাপ্রভুর মতে, পঞ্চম ও চরম পুরুষার্থ হোল প্রেম—যা মানবকে চিরন্তন সুখের সন্ধান দিতে পারে।

কৃষ্ণ বিষয়ক প্রেমা—পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমানন্দমৃত সিন্ধু।
মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু॥

॥ জীবতত্ত্ব ॥

বিষ্ণুশক্তিঃ পরাপ্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥

(বিষ্ণুপুরাণ ৬।৭।১১)

—বিষ্ণুর তিনটি শক্তি—পরা, অপরা ও অবিদ্যা। অপরাই ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তি এবং অবিদ্যাকে কর্মসংজ্ঞা এক তৃতীয় শক্তি বলা হয়। এই পরাপ্রকৃতিই জীবশক্তি—ঈশ্বরের তটস্থা শক্তি। চরিতামৃতে বলা হয়েছে—

ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন জ্বলিত জ্বলন।
জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥
জীবতত্ত্ব শক্তি কৃষ্ণতত্ত্ব শক্তিমান॥

পরাপ্রকৃতি সম্পর্কে 'গীতা'র বাণী—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ॥

—হে মহাবাহু! এটি অপরা প্রকৃতি। আমার অন্য একটি প্রকৃতি বর্তমান—সেটি পরাপ্রকৃতি। সেই পরাপ্রকৃতিই জীবশক্তি ধারণ করে আছে। 'এই জীবশক্তি ঈশ্বরের স্বরূপশক্তি বা মায়াশক্তি—কোনটারই অন্তর্ভুক্ত নহে। ইহা ঈশ্বরের জীবশক্তির অংশ। শঙ্করাচার্য বিবর্তবাদের দ্বারা জীবকে ঈশ্বরের বিকার বলে অভিমত প্রকাশ করেন; তাঁর

মতে, ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে কোন ভেদ নেই। কিন্তু চৈতন্যদেবের মতে, 'বস্তুত পরিণামবাদ সেই ত প্রমাণ।' বস্তুর অবস্থান্তর প্রাপ্তির নাম পরিণাম। সেই মতে, ব্রহ্ম অংশী, জীব অংশ মাত্র।—

অবিচিন্ত্য শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছায় জগদ্রূপে পায় পরিণাম ॥

শ্রীচৈতন্যদেব আরো বলেন—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥
সূর্যাংশে কিরণ যৈছে অগ্নি জ্বালাচয়।

॥ সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্ব

"সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়কে বলে সম্বন্ধ-তত্ত্ব। যাঁহা হইতে সমস্ত জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়, যাঁহাতে সমস্ত জগৎ অবস্থিত, তিনিই সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় ॥"

(চৈ. চ. —ভূমিকা। ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ)

ব্রহ্ম সব শক্তির মূলাধার—তিনি শক্তিমান। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান—সব কিছুই ব্রহ্ম। ব্রহ্মের অনন্ত শক্তি-বৈচিত্র্য রয়েছে। তার মধ্যে স্বাভাবিক তিন শক্তি পরিণতি—চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। মায়াবদ্ধ জীব সংসার-সাগরে হাবুডুবু খায় কৃষ্ণকে ভুলে গিয়ে—

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ ॥

—ঈশ্বর থেকে দূরে সরে গিয়ে সে ঈশ্বরকে ও নিজের স্বরূপকে ভুলে যায়। কিন্তু 'সাধু-শাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়। সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য়।' সুতরাং ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধজ্ঞান অনুধাবন তার একমাত্র কাম্য।—

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি স্বতঃ কৃষ্ণজ্ঞান।
জীবের কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ পুরাণ ॥
শাস্ত্রগুরু আত্মরূপে আপনা জানান।
কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা জীবেরে জানান ॥
বেদ শাস্ত্র কহে সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন।
কৃষ্ণপ্রাপ্য সম্বন্ধ ভক্তি প্রাপ্যের সাধন ॥
অভিধেয় নাম ভক্তি প্রেম প্রয়োজন।
পুরুষার্থ শিরোমণি প্রেম মহাধন ॥

জীব ও কৃষ্ণের স্বরূপ অনুধাবন করাকে বলে সম্বন্ধ, আর অভিধেয় হোল কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়।

অতএব ভক্তি কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়।
অভিধেয় বলি তারে সর্বশাস্ত্রে গায় ॥

প্রয়োজন বলতে যে উদ্দেশ্যে সাধনা বা উপাসনা তাকে বুঝায়। মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে সম্বন্ধ ও অভিধেয়—এই দুই তত্ত্বের সঙ্গে প্রয়োজন তত্ত্বও শিক্ষা দিয়েছিলেন। জীবের অভিধেয় হোল রাগানুগা ভক্তিমার্গের অনুশীলন, যার ফলে কৃষ্ণচরণে প্রীতির অঙ্কুর জন্মে। আর সেই প্রীতির অঙ্কুর থেকে উদ্ভূত হয় রতি ও ভাব। এতেই কৃষ্ণ বশীভূত হন এবং যার থেকে 'কৃষ্ণের প্রেম সেবন' করা সম্ভব হয়। এখানেই প্রশ্ন আসে—প্রেমের প্রয়োজন কেন? আর প্রেমই বা কাকে বলে? এর উত্তরে শ্রীরূপ গোস্বামী বলেছেন যে, ঈশ্বরের হ্লাদিনী শক্তির সার হোলো ভাব। এ যেন প্রেমরূপ সূর্যের কিরণ। এতে কৃষ্ণকে প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা থাকায় ইহা মনকে স্নিগ্ধ ও সমুজ্জ্বল করে তোলে। আর সেই ভাবই গাঢ় হয়ে উঠলে তাকে বলে প্রেম। এই প্রেম মনকে সরস ও মমতাময় করে তোলে। সব কিছু বাদ দিয়ে একমাত্র কৃষ্ণের প্রতি যে মমতা, তাকেই বলে ভক্তি। কবিরাজ গোস্বামী বলেন—

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ যে করয়॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্তন।
সাধনভক্ত্যে হয় সর্বানর্থ-নিবর্তন॥
অনর্থ নিবৃত্তি হৈতে ভক্ত্যে নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয়।
রুচি হৈতে ভক্ত্যে হয় আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণপ্রীত্যঙ্কুর॥
সেই ভাব গাঢ় হৈলে ধরে পেম নাম।
সেই প্রেম প্রয়োজন সর্বানন্দ ধাম॥

(সর্বানর্থ নিবর্তন=সকল প্রকার অমঙ্গল নিবারণ; প্রীত্যঙ্কুর=ভাব, রতি)

প্রথমে শ্রদ্ধা, তারপর সাধুসঙ্গ, ভজন ক্রিয়া, অনর্থনাশ, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব, প্রেম—পর্যায়ক্রমে এক একটির প্রতিক্রিয়ার এরূপ বিভিন্ন স্তরবিন্যাস। যার হৃদয়ে এই ভাবের অঙ্কুর দেখা যায়, তার মধ্যে কতগুলি শারীরিক ও মানসিক লক্ষণ প্রকাশ পায়। যেমন—ক্ষমা, সদা নামগান, অনাসক্তি, কৃষ্ণকে পাওয়ার আশা ও উৎকণ্ঠা, নামকীর্তনে রুচি, কৃষ্ণানুরাগ, কৃষ্ণের বসতিস্থানের প্রতি প্রীতি প্রভৃতি। এই প্রেম আবার পর্যায়ক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাবস্তর পর্যন্ত পৌঁছায়। প্রেম যত পরিশুদ্ধ, তত নির্মল হয়। অধিকারী ভেদে রতি পাঁচ প্রকার—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর।

এই পঞ্চ স্থায়ীভাব হয় পঞ্চরস।
যে রসে ভক্ত সুখী, কৃষ্ণ হয় বশ॥
প্রেমাদিক স্থায়ী ভাব সামগ্রী মিলনে।
কৃষ্ণভক্তি রসরূপ পায় পরিণামে॥

বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী ভাবের মিশ্রণে স্থায়ী ভাব রসে পরিণত হয়। —'দধি যেন খণ্ড মরিচ কর্পূর মিলনে। রসালাখ্য রস হয় অপূর্বাস্বাদনে। বিভাব দু'প্রকার—আলম্বন ও উদ্দীপন। বংশীস্বরাদি উদ্দীপন, আর কৃষ্ণাদি আলম্বন বিভাব। স্মিত হাস্য, নৃত্যগীতাদি উদ্ভাসর—অনুভাব। স্তম্ভ প্রভৃতি সাত্ত্বিক অনুভাব। নির্বেদ, হর্ষ প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব তেত্রিশ প্রকার।—'সব মিলি রস হয় চমৎকারকারী।' শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—রস এই পাঁচ প্রকার। এদেরও সীমা আছে। শান্তরতি প্রেম, দাস্যরতি রাগ, সখ্য ও বাৎসল্য অনুরাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। শান্তের যোগ ও বিয়োগ—এই দুই এবং সখ্য ও বাৎসল্যে যোগের অনেক বিভেদ রয়েছে। মধুর রসের দু ভাগ—রূঢ় ও অধিরূঢ়—'মহিষীগণের রূঢ় অধিরূঢ় গোপিকা নিকরে॥' অধিরূঢ় ভাব আবার দু'প্রকার—'সম্ভোগে মাদন বিরহে মোহন তার নাম॥' চুম্বন প্রভৃতি মাদনের অনন্ত ভেদ। যাতে সাত্ত্বিক ভাবসমূহ উদ্দীপিত হয়ে প্রকাশ পায়, তাকে মোদন বলে। বিরহ অবস্থার মাদনকে মোহন বলে। মোহন দু'প্রকার—উদ্ঘূর্ণা ও চিত্ররূপ। উদ্ঘূর্ণার অর্থ বিরহের আবেশে নানারূপ চেষ্টা। চিত্রজল্পে প্রিয়জনের দর্শনে গূঢ়রোষ এবং উৎকণ্ঠামূলক উক্তি। চিত্রজল্প দশপ্রকার— প্রজল্প, পরিজল্প, বিজল্প, উজ্জল্প, সংজল্প, অবজল্প, অভিজল্প, আজল্প, প্রতিজল্প ও সুজল্প। উদ্ঘূর্ণায় বিবশচেষ্টা দিব্যোন্মাদ নামে পরিচিত। এতে—'বিরহে কৃষ্ণস্ফূর্তি, আপনাকে কৃষ্ণ-জ্ঞান॥' শৃঙ্গার দু'প্রকার—সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ। সম্ভোগ অনন্তপ্রকার। বিপ্রলম্ভ চতুর্বিধ—পূর্বরাগ, মান, প্রবাস ও প্রেমবৈচিত্ত্য। কবিরাজ গোস্বামী বলেন—

নায়ক নায়িকা দুই রসের আলম্বন।
সেই দুই শ্রেষ্ঠ রাধা ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

—সেই মতে ভক্তদের পঞ্চভাবের স্বাধনা। —'এই রস আস্বাদন নাহি অভক্তের গণে / কৃষ্ণভক্তগণ করে রস আস্বাদনে॥'

প্রেম প্রয়োজনতত্ত্ব বিষয়ে মহাপ্রভু সনাতনকে এই শিক্ষাই দিয়েছেন। স্বয়ং শ্রীভগবানের উক্তি—

'যে তু ধর্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্যু্যপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ॥

—যিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে এই ধর্মামৃত সম্যক্‌রূপে পান করেন, সেই পরমভক্ত আমার অতীব প্রিয়।'

পরবর্তী আধ্যায়ে প্রেমতত্ত্বের নানা দিক্ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হবে।

॥ প্রেমতত্ত্ব ॥

গীতায় শ্রীভগবান্ বলেছেন ঃ

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥

—আমাতে মন সমর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, আমাকে পূজা কর, আমাকে নমস্কার কর। তুমি আমার প্রিয়। তোমাকে সত্য বলি—তুমি আমাকে পাবে। মাধুর্যের ভগবত্ত্বাসার পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করাই জীবজগতের চরম ও পরম কাম্য। এটাই চরম ও পরম পঞ্চম পুরুষার্থ। ভক্তের শুদ্ধসত্ত্বচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি বা অনুরাগ সঞ্চারিত হলে আত্মবুদ্ধি ও সংসার-বাসনা লোপ পায়। স্ব-সুখ বাসনা অপেক্ষা কৃষ্ণপ্রীতির ইচ্ছাই তখন বলবতী হয়ে ওঠে। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছার অপর নাম প্রেমভক্তি। আর এই কৃষ্ণভক্তি-প্রেমরূপ সর্বসাধ্যসার।—'তত্ত্ব-বস্তু—কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-ভক্তি, প্রেমরূপ।' "ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি"—ভক্তিই সাধকের নিকট ভগবানকে প্রকাশ করায়। আর ভক্তি বা প্রীতি হ্লাদিনীর সারভূত অংশ—সেজন্যই কৃষ্ণরতি আনন্দরূপা—'রতিরানন্দরূপৈব'। নিত্যসিদ্ধ ভক্ত-চিত্তে এই কৃষ্ণরতি চিরন্তন ও স্বতঃস্ফূর্ত, কিন্তু সাধারণ জীবের পক্ষে এই রতি স্ফূর্তির জন্য সাধনের একান্ত প্রয়োজন। কবিরাজ গোস্বামী বলেন :

শুদ্ধভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উৎপন্ন।
অতএব শুদ্ধভক্তির কহিয়ে লক্ষণ॥
অন্যবাঞ্ছা অন্যপূজা ছাড়ি জ্ঞান কর্ম।
আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥

অতএব, কৃষ্ণানুশীলন অর্থাৎ সাধনের প্রভাবে চিত্তে কৃষ্ণরতির উদ্‌গম হয়—তাতে কৃষ্ণকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর হয়ে হঠে। এই রতি বা ভাব কাকে বলে? উত্তরে রূপ গোস্বামী বলেন—

শুদ্ধ সত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেম-সূর্যাংশু সাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে॥

—"ভগবানের যে হ্লাদিনী অর্থাৎ আনন্দদায়িনী শক্তি, তার সার হলো ভাব। ইহা যেন প্রেমরূপ সূর্যের কিরণ, অথচ ইহা তীব্র নয়। শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা এতে রয়েছে বলে ইহা মনকে স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল ক'রে তোলে।"

'নারদপঞ্চরাত্রে' বলা হয়েছে—

অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম-প্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ॥

—বিষ্ণুতে প্রেমসঙ্গতা মমতাকে ভক্তি বলে।

এই ভক্তি সাধনবশে কিভাবে লাভ করা যায়, সে সম্পর্কে কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন—

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ যে করয়॥
সাধুসঙ্গ হইতে হয় শ্রবণ কীর্তন।
সাধন ভক্ত্যে হয় সর্বানর্থ নিবর্তন॥
অনর্থ নিবৃত্তি হৈতে ভক্তে নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হইতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয়॥

রুচি হৈতে ভক্তে হয় আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি-হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর ॥
যেই ভাব গাঢ় হইলে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেম প্রয়োজন সর্বানন্দ ধাম ॥

এই নব প্রীত্যাঙ্কুর যার চিত্তপটে ভেসে ওঠে, তার মধ্যে কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ পায়। লক্ষণগুলি এই :—ক্ষান্তি (ক্ষোভশূন্যতা), বিরাগ, মানশূন্যতা, কৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য উৎকণ্ঠা, নামগানে রুচি, কৃষ্ণকে পাওয়ার আশা (আশাবন্ধ), কৃষ্ণ-গুণগানে অনুরাগ, তীর্থস্থানে প্রীতি প্রভৃতি।

কৃষ্ণ-প্রীতি বা রতি ক্রমশঃ গাঢ় থেকে গাঢ়তর হ'তে হ'তে কয়েকটি স্তর অতিক্রম করে—

প্রেম ক্রমে বাড়ে হয় স্নেহ, মান, প্রণয়।
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয়।
বীজ ইক্ষুরস গুড় তবে খণ্ডসার।
শর্করা সিতা মিছরী শুদ্ধ মিছরি আর।
ইহা যৈছে ক্রমে নির্মল, ক্রমে বাড়ে স্বাদ।
রতি প্রেমাদিতে তৈছে বাঢ়য়ে আস্বাদ।

প্রেম :— সম্যঙ্ মসৃণিতস্বান্তো মমতাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে ॥ ভ. র. সি.)

—ভাব (রতি) গাঢ়তা প্রাপ্ত হলে সাধকের চিত্ত যখন সম্যক্‌রূপে মসৃণ এবং অতিশয় মমতাতিশয়াঙ্কিত হয়, তখন সেই রতিকে প্রেম বলা হয়। আরো বলা হয়েছে :

সর্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংস কারণে।
যদ্ভাববন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্তিতঃ ॥

—ধ্বংসের কারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না, যুবক-যুবতীর মধ্যে এরূপ ভাববন্ধনকে প্রেম বলে।

গাঢ়ত্ব, গুরুত্ব ও অতিশায়িতার কারণে প্রেম তিন প্রকার—প্রৌঢ়, মধ্য ও মন্দ।

বিলম্ব বা কিঞ্চিৎ অনুপস্থিতির কারণে নায়িকার চিত্তবৃত্তি না জানার জন্য অন্যজনের মনে ক্লেশদায়ক প্রেমকে প্রৌঢ় প্রেম বলে। মধ্যপ্রেমে নায়ক এক নায়িকার সঙ্গে মিলিত হয়েও অন্য নায়িকার প্রতি আকর্ষণ বোধ করে অর্থাৎ দু'জনের মধ্যে সমভাব পোষণ করে, তাকে মধ্য প্রেম বলে। আর সর্বদা ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও সান্নিধ্যের দরুণ যাতে ত্যাগ বা আদর কিছুই থাকে না, তাকে বলে মন্দ প্রেম। প্রৌঢ় প্রেমে অনুপস্থিত নায়িকার জন্য নায়ক প্রেমের দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করে। কিন্তু মধ্যে প্রেমে নায়ক অন্য কান্তার অনুভব সহ্য করে। আর মন্দ প্রেমে আদর বা উপেক্ষা কোনটারই প্রাবল্য থাকে না। প্রৌঢ় প্রেমে থাকে বিচ্ছেদের অসহিষ্ণুতা, মধ্য প্রেমে—'কৃচ্ছ্রাৎ সহিষ্ণুতা' অর্থাৎ কোনমতে কষ্টে সৃষ্টে সহ্য করা যায়, মন্দ প্রেমে কখনোবা বিস্মৃতি-ও জন্মে।

স্নেহ :—

আরুহ্য পরমং কাষ্ঠাং প্রেমা চিদ্দীপদীপনঃ ॥
হৃদয়ং দ্রাবয়ন্নেষ স্নেহ ইত্যভিধীয়তে।
অত্রোদিতে ভবেজ্জাতু ন তৃপ্তির্দর্শনাদিষু ॥

—প্রেম চরম সীমায় উন্নীত হয়ে গাঢ়তাবশতঃ চিত্তকে উদ্দীপ্ত এবং হৃদয়কে দ্রবীভূত করলে তাকে স্নেহ বলে। স্নেহের আবির্ভাব ঘটলে শুধু দর্শনাদিতে তৃপ্তি ঘটে না। স্নেহের লক্ষণ —দর্শনে অতৃপ্তি ও চিত্তদ্রবতা। কনিষ্ঠ, মধ্যম ও শ্রেষ্ঠ ভেদে স্নেহ তিন প্রকার। অঙ্গস্পর্শে স্নেহ উপজিত হলে কনিষ্ঠ, দর্শনে মধ্যম এবং শ্রবণ হেতু ঘটলে শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হয়। অন্যভাবে, স্নেহ দু'প্রকার—ঘৃত স্নেহ ও মধু স্নেহ। অত্যন্ত আদরময় স্নেহকে ঘৃত এবং 'ইনি আমারই' এমন স্নেহকে মধু স্নেহ বলা হয়।

মান :—

স্নেহস্তূৎকৃষ্টতাব্যাপ্ত্যা মাধুর্য্যং মানয়ন্নবম্।
যো ধারয়ত্যদাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীর্ত্ত্যতে ॥

—যে স্নেহ নিজে উৎকর্ষ পেলে নব মাধুর্য অনুভব করায় এবং নিজে অদাক্ষিণ্যধারণ করে, তাকে মান বলে।

স্নেহ গাঢ় হয়ে উৎকর্ষ প্রাপ্ত হলে মাধুর্যকে নব নব আস্বাদে অনুভব করায়। সেই অবস্থায় বাহ্যিক বক্রতা বা কৌটিল্য প্রকাশ পায়। এ স্তরে ভাবের স্নেহ অপেক্ষা গাঢ়ত্ব ও চিত্তদ্রবতার আধিক্য প্রকাশ পায়। "অহেরিব গতি প্রেম্ণঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ"—প্রেমের গতি স্বভাব-বক্র। অবশ্য তাতে প্রেমের স্বাদ ও বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পায়।

মান দু'প্রকার—উদাত্তমান ও ললিতমান। ঘৃত স্নেহ গাঢ়ত্ব প্রাপ্ত হলে হয় উদাত্তমান, আর মধু-স্নেহ পক্কতায় ললিতমান। উদাত্ত মান আবার দু'প্রকার—দাক্ষিণ্যোদাত্ত মান ও বাম্যগন্ধোদাত্তমান। অন্তরে দাক্ষিণ্য, কিন্তু প্রকাশে অদাক্ষিণ্য—দাক্ষিণোদাত্তের লক্ষণ ; আর যেখানে অন্তরে বাম্যতা নেই, কিন্তু বাইরে বাম্যভাব প্রকাশ—সেখানে বাম্যগন্ধোদাত্ত মান।

প্রণয় :—মানো দধানো বিস্রম্ভং প্রণয়ঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ ॥

—মান গাঢ়তা প্রাপ্ত হয়ে বিস্রম্ভলাভ করলে তাকে বলে প্রণয়। বিস্রম্ভ শব্দের অর্থ— —অভেদ মনন। বিস্রম্ভ দু'প্রকার—মৈত্র্য ও সখ্য। সম্ভ্রমহীনতা ও সাধ্বস (স্বাধীনতা) হচ্ছে সখ্যতার লক্ষণ। গৌরবময় বিস্রম্ভকে মৈত্র্য বলে। এক্ষেত্রে নায়িকা স্বাধীনভর্তৃকার ন্যায় আচরণ করে। মৈত্র্যের সঙ্গে উদাত্তমান যুক্ত হলে সুমৈত্র্য এবং সখ্যের সহিত ললিতমান যুক্ত হলে সুসখ্য মান হয়।

রাগ :—

দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বে নৈব রজ্যতে।
যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্ত্যতে ॥

—প্রণয় যখন উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়ে অধিক দুঃখকেও সুখ বলে মনে করায়, তাকে রাগ বলে। রাগ দু'প্রকার—নীলিমা ও রক্তিমা। নীলিমা রাগ আবার নীলী ও শ্যামা—দুপ্রকার। কে

রাগ ব্যয় হয় না, বাইরেও যার প্রকাশ নেই অর্থাৎ ঈর্ষা-মানাদিকেও প্রকাশ করে না, তাকে বলে নীলী রাগ। আর যে রাগ কিছুটা প্রকাশ পায়, চিরকালের সাধ্য এবং ভীরুতার ভাণ—তাকে শ্যামা রাগ বলে।

রক্তিমারাগ কুসুম্ভ ও মঞ্জিষ্ঠাজাত। যে রাগ অন্য রাগের কান্তি প্রকাশ করে, তা কুসুম্ভরাগ। আর যে রাগ অন্যরাগের অপেক্ষা রাখে না, সর্বদা বেড়ে যায়, নষ্ট হয় না——তাকে মঞ্জিষ্ঠা রাগ বলে।

অনুরাগ—সদানুভূতমপি যঃ কুর্যান্নবনব প্রিয়ম্।
রাগোভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্যতে॥

—যে রাগ নিত্য নতুন বৈচিত্র্যধারণ ক'রে প্রিয়তমকে নতুন নতুন ভাবে অনুভব করায়, তাকে অনুরাগ বলে। অনুরাগের ক্রিয়া হচ্ছে—পরস্পর বশীভাব, প্রেমবৈচিত্ত্য, বিপ্রলম্ভে-ও বিস্ফূর্তি ইত্যাদি।

ভাব—অনুরাগঃ স্বসংবেদ্যদশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ।
যাবদাশ্রয়বৃত্তিশ্চেদ্ ভাব ইত্যভিধীয়তে॥

অনুরাগ যখন স্বসংবেদ্যদশা এবং যাবদাশ্রয়বৃত্তি প্রাপ্ত হয়, তাকে ভাব বলে। স্ব-সংবেদ্য=নিজের দ্বারা নিজের অনুভবের যোগ্য। যাবদাশ্রয় বৃত্তি=যে যে আশ্রয় আছে, তাদের সকলের উপরে ক্রিয়া (বৃত্তি) যার। এক কথায় বলতে গেলে, অনুরাগ নিজেকে অনুভবের অবস্থায় পৌঁছে সিদ্ধ ও সাধক ভক্তগণেও ব্যাপ্ত হয় অর্থাৎ যার অনুরাগে তাঁরাও বিবশ হয়ে থাকেন, তাকে বলে—'ভাব'।

মহাভাব:—

বরামৃতস্বরূপশ্রীঃ স্বঃ স্বরূপং মনো নয়েৎ॥

পরম আলৌকিক অমৃতময় সৌন্দর্য যার স্বরূপ এবং যার প্রতি নিজের মনকে আকৃষ্ট করায়, এমন ভাবকে বলে মহাভাব। মহাভাব কৃষ্ণের মহিষীগণেও অতি দুর্লভ; কেবল রাধা প্রভৃতি গোপীগণের অনুভববেদ্য। ভাবের পরাকাষ্ঠা হ'ল মহাভাব।

মহাভাব দু' প্রকার—রূঢ় ও অধিরূঢ়। সেখানে স্তম্ভ প্রভৃতি অষ্টসাত্ত্বিক ভাব প্রকটিত হয়, সেখানে রূঢ় মহাভাব। রূঢ়াখ্য মহাভাবে নিমেষের জন্যও অদর্শনে অ-সহতা, আসন্নজনতা হৃদ্ বিলোড়ন, সর্বদা বিস্মরণ, কল্পের ক্ষণতা-বোধ, কৃষ্ণসুখেও আর্তির আশঙ্কা—প্রভৃতি অনুভাবের লক্ষণ দেখা যায়।

মহাভাব রূঢ় অপেক্ষাও এক অনির্বচনীয় বিশিষ্টতা লাভ করলে তাকে অধিরূঢ় মহাভাব বলে। সুখ-দুঃখের অনির্বচনীয়তাই এখানে প্রধান।

অধিরূঢ় মহাভাব দু'প্রকার—মোদন ও মাদন। মোদনে উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাবের উদ্দীপ্ত অতিশায়িতা প্রকাশিত। মুদ্-ধাতু হইতে মোদনে শব্দ নিষ্পন্ন। "মুদ্-ধাতুর অর্থ—হর্ষ; সুতরাং মোদনে হর্ষ-মিলন জনিত বা সম্ভোগ জনিত আনন্দ সূচিত করিতেছে। আর মদ্-ধাতু হইতে মাদন শব্দ নিষ্পন্ন। মদ্-ধাতুর অর্থ—মত্ততা। সুতরাং মাদন শব্দে দিব্যমধু-বিশেষবৎ মত্ততা জনকত্ব—শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন জনিত আনন্দোন্মত্ততা—বুঝায়।"

(ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ)। মোদন বিচ্ছেদে মোহন নামে কথিক। মোহনে সাত্ত্বিকভাবগুলি—কৃষ্ণের সঙ্গে বিরহ দশায় সু-উদ্দীপ্ত হয়। মোহনের অনুভাব—অসহ্য দুঃখেও কৃষ্ণসঙ্গ লিপ্‌সা, ব্রহ্মাণ্ড ক্ষোভকারিতা, মৃত্যুর পরেও স্ব-ভূত অর্থাৎ দেহস্থ ভূতসমূহের দ্বারা কৃষ্ণ-সঙ্গের তৃষ্ণা, দিব্যোন্মাদ—প্রভৃতি।

দিব্যোন্মাদ ঃ—

এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ।
ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্র্যী দিব্যোন্মাদ ইতীর্য্যতে॥

দিব্যোন্মাদ এক অনির্বচনীয় বৃত্তিবিশেষ। এতে চিত্তের ভ্রান্তি ঘটে। "প্রেম-বৈবশ্যের ফলেই দিব্যোন্মাদ জন্মে। প্রেমবৈবশ্য বশতঃ কোন এক বিষয়ে সমস্ত চিত্তবৃত্তির একাগ্রতা বা কেন্দ্রীভূততা এবং অন্যবিষয়ে অনুসন্ধানহীনতা জন্মে। অন্যবিষয়ে অনুসন্ধানহীনতা হইতেই সেই বিষয়ে ভ্রমাভা বৈচিত্র্যীর উদ্ভব হইয়া থাকে।" (গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন)। দিব্যোন্মাদের উদ্‌ঘূর্ণা চিত্রজল্প প্রভৃতি ভেদ বর্তমান। উদ্‌ঘূর্ণা অর্থে ভ্রমময় চেষ্টা এবং জল্প অর্থে প্রলাপ বুঝায়। চিত্রজল্পের আবার প্রজল্প, পরিজল্প, বিজল্প—প্রভৃতি দশ প্রকার ভেদ দেখা যায়। শ্রীরাধার মত মহাপ্রভুর জীবনেও এই দিব্যোন্মাদ অবস্থা পরিলক্ষিত হয়েছিল।—

শেষলীলায় প্রভুর বিরহ-উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ॥
রায়ে স্বরূপের কণ্ঠ ধরি।
আবেশে আপন ভাব কহেন উঘারি॥

পরিকর ভেদে প্রেমসীমারও ভেদ হয়ে থাকে। কারণ সকলের পক্ষে সব ভাব আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। তাই শান্ত, দাস প্রভৃতি পাঁচ প্রকার পরিকরের প্রেমস্তরের সীমায়ও নিম্নরূপ—

শান্ত ভক্তের রতি বাঢ়ে প্রেম পর্যন্ত।
দাস ভক্তের রতি হয় রাগ দশা অন্ত॥
সখাগণের রতি অনুরাগ পর্য্যন্ত।
পিতৃ-মাতৃ-স্নেহ-আদি অনুরাগ অন্ত॥
কান্তাগণের রতি পায় মহাভাব সীমা।

———

ভক্তিরস

রস একপ্রকার মানসিক আস্বাদময় সম্বিত বিশেষ। সার্থক কাব্যপাঠ বা অভিনয় দর্শনের ফলশ্রুতি আনন্দ। এই আনন্দ অর্থাৎ 'ভালোলাগা'—এই-ই রস। রসের স্বরূপ এই যে, রস স্বপ্রকাশ, আনন্দচিন্ময়, বেদ্যান্তর-স্পর্শশূণ্য, ব্রহ্মস্বাদসহোদর এবং লোকোত্তর রসনিষ্পত্তি হ'য়ে থাকে। প্রাচীন আলংকারিকদের মতে এই রসের সংখ্যা নয়টি—শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত, শান্ত।

কিন্তু বৈষ্ণবরসবাদে রসের নতুনতর বিভাগ সৃজিত হোল। বৈষ্ণব মতে, মূলরসটি হচ্ছে —ভক্তি রস। অথচ পূর্ববর্তী রস-প্রবক্তাগণ ভক্তির রসতা-শক্তির কথা স্পষ্ট অস্বীকার করেছেন। তাঁদের মতে—ভক্তি দেবাদি-বিষয়া রতি, অতএব তা রস নয়, ভাব। —মম্মটভট্ট তাঁর কাব্য-প্রকাশে স্পষ্টই বলেছেন: 'রতির্দেবাদিবিষয়া ব্যভিচারি তথাঞ্জিতঃ। ভাবঃ প্রোক্তঃ॥'—দেবাদিবিষয়ক রতি ও ব্যঞ্জিত ব্যভিচারিকে ভাব বলা হয়। 'রস গঙ্গাধরে' আচার্য জগন্নাথও ভক্তির রসত্বের কথা অস্বীকার করে তাকে ভাব-রূপে অভিহিত করেছেন— 'ভক্তের্দেবাদিবিষয়ারতিত্বেন, ভাবান্তর্গততয়া রসত্বানুষ-পত্তেরিতি।'—ভক্তি হচ্ছে দেবাদি-বিষয়ারতি। দেবাদিবিষয়া রতি ভাবের অন্তর্গত। এজন্য ভক্তির রসতার উৎপত্তি হতে পারে না।'

এখানে সহজেই আমদের মনে একটি প্রশ্ন আসে যে, ভাব ও রসের স্বরূপ বৈশিষ্ট্য তাহলে কি? রূপ গোস্বামী রস ও ভাবের পার্থক্য সম্পর্কে বলেছেন—"ভাবনার পথ অতিক্রম করিয়া শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল চিত্তে যাহা চমৎকারাতিশয়রূপে অত্যধিকরূপে আস্বাদিত হয়, তাহাকে বলে রস। আর, অনন্যবুদ্ধি পণ্ডিতগণ ভাবনার পদে রাখিয়া গাঢ় সংস্কারের দ্বারা চিত্তে যাহার ভাবনা করেন, তাহাকে বলে ভাব॥" (শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ কর্তৃক অনুদিত)। ভাব রসের প্রথম অবস্থা। বিভাব-অনুভাব প্রভৃতি সংযোগে ভাবের রসরূপে আস্বাদ্য হওয়ার তিনটি স্তরের কথা বলা হয়েছে—ভাব সাক্ষাৎকার, ভাব-স্বরূপ, রস-সাক্ষাৎকার। ভাব বিভাবাদির ভাবনা দ্বারা রসরূপে পরিণতির যোগ্য (ভাবস্বরূপ) হয়, পরে বিভাবাদির সংযোগে রসরূপে পরিণত হয় (রস-সাক্ষাৎকার)। জীব গোস্বামীও বলেছেন—"সমাধিধ্যানয়োরেবানয়োর্ভেদ ইতি ভাবঃ।"—সমাধি ও ধ্যানের মধ্যে যে ভেদ, রস ও ভাবের মধ্যেও সেরূপ ভেদ দৃষ্ট হয়। নির্বিকল্প সমাধির অবস্থায় ধ্যানের বস্তু ভিন্ন অন্য কিছু উপলব্ধ হয় না, তেমনি রসাস্বাদনের সময়ে অখণ্ডতার উপলব্ধি জন্মে; বিভাব--অনুভাব-ব্যাভিচারি প্রভৃতি ভাবের পৃথক কোন বোধ জন্মে না। আবার ধ্যানের সময় অন্য ভাবনাও যেমন এসে পড়তে পারে, ভাবসাক্ষাৎকারে তেমনি বিভাব অনুভাবের চিন্তা জাগরূক থাকে।

লৌকিক রসপ্রমাতারা বলেন যে, বিভাব, অনুভাব ও ব্যাভিচারি ভাবের দ্বারা অপরিপুষ্ট স্থায়িভাবকে (রতি) যেমন রস বলা যাবে না, ভাবই বলতে হবে, তেমনি দেবাদি-বিষয়ারতিকে রস বলা যাবে না, ভাবই বলতে হবে। আর এই দেবাদিবিষয়ারতি রসে

পরিণত হ'তে পারে না। এ উক্তির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সম্ভবতঃ এই যে, দেবাদিবিষয়ক রতি বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সঙ্গে মিলিত হতে পারে না।

এর উত্তরে বৈষ্ণব আলঙ্কারিক বলেন যে, প্রাকৃত রসকোবিদ্‌গণ দেবতার অর্থ নির্ণয় করতে ভূল করেছেন বলেই দেবাদিবিষয়ারতি সম্পর্কে তাঁদের এই ভ্রান্ত মতবাদ। দেবতা দু'প্রকার—ঈশ্বরতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব। বাসুদেব, নারায়ণ প্রভৃতি ঈশ্বরতত্ত্ব—আনন্দরসঘন বিগ্রহ। কিন্তু ইন্দ্রদেব হচ্ছেন—জীবতত্ত্ব। সহৃদয় সামাজিক চিত্ত মায়িকগুণসম্পন্ন (সত্ত্বগুণও মায়িক); সুতরাং সত্ত্বগুণময় চিত্তে অপ্রাকৃত আনন্দনবৈবরতত্ত্ব বিষয়ক রতি অঙ্কুরিত হ'তে পারে না, ইন্দ্র প্রভৃতি জীবতত্ত্ব-দেবতা বিষয়ক রতিই অঙ্কুরিত হ'তে পারে মাত্র। ইন্দ্র দেবতা হলেও জীবতত্ত্ব, কিন্তু তাঁর আচার-আচরণ মনুষ্যজনোচিত নয়। সুতরাং তাঁর বিভাব প্রভৃতিও সহৃদয় সামাজিকের লৌকিক রতির অনুকূল কিম্বা পোষক হতে পারে না। ফলে রসপুষ্ট হয় না। এ কারণে জীব গোস্বামীর উক্তি—'যত্তু প্রাকৃতরসিকৈঃ রসসা -মগ্রীবিরহাদ্‌ভক্তৌ রসত্বং নেষ্টং তৎ খলু প্রাকৃতদেবাদিবিষয়মেব সম্ভবেৎ॥' অর্থাৎ প্রাকৃত রসকোবিদগণ ভক্তিতে রস-সামগ্রীর অভাববশতঃ ভক্তিতে রসত্ব নেই বলেন, তা প্রাকৃত দেবাদিবিষয়েই সম্ভব।'

রস-বর্জিত কোন ভাব হ'তে পারে না—এ কথা একাধিক রসতত্ত্ববিদ বলেছেন। ভরতের উক্তি—"ন ভাবহীনোঽস্তি রসো ন ভাবো রসবর্জিত।" ভাব ছাড়া রস হতে পারে না, রস ছাড়া ভাব হ'তে পারে না। তাহলে দেব-বিষয়ক রতিকে ভাব বলে অভিহিত করলে তার রসত্বকেও অস্বীকার করা যায় না। এই যুক্তিতে বলা যায় যে, প্রাকৃত দেবরতিরও রসরূপ সম্ভব, তবে তা গৌণভাবে এবং তাও অতি সামান্য। কিন্তু ভগবান রসস্বরূপ—'রসো বৈ সঃ'। রসরূপে তিনি আস্বাদ্য, রসিকরূপে তিনি আস্বাদক। একমাত্র ভক্তির বশেই সেই সচ্চিদানন্দ রসঘন বিগ্রহ পরমপুরুষের মাধুর্য ও লীলারস অনুভবের দ্বারাই জীবের চিরন্তনী সুখ-বাসনা চরম তৃপ্তি পায়। স্বয়ং ভগবানের উক্তি—'ভক্ত্যাঽহমেকয়া গ্রাহ্যঃ।'

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, আনন্দই হচ্ছে রস। অপূর্ব আস্বাদন-চমৎকার-আনন্দই রস। ভগবান রসস্বরূপ—আনন্দই স্বরূপে আস্বাদ্য ও আস্বাদক—দু ভাবেই কৃষ্ণ-মাধুর্য অসমোর্দ্ধ। এই অপূর্ব মাধুর্যের বশেই কৃষ্ণের—"আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন। আপনে আপনা চাহে করিতে আস্বাদন॥" কৃষ্ণের এই আস্বাদন-চমৎকারিত্বময় মাধুর্য—(রস ও আনন্দ) শক্তির কোন স্পষ্ট পরিচয় লীলাশুক বিল্বমঙ্গল দিতে পারেন নি, শুধু আকুলি বিকুলি করেছেন ; বলেছেন—'মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্। মধুগন্ধি মধুস্মিতমেতদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥ সনাতন শিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুও কৃষ্ণমাধুর্যের অনির্বচনীয়তার জন্য আকুলতা প্রকাশ করেছেন—'কৃষ্ণমাধুর্য অমৃতের সিন্ধু। মোর মন সান্নিপাতি সব পিতে করে মতি দুর্দৈব বৈদ্য না দেয় এক বিন্দু॥ মধুর হৈতে সুমধুর তাহা হৈতে সুমধুর তাহা হৈতে অতি সুমধুর। আপনার এক কণে ব্যাপে সব ত্রিভুবন। দশদিক ব্যাপে যার পূর॥" বস্তুতঃ রসিকশিরোমণি সর্বরসেরখনি, পরম রসময়, অসমোর্দ্ধমাধুর্য কৃষ্ণের আস্বাদ্যতার কোন তল নেই, কুল নেই। স্বয়ং কৃষ্ণ নিজেই নিজের মাধুর্যে চমৎকৃত,

আত্মহারা—'রূপ দেখি আপনার। কৃষ্ণ হয় চমৎকার। আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।' তাই তিনি একাধারে আস্বাদ্য এবং আস্বাদক—দুই-ই। আস্বাদকরূপে কৃষ্ণ স্বরূপের আনন্দ ও শক্তির আনন্দ আস্বাদ করেন। স্বরূপের আনন্দ আস্বাদন অর্থাৎ নিজের আস্বাদ্য রসস্বরূপের আস্বাদন, শক্তির আনন্দ আস্বাদন অর্থে তাঁর স্বরূপ শক্তির অন্তর্গত হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি বিশেষ যে প্রেমরস, তার আস্বাদন। সেই প্রেমরসই ভক্তিরস। এখানে কৃষ্ণ পরম রসিকশেখর।

বৈষ্ণব মতে, লৌকিক রতি কখনও রসে পরিণত হ'তে পারে না। কেন না রসাস্বাদনের চরম লক্ষ্য সুখ বা আনন্দ প্রাপ্তি। লৌকিক রতি প্রাকৃত চিত্তবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। মায়িকগুণসম্পন্ন প্রাকৃত চিত্তে বাহিরন্তকরণের ব্যাপারন্তর রোধক চমৎকার সুখ যে রস, তা স্ফূর্ত হ'তে পারে না। লৌকিক রতি দেশকালের সীমায় আবদ্ধ। কিন্তু সুখ হচ্ছে অসীম—'ভূমৈব সুখম্।' প্রাকৃত বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারি প্রভৃতিও সসীম। সুতরাং এ সকলের সংযোগে অলৌকিক রস নিষ্পত্তি হ'তে পারে না। তাই বৈষ্ণব আলঙ্কারিকের উক্তি ঃ 'তস্মালৌকিকস্যৈব বিভাবাদেঃ রসজনকত্বং ন শ্রদ্ধেয়ম্।' (জীব গোস্বামী)। ভক্তি (কৃষ্ণরতি) স্থায়িভাব ভক্তিরসে পরিণত হয়। 'আস্বাদাঙ্কুর কন্দোঽসৌ ভাবঃ স্থায়ী রসায়তে'—আস্বাদাঙ্কুর কন্দরূপ স্থায়িভাব রসে পরিণত হয় (কবি কর্ণপূর)।

ভক্তিরস : রতিরানন্দরূপৈব নীয়মানা তু রস্যতাম্ ॥
কৃষ্ণাদিভির্বিভাবাদ্যৈ গতৈরনুভবাধ্বনি।
প্রৌঢ়ানন্দ-চমৎকারকাষ্ঠামাপদ্যতে পরাম্ ॥ (ভ. র.)

—অনুভববেদ্য কৃষ্ণাদিবিভাবদ্বারা আনন্দরূপা রতি রসে পরিণত হয়ে অপূর্ব প্রৌঢ়ানন্দ-চমৎকারিত্বে পরিণত হয়।

প্রেমাদিক স্থায়ী ভাবসামগ্রী মিলনে।
কৃষ্ণভক্তি রসরূপে পায় পরিণামে ॥
বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী।
স্থায়ী ভাব রস হয় মিলি এই চারি ॥

বিভাব : বিভাব্যতে হি রত্যাদির্যত্র যেন বিভাব্যতে।
বিভাবো নাম স দ্বৈধালম্বনোদ্দীপনাত্মকঃ ॥

—যা দ্বারা এবং যাতে রতি প্রভৃতি ভাবের আস্বাদন করা যায়, তাকে বিভাব বলে। বিভাব দু'প্রকার—আলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন দু' প্রকার—বিষয় ও আশ্রয়। ভক্তির বিষয় কৃষ্ণ। এজন্য তিনি বিষয়ালম্বন। আশ্রয় ভক্ত। যার দ্বারা ভাবের উদ্দীপন হয়, তাকে উদ্দীপন বিভাব বলে। আলম্বন বিভাবের ক্রিয়া, মুদ্রা, রূপ, গুণ, বেশভূষা এবং দেশকাল ভাবের উদ্দীপন করে। যেমন, নবীন মেঘ দেখলে কৃষ্ণের কথা মনে পড়ে। তাই মেঘ উদ্দীপন বিভাব।

অনুভাব : অনুভাবাস্তু চিত্তস্থভাবানামবধোকাঃ।
তে বহির্বিক্রিয়াপ্রায়া প্রোক্তা উদ্ভাস্বরখ্যায়া ॥

—যে সমস্ত লক্ষণ দ্বারা চিত্তের ভাবের প্রকাশ পায়, তাদের অনুভাব বা উদ্ভাস্বর বলে। নৃত্য, গীত, উল্লাস, দীর্ঘশ্বাস ইঃ—কৃষ্ণবিষয়ক ভাবপ্রকাশক।

সাত্ত্বিক ভাব : কৃষ্ণ-সম্বন্ধিভিঃ সাক্ষাৎ কিঞ্চিদ্ বা ব্যবধানতঃ।
ভাবৈশ্চিত্তমিহাক্রান্তং সত্ত্বমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥
সত্ত্বাদস্মাৎ সমুৎপন্না যে ভাবা স্তে তু সাত্ত্বিকাঃ ॥

—কৃষ্ণবিষয়ক ভাবসমূহের দ্বারা আক্রান্ত চিত্তকে সত্ত্ব বলে। এই সত্ত্ব থেকে উৎপন্ন ভাবসমূহ সাত্ত্বিক।

সাত্ত্বিক ও অনুভাব দুইয়েই ভাবের বাইরে প্রকাশ ঘটে। তবু এদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, সাত্ত্বিকভাবের প্রকাশ রোধ করা যায় না; অনুভাবের প্রকাশ প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

ব্যভিচারী ভাব :

বিশেষণাভিমুখ্যেন চরন্তি স্থায়িনং প্রতি।

—স্থায়ী ভাবের প্রতি বিশেষভাবে সঞ্চারিত ভাবকে সঞ্চারি বা ব্যভিচারী ভাব বলে।

রূপগোস্বামী ভক্তিরসের নিম্ন সংজ্ঞাও দিয়েছেন : "শ্রবণ—কীর্তন—স্মরণ ইত্যাদি দ্বারা জাত স্থায়িভাব 'কৃষ্ণরতি' বিভাব-অনুভাব সাত্ত্বিকভাব ব্যভিচারিভাবের দ্বারা ভক্ত হৃদয়ে আস্বাদ্য অবস্থায় আনীত হইলে তাহা ভক্তিরস হইয়া যায়।" (অনুবাদ—শ্যামাপদ চক্রবর্তী)।

বৈষ্ণবীয় ভক্তিরসে স্থায়িভাব কৃষ্ণরতি ; আলম্বন বিভাবের বিষয় কৃষ্ণ, আধার কৃষ্ণভক্ত ; কৃষ্ণের গুণ, চেষ্টা, প্রসাধন, হাস্য, বংশী প্রভৃতি উদ্দীপন বিভাব ; নৃত্য, গীত, ক্রন্দন, দীর্ঘশ্বাস, অট্টহাস্য, হিক্কা, জৃম্ভণ প্রভৃতি অনুভাব ; স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু, প্রলয়—এই আটটি সাত্ত্বিকভাব এবং নির্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, চিন্তা, হর্ষ, নিদ্রা, চাপল্য প্রভৃতি তেত্রিশটি ব্যাভিচারিভাব।

ভক্তিরস দু'প্রকার,—মুখ্য ভক্তিরস, গৌণভক্তিরস। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর—মুখ্যরসের এই পাঁচ প্রকার ভেদ। গৌণভক্তি রস সাত প্রকার—হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস। রস যে সহৃদয়-হৃদয়সংবাদী, একথা বৈষ্ণব রসশাস্ত্রেও অস্বীকৃত হয় নি। তবে সহৃদয় হচ্ছেন এখানে ভক্ত। যিনি ভক্তিরসের অনুভব করেন, তাঁকে ভক্ত বলা হয়—'ভক্তিরসানুভবাচ্চ ভক্তঃ।' ভক্ত বা পরিকরভেদেই রতি তথা রসের প্রভেদ দৃষ্ট হয়। চৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত হয়েছে :

রতিভেদে ভক্তিভেদ পঞ্চ পরকার।
শান্তরতি, দাস্যরতি, সাম্যরতি আর ॥
বাৎসল্যরতি, মধুর রতি পঞ্চবিভেদ।
রতিভেদে কৃষ্ণভক্তি রসপঞ্চভেদ ॥
শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর রস নাম।

এখানে স্মরণীয় যে ভক্তভেদে রতিভেদ হয়। কৃষ্ণরতি শান্ত থেকে ক্রমানুসারে মধুর রসে উত্তীর্ণ হয়। গীতায় কৃষ্ণের উক্তি—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্তমানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥

চৈতন্যচরিতামৃতেও উক্ত হয়েছে—

কৃষ্ণপ্রাপ্তের উপায় বহুবিধ হয়।
কৃষ্ণপ্রাপ্তের তারতম্য বহুত আছয় ॥
কিন্তু যার যেই ভাব সেই সর্বোত্তম।
তটাস্থ হঞা বিচারিলে আছে তর তম ॥
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্বকাল আছে।
যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে ॥

॥ শান্তরস ॥

শান্তরসকে বলা হয়েছে জ্ঞানভক্তিময় রস ; স্থায়িভাব—শান্তরতি, বিষয়ালম্বন—চতুর্ভুজ নারায়ণ ; আশ্রয়ালম্বন—শান্তভক্ত ; উদ্দীপন বিভাব—উপনিষদ পাঠ ও শ্রবণ, নির্জন স্থানে সাধনা, জ্ঞানসঙ্গী, ব্রহ্মসত্র প্রভৃতি। শান্ত ভক্ত দু'ধরনের—আত্মারাম ও তাপস। আত্মারামের রতিলাভ ভগবানের সাক্ষাৎ কৃপাবশে ; তাপস সাধনার দ্বারা ভগবানের কৃপায় শান্তরতি লাভ করেন। সনক, সনন্দ—আত্মারাম শান্তভক্ত। ভগবানকে পরমাত্মাবোধে শান্তভক্ত তাঁর উপাসনা করেন। চৈতন্যচরিতামৃতে শান্তের লক্ষণ সম্পর্কে উক্তি :

কৃষ্ণনিষ্ঠা তৃষ্ণা ত্যাগ তার কার্য মানি।
অতএব শান্ত কৃষ্ণভক্ত এক জানি॥
স্বর্গমোক্ষ কৃষ্ণ ভক্ত নরক করি মানে।
কৃষ্ণনিষ্ঠা, তৃষ্ণাত্যাগ—শান্তের দুই গুণে॥
শান্তের স্বভাব—কৃষ্ণে মমতাগন্ধহীন।
পরব্রহ্ম—পরমাত্মা—জ্ঞান প্রবীণ॥

শান্তরসে কেবল ঈশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান হয়। শন্তভক্ত কৃষ্ণে মমতাগন্ধহীন। 'শান্তভক্তের রতি বাঢ়ে প্রেম পর্যান্ত'— অর্থাৎ প্রেমবোধ শান্তভক্তে নেই। কোনরূপ প্রীতিপূর্ণ নৈকট্যবোধ শান্তভক্তে নেই। তবে আত্মারাম ভক্তে মাধুর্যঘন বিগ্রহ ভগবানের প্রতি প্রেমভক্তি জাগরূক হয়।

॥ দাস্যরস ॥

দাস্য ভক্তিরসকে বলা হয়েছে প্রীতভক্তি রস। এটি আবার দু'ভাগে বিভক্ত—সম্ভ্রমপ্রীত ও গৌরবপ্রীত। সম্ভ্রমপ্রীত বর্তমান থাকে দাসমনোভাবসম্পন্ন ভক্তের ক্ষেত্রে; গৌরবপ্রীত বর্তমান থাকে কনিষ্ঠজন, পুত্র প্রভৃতি লাল্যের ক্ষেত্রে। 'ভগবান প্রভু, আমি তাঁর আজ্ঞাধীন' এ ধরনের মনোভাব দাস্যভক্তে বর্তমান। দাস্যরতিতে শান্তের কৃষ্ণনিষ্ঠা, তদুপরি আছে সেবা। দাস্যে মমত্ববুদ্ধিও বর্তমান। সেবা দ্বারা ভগবানের প্রীতিবিধানের আকাঙ্ক্ষা প্রীতভক্তের হৃদয়ে বর্তমান। 'দাস্যভক্তের রতি হয় রাগ দশা অন্ত'—অর্থাৎ দাস্যরতিতে রতি, প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়—এই কয়টি স্তর বর্তমান।

পূর্ণৈশ্বর্য প্রভুজ্ঞান অধিক হয় দাস্যে॥
ঈশ্বরজ্ঞান সম্ভ্রম গৌরব প্রচুর।
সেবা করি কৃষ্ণে সুখ দেন নিরন্তর॥
শান্তের গুণ দাস্যে আছে অধিক সেবন।
অতএব দাস্যরসের হয় দুই গুণ॥

॥ সখ্যরস ॥

রূপ গোস্বামী সখ্যরসকে বলেছেন প্রেয়ো রস। জীব গোস্বামী বলেছেন মৈত্রীরস। এর স্থায়িভাব বিশ্রম্ভ বা সখ্যরতি। বিষয়ালম্বন শ্রীকৃষ্ণ, আশ্রয়ালম্বন—শ্রীদাম, সুদাম, অর্জুন প্রভৃতি। কৃষ্ণ ব্রজে দ্বিভুজ; অন্যত্র কখনো দ্বিভুজ, কখনও চতুর্ভুজ। সখ্যে ভক্ত-ভগবানের মধ্যে সঙ্কোচের লেশমাত্র থাকে না। সখাগণ কৃষ্ণগতপ্রাণ; কৃষ্ণ বিনা ত্রিভুবন তাঁদের কাছে অন্ধকার। সখ্যে আছে শান্তের কৃষ্ণনিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, অধিকন্তু আছে সঙ্কোচহীনতা। গাঢ় প্রীতি ও মমত্ববুদ্ধির বশেই সখাগণ কৃষ্ণকে তাঁদেরই মত একজন বলে মনে করেন। ফলে কৃষ্ণকে যেমন তাঁরা সখাভাবে সেবা করেন, তেমনি তিনি তাঁদের সেবা স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করেনও। পারস্পরিক সমত্ববোধের ফলেই এটা সম্ভব। সখ্যের এই গলাগলি ভাবে কৃষ্ণেও বিশেষ প্রীত হন।

সখ্যরসে উদ্দীপনা বিভাবঃ কৃষ্ণের বয়স, রূপ, বেণু, পরাক্রম, শঙ্খা প্রভৃতি। অনুভাব—বাহুযুদ্ধ, কন্দুক ক্রীড়া, কৃষ্ণের সঙ্গে উপবেশন ও শয়ন, নৃত্য-গীত প্রভৃতি।

শান্তের গুণ দাস্যের সেবন সখ্যে দুই হয়।
দাস্যে সম্ভ্রম গৌরব সেবা সখ্যে বিশ্বাসময় ॥
কান্ধে চড়ে কান্ধে চড়ায় করে ক্রীড়ারণ।
কৃষ্ণ সেবে কৃষ্ণে করায় আপন সেবন ॥
বিশ্রম্ভ-প্রধান সখ্য গৌরব-সম্ভ্রম-হীন।
অতএব সখ্যরসের তিনগুণ চিন ॥
মমতা অধিক কৃষ্ণে, আত্মসমজ্ঞান।
অতএব সখ্যরসে বশ ভগবান ॥

॥ বাৎসল্যরস ॥

এতে থাকে ভক্ত-ভগবানের মধ্যে মাতা-পিতা ও সন্তানের সম্পর্ক। কৃষ্ণ সন্তান, ভক্ত মাতা বা পিতা। এর স্থায়িভাব—বাৎসল্য রতি। অবলম্বন—কৃষ্ণ। উদ্দীপন বিভাব—কুমার বয়স, রূপ, স্মিতহাসি, চাপল্য প্রভৃতি। মাতা যেমন সন্তানকে লালন-পালন করেন, আবার তাড়ন-ভর্ৎসন করেন—বাৎসল্য রসেও অনুরূপ ভাব বজায় থাকে। বাৎসল্য রসে থাকে শান্তের কৃষ্ণাসক্তি, দাস্যের সেবা, সখ্যের সমপ্রাণতা, অধিকন্তু থাকে লাল্যত্ব-পাল্যত্ব ও অনুগ্রাহ্যত্বের ভাব। ভগবানে কোনরূপ ঐশ্বর্যজ্ঞান নেই; বরং আছে মমত্ববুদ্ধির আধিক্যবশতঃ হেয়জ্ঞান (দয়া, অনুকম্পা)। বাৎসল্যরতিতে অনুরাগের শেষ সীমা পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়—'পিতৃ-মাতৃ স্নেহ-আদি অনুরাগ অন্ত।'

বাৎসল্যে শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন।
সেই সেই সেবনের ইহাঁ নাম্ন পালন ॥
সখ্যের গুণ অসঙ্কোচ, অগৌরব সার।
মমতা আধিক্যে তাড়ন ভর্ৎসন ব্যবহার ॥
আপনাকে পালক জ্ঞান, কৃষ্ণে পাল্যজ্ঞান।
চারি রসের গুণে বাৎসল্য অমৃত সমান ॥

॥ মধুর রস ॥

মধুর ভক্তিরসে ভক্ত-ভগবানের সম্পর্ক কান্ত-কান্তা সম্পর্কের তুল্য। ভগবান কান্ত, ভক্ত কান্তা। এতে শান্তের কৃষ্ণনিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের সঙ্কোচহীনতা, বাৎসল্যের লালন-পালন—সবই আছে; অধিকন্তু আছে স্বীয় অঙ্গ দ্বারা কৃষ্ণসেবা।—

মধুর রসে কৃষ্ণনিষ্ঠা সেবা অতিশয়।
সখ্যের অসঙ্কোচ লালন মমতাদিক হয় ॥
কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন।
অতএব মধুর রসে হয় পঞ্চগুণ ॥

মধুররসের স্থায়িভাব 'মধুরা রতি'। বিষয়-আলম্বন—নায়ক-চূড়ামণি কৃষ্ণ, আশ্রয়-আলম্বন বিভাব—কৃষ্ণ-প্রেয়সিগণ। বংশীধ্বনি প্রভৃতি উদ্দীপন বিভাব। উজ্জ্বলরস, কান্তারস, শৃঙ্গার রস, শুচিরস—মধুর রসের বিভিন্ন নাম। মধুর রস সকল রসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—'ভক্তিরসরাজ'। বলা হোল—'কান্তাপ্রেম সর্বসাধ্যসার।' কান্তাপ্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে কৃষ্ণের উক্তি ঃ

'প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হৈতে তাহা হরে মোর মন ॥'

মধুরা রতি তিন প্রকার—সাধারণী, সমঞ্জসা, প্রৌঢ়া। কৃষ্ণের রূপলাবণ্য দর্শনে তাঁর দ্বারা ভোগবাসনা পূরণের কামনা সাধারণী রতির অন্তর্গত। যেমন—কুব্জার রতি। কৃষ্ণের রূপলাবণ্য দর্শনে কিংবা তাঁর গুণাদি শ্রবণের ফলে শাস্ত্রসম্মত পরিণয় বন্ধনের দ্বারা তাঁর সঙ্গসুখলাভের ইচ্ছা সমঞ্জসা রতির অন্তর্গত। রুক্মিণী, সত্যভামার রতি এই স্তরের। সমর্থ রতির নায়িকার কাছে নিজের ভোগবাসনা তুচ্ছ; গৃহধর্ম, কুলধর্মের অপেক্ষা তাঁদের নেই। তাঁদের কৃষ্ণবিষয়ক রতি স্বতঃসিদ্ধ। ব্রজগোপীর রতি এই স্তরের।

কৃষ্ণপ্রেয়সী দু'প্রকারের—স্বকীয়া ও পরকীয়া। স্বকীয়া কান্তা কৃষ্ণের পরিণীতা কান্তা। এ'দের বৈশিষ্ট্য ঃ—পাতিব্রত্যধর্মপালনের জন্য তাঁরা সর্বদাই তৎপর থাকেন। যাঁদের কাছে ইহলোক ও পরলোক কোন অপেক্ষা থাকে না, একান্ত অনুরাগ বশে যাঁরা নায়কের কাছে আত্মসমর্পণ করেন—বিবাহ বন্ধনের অপেক্ষা রাখেন না, তারাই পরকীয়া কান্তা। পরকীয়া কান্তা আবার দু'প্রকার—কন্যকা ও পরোঢ়া।

ব্রজগোপীগণ পরকীয়া নায়িকা, তাদের কৃষ্ণরতি সমর্থা। এদের মধ্যে আবার 'রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি। যাহার মহিমা সর্বশাস্ত্রেতে বাখানি'। রাধার থেকেই ত্রিবিধ কান্তার বিস্তার। রাধার প্রেমের উৎকর্ষ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

কৃষ্ণময়ী—কৃষ্ণ যার ভিতরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে ॥
কিম্বা প্রেম রসময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় এক রূপ ॥
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব 'রাধিকা' নাম পুরাণে বাখানে ॥ (চৈ. চ.)

স্বীয়া ও পরকীয়ার তিন প্রকার ভেদ—মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগল্‌ভা। মুগ্ধা নায়িকা নবীনা, রতি বিষয়ে পারদর্শী নয়; মধ্যা নায়িকা যৌবনবতী, সমান-লজ্জা-মদনা, প্রত্যুৎপন্নমতি, কিঞ্চিৎ কোমলা; প্রগল্‌ভা নায়িকা পূর্ণ যৌবনবতী, রতিবিষয়ে অতি উৎসুক, একসঙ্গে বহুভাব জানেন, মানে কর্কশভাষিণী ইত্যাদি। মধুর রসে নায়িকার আটপ্রকার অবস্থা—অভিসারিকা, বাসকসজ্জিকা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, প্রোষিত-ভর্তৃকা, স্বাধীনভর্তৃকা।

শৃঙ্গার রস দ্বিবিধ—বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ। নায়ক-নায়িকার যুক্ত বা অযুক্ত অবস্থায় অভীষ্ট আলিঙ্গনের অপ্রাপ্তিতে হলো বিপ্রলম্ভের উদ্‌গম। বিপ্রলম্ভ সম্ভোগের পুষ্টিকারক। বিপ্রলম্ভ চার প্রকার—পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস। নায়ক-নায়িকার দর্শন-আলিঙ্গনাদির দ্বারা উল্লাস প্রাপ্ত ভাবকে বলে সম্ভোগ। সম্ভোগ দু'প্রকার—মুখ্য ও গৌণ। এদের প্রতিটির চার প্রকার ভেদ :—(সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, সম্পন্ন, সমৃদ্ধিমান)।

দর্শনালিঙ্গনাদীনামানুকূল্যান্নিষেবয়া।
যূনোরুল্লাসমারোহন্ ভাবঃ সম্ভোগ ঈর্যতে।।

—নায়ক ও নায়িকার পরস্পর দর্শন, আলিঙ্গন, সম্ভাষণ ও স্পর্শ প্রভৃতির যে পরস্পর সুখবোধ, তার দ্বারা উল্লাসপ্রাপ্ত ভাবকে সম্ভোগ বলে। সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ—সম্ভ্রম ও লজ্জার কারণে সংক্ষিপ্ত আলিঙ্গনাদি প্রভৃতি। সংকীর্ণ সম্ভোগে নায়ক কর্তৃক বঞ্চনার স্মরণে, কখনও বা রতিচিহ্ন দর্শনে এবং শ্রবণে সুরত ব্যাপারে তপ্ত ইক্ষুর মত যুগপৎ উষ্ণ ও মাধুর্যের অনুভূতি। প্রবাসগত নায়কের সঙ্গে নায়িকার মিলনকে সম্পন্ন সম্ভোগ বলে। পরাধীনতা প্রযুক্ত বিরহ বিধুর নায়ক-নায়িকার দর্শন ও সুদুর্লভ মিলনকে সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ বলে।

ভক্তি রসের উপাদান

যে আস্বাদ্য বস্তুর আস্বাদনে চমৎকারিত্ব জন্মে, তাহাকেই রসশাস্ত্রে 'রস' বলা হয়। অনুভূতপূর্ব বস্তুর অনুভবে, অনাস্বাদিতপূর্ব বস্তুর আস্বাদনে, চিত্তের যে স্ফারতা জন্মে তাহাকেই বলা হয় চমৎকৃতি। এই চমৎকৃতিই হইতেছে রসের সার বা প্রাণবস্তু; এই চমৎকৃতি না থাকিলে কোন আস্বাদ্য বস্তুকেই রস বলা হয় না।" (গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন)।

রসের উৎপত্তি ঘটে কেমন করে—এ সম্পর্কে প্রাচীন রসশাস্ত্রকারগণ নানাভাবে আলোচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে প্রাচীনতম হলেন ভরতমুনি। বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের সংযোগে (স্থায়ী ভাব) রসে পরিণত হয় (রসনিষ্পত্তি)— আচার্য ভরতের এই সিদ্ধান্ত সর্বজনস্বীকৃত ও বহুল আলোচিত। প্রাচীন রসশাস্ত্রকার ভক্তির রসত্ব স্বীকার করেন নি। কিন্তু বৈষ্ণব আলংকারিকদের মতে ব্রহ্মের রসস্বরূপত্ব আস্বাদন-ই সর্বোত্তম। অসমোর্দ্ধমাধুর্য, সর্বগুণের আকর, অখিলরসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণ রসরূপ ও রসের আস্বাদক—দুই-ই। আপন হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তিবিশেষ প্রেম বা ভক্তিরসের নির্যাস তিনি আস্বাদন করে থাকেন। কৃষ্ণ আনন্দ ও রসস্বরূপ 'রসো বৈ সঃ।' ভক্তিরসের আস্বাদনে তিনি বিষয়ালম্বন এবং তাঁর পরিকরগণ আশ্রয়ালম্বন।

"হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তিবিশেষ বলিয়া ভক্তি (বা কৃষ্ণরতি, বা ভাগবতী প্রীতি) হইতেছে স্বরূপতঃই আনন্দরূপা—"রতিরানন্দরূপৈব॥ ভ.র.সি. ২।১।৪॥" এই আনন্দ হইতেছে চিন্ময় আনন্দ, লৌকিক জড় আনন্দ নহে। রতির এই আনন্দ এতই প্রাচুর্য্যময় যে, ব্রহ্মানন্দও তাহার নিকট তুচ্ছীকৃত হয়। তথাপি কিন্তু এই আনন্দরূপা রতি বা ভক্তি আপনা-আপনি তাহার আস্বাদ্যত্বের অনুরূপ চমৎকারিত্বময়ী নহে, অপর কতকগুলি সামগ্রীর সহিত যুক্ত হইলেই তাহা এক অপূর্ব আস্বাদন-চমৎকারিত্ব ধারণ করে এবং তখনই তাহাকে বলা হয়—ভক্তিরস।" (গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন)। রসের সামগ্রী বা উপাদান বলতে যে সকল বস্তুর সম্মিলনে একটি আস্বাদ্যবস্তু রসে পরিণত হয়, সেই সকল বস্তুকে এই রসের উপাদান বলা হয়। যেমন গুড়-মরিচাদি সহযোগে পাণক রস তৈরি করা হয়। এখানে ওই গুড়-মরিচাদি হচ্ছে রসের উপাদান। কৃষ্ণরতি স্থায়ী ভাব বিভাবাদি সহযোগে ভক্তি রসে পরিণত হয়—

সামগ্রী পরিপোষেণ পরমা রসরূপতা॥
বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈর্ব্যভিচারিভিঃ।
স্বাদ্যত্বং হৃদি ভক্তানামানীতা শ্রবণাদিভিঃ।
এষা কৃষ্ণরতিঃ স্থায়ী ভাবো ভক্তি রসো ভবেৎ॥

—এই স্থায়ী ভাব কৃষ্ণরতি—বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারী, সাত্ত্বিক প্রভৃতি সামগ্রীরূপ ভাবকদম্ব দ্বারা শ্রবণাদি কর্তৃক ভক্তজনের হৃদয়ে আস্বাদনীয় হলে তার নাম হয় ভক্তিরস।

প্রেমাদিক স্থায়িভাব সামগ্রী মিলনে।
কৃষ্ণভক্তি রস-স্বরূপ পায় পরিণামে॥"
বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী।
স্থায়িভাব "রস" হয় এই চারি মিলি॥

বিভাব

রতির উৎপত্তির হেতুকে বিভাব বলে। রূপ গোস্বামী বলেন—

তত্র জ্ঞেয়া বিভাবাস্তু রত্যাস্বাদন হেতবঃ।
তে দ্বিধালম্বনা একে তথৈবোদ্দীপনাঃ পরে॥

—রতির আস্বাদনের হেতুকে বিভাব বলে। বিভাব দুই প্রকার—আলম্বন বিভাব ও উদ্দীপন বিভাব।

আলম্বন বিভাব আবার দুই প্রকার—বিষয়ালম্বন ও আশ্রয়ালম্বন। শ্রীকৃষ্ণ রতির বিষয় এবং কৃষ্ণভক্তগণ আশ্রয়।

ভক্ত ভেদে রতি তথা রসের প্রকার ভেদ ঘটে। ভাব ভেদে ভক্ত পাঁচ প্রকার—শান্ত, দাস, সখা, মাতা-পিতা ও কান্তা।

ভক্তাস্তু কীর্ত্তিতাঃ শান্তাস্তথাদাসসুতাদয়ঃ।
সখায়ো গুরুবর্গাশ্চ প্রেয়স্যশ্চেতি পঞ্চধা॥

উদ্দীপন বিভাব ঃ

উদ্দীপনাস্তু তে প্রোক্তা ভাবমুদ্দীপয়ন্তি যে।

—যে বস্তু চিত্তের ভাব উদ্দীপ্ত করে, তাকে উদ্দীপন বিভাব বলে। শ্রীকৃষ্ণের গুণ, চেষ্টা, প্রসাধন, অঙ্গসৌরভ, বংশী ইত্যাদি উদ্দীপন বিভাব।

অনুভাব ঃ

"অনুভাবাস্তু চিত্তস্থভাবানামববোধকাঃ।
তে বহির্বিক্রিয়া-প্রায়াঃ প্রোক্তা উদ্ভাস্বরাখ্যয়া॥

—চিত্ত-স্থ ভাবের অববোধক (পরিচায়ক), বাইরে বিক্রিয়া (অর্থাৎ প্রতীয়মান ক্রিয়া-বিশেষকে) অনুভাব বলে। নৃত্য, গীত, হুংকার, অট্টহাস্য, দীর্ঘশ্বাস প্রভৃতি অনুভাব।

সাত্ত্বিকভাব ঃ

কৃষ্ণসম্বন্ধিভিঃ সাক্ষাৎ কিঞ্চিদ্বা ব্যবধানতঃ।
ভাবৈশ্চিত্তমিহাক্রান্তং সত্ত্বমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥

—কৃষ্ণ সম্বন্ধি রতি দ্বারা সাক্ষাৎভাবে বা কিঞ্চিৎ ব্যবধানে আক্রান্ত চিত্তকে 'সত্ত্ব' বলা হয়। আর সত্ত্ব থেকে উৎপন্ন ভাবকে সাত্ত্বিকভাব বলা হয়।—

—"সত্ত্বাদস্মাৎ সমুৎপন্না যে যে ভাবাস্তে তু সাত্ত্বিকাঃ।"

সাত্ত্বিকভাব তিনপ্রকার—স্নিগ্ধা, দিগ্ধা ও রুক্ষা॥ স্নিগ্ধা সাত্ত্বিক ভাব আবার মুখ্য ও গৌণভেদে দুই প্রকার। শান্ত, দাস্য প্রভৃতি পঞ্চ রতি দ্বারা চিত্ত আক্রান্ত হলে মুখ্য স্নিগ্ধ সাত্ত্বিকভাব হয়। আর হাস্য প্রভৃতি গৌণ সপ্ত রতি দ্বারা চিত্ত আক্রান্ত হলে হয় গৌণ স্নিগ্ধ সাত্ত্বিকভাব। মুখ্য ও গৌণ রতি ভিন্ন অন্য ভাবের দ্বারা উৎপন্ন রতি চিত্তকে আক্রান্ত করলে তা হয় দিগ্ধ। ভক্ততুল্য অথচ রতিশূন্য জনের চিত্তে কখনো ঈশ্বর-কথা-শ্রবণে ভাবোদয় হলে তাকে রুক্ষ সাত্ত্বিক বলে।

সাত্ত্বিক ভাব আটটি—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয়।

স্তম্ভ—হর্ষ, ভয়, আশ্চর্য, বিষাদ, অমর্ষ (রোষ) থেকে উৎপন্ন হয়। এতে বাক্‌রোধ, নিশ্চলতা ও শূন্যান্তর ভাব প্রকাশ পায়।

স্বেদ—হর্ষ, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি থেকে জাত দেহের ক্লেদ (ঘাম)।

রোমাঞ্চ—হর্ষ, উৎসাহ, ভয়, বিস্ময় (আশ্চর্য) থেকে জাত হয়।

স্বরভেদ—বিষাদ, বিস্ময়, অমর্ষ, আনন্দ, ভয় প্রভৃতি থেকে উৎপন্ন হয়।

কম্প—বি-ত্রাস, অমর্ষ, হর্ষ প্রভৃতি দ্বারা গাত্রের যে 'লৌল্যকৃৎ' অর্থাৎ চাঞ্চল্য।

বৈবর্ণ্য—বিষাদ, ক্রোধ, ভয়াদি থেকে উৎপন্ন বর্ণবিক্রিয়া। বৈবর্ণ্যে দেহ মলিন ও কৃশ হয়।

অশ্রু—হর্ষ, ভয়, বিষাদাদির ফলে চোখে আপনা থেকেই যে জল আসে। এতে নয়নক্ষোভ, রক্তিমা ও সম্মার্জনাদি ঘটে।

প্রলয়—চেষ্টা ও জ্ঞানের অভাব হয়, এমন সাত্ত্বিকভাব।

সত্ত্ব ভাব আবার চার প্রকার—ধূমায়িত, জ্বলিত, দীপ্ত ও উদ্দীপ্ত। অল্প ব্যক্ত হলেও গোপন করা যায়, এমন সাত্ত্বিক ভাবকে বলে 'ধূমায়িত'। দুই তিনটি সাত্ত্বিকভাব একসঙ্গে উদিত হয় এবং কষ্টে গোপন করা যায়, তাদের বলে 'জ্বলিত।' তিন, চার বা পাঁচটি সাত্ত্বিকভাব যখন একসঙ্গে উদিত হয়, তাদের সম্বরণ করা যায় না—তাহলে 'দীপ্ত' সাত্ত্বিকভাব হয়। যখন একই সঙ্গে পাঁচ, ছয় বা সবগুলি সাত্ত্বিকভাব উদীপ্ত হয়ে পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় তখন হয় 'উদীপ্ত'।

সাত্ত্বিক ভাবের মত অথচ তা নয়, এমন কতকগুলি ভাব আছে। তাদের বলা হয় সাত্ত্বিকাভাস। এটি চার প্রকার—রত্যাভাসভব, সত্ত্বাভাসভব, নিঃসত্ত্ব ও প্রতীপ। রত্যাভাসের জন্য মুমুক্ষু প্রভৃতিতে রত্যাভাসভব সাত্ত্বিকাভাস উৎপন্ন হয়। শিথিলচিত্তে হর্ষ বিস্ময়ের আভাস দেখা দিলে হয় সত্ত্বাভাস। এর থেকে জাত ভাব সত্ত্বাভাসভব। পিচ্ছিল চিত্তে সত্ত্বাভাব ছাড়াও অশ্রু, পুলক দেখা দিলে নিঃসত্ত্ব হয়। আর কৃষ্ণের শত্রু প্রভৃতিতে ক্রোধ ভয় প্রভৃতি দ্বারা যে সাত্ত্বিকাভাস হয় তাকে বলে প্রতীপ।

ব্যভিচারি ভাব

বিশেষণাভিমুখ্যেন চরন্তি স্থায়িনং প্রতি ॥
বাগঙ্গ-সত্ত্বসূচ্যা জ্ঞেয়াস্তে ব্যভিচারিণ।
সঞ্চারয়ন্তি ভাবস্য গতিঃ সঞ্চারিণোঽপি তে ॥

—ব্যভিচারিভাব বিশেষভাবে অভিমুখ্যের সহিত স্থায়িভাবের প্রতি গমনশীল (চরণ)। বাক্য, অঙ্গ ও সত্ত্বদ্বারা সূচিত হয় এই ভাব। ভাবের গতি সঞ্চার করে বলে একে সঞ্চারী বলা হয়। ব্যভিচারিভাব তরঙ্গের ন্যায় উঠে নেমে স্থায়িভাবসমুদ্রকে বৃদ্ধি করে তাতেই লীন হয়ে যায় অর্থাৎ স্থায়িভাব থেকে উঠে তাতেই মিশে যায়। ব্যভিচারিভাব তেত্রিশটি : নির্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, উন্মাদ, অপস্মৃতি, ব্যাধি, মোহ, মৃত্যু, আলস্য, জাড্য, ব্রীড়া, অবহিত্থা, স্মৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, ঔৎসুক্য, উগ্রতা, অমর্ষ, অসূয়া, চাপল্য, নিদ্রা, সুপ্তি ও বোধ।

এছাড়া সঞ্চারিভাবের আরো বহুবিধ ভেদের কথা বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে কথিত হয়েছে।

নায়ক ভেদ

বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে, বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারী ও সাত্ত্বিক ভাবের দ্বারা মধুরা রতি আস্বাদনীয় হয়ে উঠলে তাকে মধুর ভক্তিরস বলে। বিভাব দু' প্রকার—আলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন আবার দু' প্রকার—বিষয় ও আশ্রয়। কৃষ্ণ বিষয়ালম্বন, কৃষ্ণপ্রিয়াগণ আশ্রয়ালম্বন। স্বকীয় ও পরকীয় প্রেমের ভেদে শ্রীকৃষ্ণ কখনো পতি, কখনো উপপতি। বস্তুতঃ মধুর রসের স্ফূর্তি সাধনে তিনিই একমাত্র নায়ক। নায়কের সর্বগুণ তাঁর মধ্যে বিরাজিত—

নায়কানাং শিরোরত্নং কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
যত্র নিত্য তয়া সর্বে বিরাজন্তে মহাগুণা।
সোঽন্য রূপস্বরূপাভ্যামস্মিন্নালম্বনো মতঃ॥

—নায়ক-চূড়ামণি ভগবান কৃষ্ণে সকল মহাগুণ নিত্যকাল বিরাজিত। অন্যরূপ ও স্বরূপে তিনি মধুর রতির আলম্বন হন।

প্রাকৃত রসবেত্তাগণ বহুপ্রকার নায়কের বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে নায়িকা বহু হ'লেও নায়ক এক—অনন্তগুণের আকর রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু তাঁর সবগুণের প্রকাশ একসঙ্গে হয় না। আশ্রয়ের প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন লীলার বহিপ্র্কাশ। এক কৃষ্ণই বহুভাবে প্রকাশিত। যেমন, তিনি কখনো পতি, কখনো উপপতি। সুতরাং গুণ ও ক্রিয়ার পার্থক্যের জন্য নায়কেরও ভেদ দেখানো হয়েছে। নিখিল-নায়ক-চূড়ামণি, নিত্যগুণশালী কৃষ্ণের ভক্ত-ভক্তি অনুযায়ী অধিকারিক প্রকাশ তিন প্রকার—পূর্ণতম, পূর্ণতর, পূর্ণ—'হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণঃ ইতি ত্রিধা।' গোকুলে তিনি পূর্ণতম, মথুরায় পূর্ণতর এবং দ্বারকায় পূর্ণরূপে ব্যক্ত। নায়ক গুণকর্মভেদে চার প্রকার—

স পুনশ্চতুর্বিধঃ স্যাদ্ধীরোদাত্তশ্চ ধীরললিতশ্চ।
ধীরপ্রশান্তনামা, তথৈব ধীরোদ্ধতঃ কথিতঃ॥

—ধীরোদাত্ত, ধীরললিত, ধীর-প্রশান্ত ও ধীরোদ্ধত।

ধীরোদাত্ত—

গম্ভীরো বিনয়ী ক্ষন্তা করুণ সুদৃঢ় ব্রতঃ।
অকত্থনো গূঢ়গর্বো ধীরোদাত্তঃ সুসত্ত্বভৃৎ॥

—যে নায়ক গম্ভীর, বিনীত, ক্ষমাশীল, করুণ, সুদৃঢ়ব্রত, অকত্থন (আত্মশ্লাঘাশূণ্য), গূঢ়গর্ব ও সুসত্ত্বভৃৎ (মহাবলবান্), তাকে ধীরোদাত্ত নায়ক বলে।

ধীরললিত—

বিদগ্ধো নবতারুণ্যঃ পরিহাস বিশারদঃ।
নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ স্যাৎ প্রায়ঃ প্রেয়সীবশঃ॥

—যে নায়ক বিদগ্ধ, নবতরুণ, পরিহাস-নিপুণ, নিশ্চিন্ত, প্রেয়সী-বশীভূত— তাঁকে ধীরললিত নায়ক বলে।

ধীরোদ্ধত—

মাৎসর্য্যবানহঙ্কারী মায়াবী রোষণশ্চলঃ।
বিকত্থনশ্চ বিদ্বদ্ভির্ধীরোদ্ধত উদাহৃতঃ ॥

—যে নায়ক মাৎসর্যযুক্ত, অহঙ্কারী, মায়াবী, রোষপরায়ণ, আত্মশ্লাঘাপরায়ণ, চঞ্চল, তাকে ধীরোদ্ধত নায়ক বলে।

ধীরশান্ত—

শমপ্রকৃতিকঃ ক্লেশসহনশ্চ বিবেচকঃ।
বিনয়াদিগুণোপেতো ধীরশান্ত উদীর্য্যতে ॥

—যে নায়ক শান্ত প্রকৃতির, ক্লেশ-সহিষ্ণু, বিবেচক, বিনয়াদি-গুণবান্, তাকে ধীরশান্ত নায়ক বলে।

এই চার প্রকার নায়ক প্রত্যেকে আবার পতি ও উপপতি ভেদে দু'প্রকার। যিনি বিধিমত কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তিনি পতি—'উক্তঃ পতিঃ স কন্যায়া যঃ পাণি-গ্রাহকো ভবেৎ'। কৃষ্ণ রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি নায়িকার পতি। আর উপপতি—

রাগেণোল্লঙ্ঘয়ন্ ধর্মং পরকীয়াবলার্থিনা।
তদীয় প্রেমসর্বস্বং বুধৈরুপপতিঃ স্মৃতঃ ॥

—যিনি পরকীয়া রমণীর রাগে আসক্তিবশতঃ ধর্ম উল্লঙ্ঘন করেন এবং সেই পরকীয়া রমণীর প্রেমকে সর্বস্ব মনে করেন, তাকে উপপতি বলে। উপপতি ভাবেই মধুর রসের পরমোৎকর্ষ প্রতিষ্ঠিত—'অত্রৈব পরমোৎকর্ষঃ শৃঙ্গারস্য প্রতিষ্ঠিতঃ।' এই রতি বশতঃ নায়ক-নায়িকা বহু বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হন, এতে থাকে প্রচ্ছন্ন-কামুকত্ব, অধিকন্তু এই রতি পরস্পরের পক্ষে দুর্লভও বটে। সেজন্যই একে পরমা রতি বলা হয়। প্রাকৃত রসে উপপতি নিষিদ্ধ। কিন্তু রসিকশেখর কৃষ্ণের পক্ষে নয়। কারণ রস-আস্বাদনের জন্যই তাঁর আবির্ভাব। পরকীয়া ব্রজ-গোপীগণ তাঁর প্রতি অনুরাগের আধিক্য বশতঃই তাঁকে পতিভাবে ভজনা করেন। তিনি নরাকারে আবির্ভূত হলেও নর নহেন, স্বয়ং ভগবান:—

লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং তত্তু প্রাকৃত নায়কে।
ন কৃষ্ণে রসনির্যাস—স্বাদার্থমবতারিণি ॥

পতি ও উপপতি প্রত্যেকে আবার চার প্রকার—অনুকূল, দক্ষিণ, শঠ ও ধৃষ্ট।

অনুকূল নায়ক একমাত্র নায়িকার প্রতিই কেবল আসক্ত—অন্য নারীর কথা তার মনেও আসে না।

একজন বিনু আর কিছু নাহি জানে।
অনুকূল নায়ক এই শাস্ত্র পরমাণে ॥

যেমন—সীতার প্রতি রাম অনুরক্ত ছিলেন। রাধার প্রতি কৃষ্ণের অনুকূলতা সুপ্রসিদ্ধ। রাধার সঙ্গে থাকাকালীন কৃষ্ণের অন্য নারীর প্রসঙ্গও মনে আসত না। ধীরোদাত্ত, ধীরললিত, ধীরশান্ত, ধীরোদ্ধত নায়কের প্রত্যেকেই অনুকূল নায়ক হতে পারেন।

দক্ষিণ নায়ক তিনিই, যিনি অন্য নায়িকাতে আসক্ত হয়েও আগেকার নায়িকার প্রতি গৌরব, ভয়, প্রেম ও দাক্ষিণ্য ত্যাগ করেন না, অথবা—যিনি সকল নায়িকার প্রতি সমভাব পোষণ করেন।—

প্রেয়সী অনেক সমান ভাব করে।
সভার সহিত প্রীতি সরল ব্যবহারে ॥
দক্ষিণ স্বভাব সরল সর্বত্রে হয়।

যিনি নায়িকার সামনে প্রিয় বাক্য বললেও অসাক্ষাতে অপ্রিয় কাজ করেন, তাঁকে শঠ নায়ক বলে।—

প্রথমে ত নায়কের শঠ গুণ কহি।
সাক্ষাৎ সম্মান আর পরোক্ষেতে নাহি ॥
এক কান্তার সহিত প্রীত নানাবিধ করে।
অন্যের যে ঘর যাঞা তাহার কুৎসা বলে ॥
নিগূঢ় অপরাধ করি ভয় নাহি মানে।
অতএব শঠ বলি শাস্ত্রের প্রমাণে ॥

যেমন, রাধার সাক্ষাতে কৃষ্ণ বলেন—'রাই, তুমি সে আমার গতি'; কিন্তু চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে নিশাযাপন করেও তা রাধার কাছে অস্বীকার করেন। আর অন্য নারীর ভোগ চিহ্ন অঙ্গে ব্যক্ত থাকা সত্ত্বেও যিনি নির্ভয় ও মিথ্যা বচনে দক্ষ, তাঁকে ধৃষ্ট নায়ক বলে।

ধৃষ্ট নায়কের গুণ কহি বিবরণ।
নায়িকার ভোগচিহ্ন অঙ্গের ভূষণ ॥
সিন্দুর কজ্জলাদি সর্বাঙ্গে ধরিয়া।
অন্য কান্তাকে কথা কহে নির্ভয় হইয়া ॥

নায়ক সংখ্যা : তিন প্রকার—পূর্ণতম, পূর্ণতর, পূর্ণ। প্রত্যেকটি আবার চার প্রকার—ধীরোদাত্ত, ধীরললিত, ধীরশান্ত ও ধীরোদ্ধত। প্রত্যেকে আবার দু' প্রকার—পতি ও উপপতি। তাদের প্রত্যেকে আবার চার প্রকার—অনুকূল, দক্ষিণ, শঠ, ধৃষ্ট। তাহলে সর্বমোট—৯৬ প্রকার। (১×৩×৪×২×৪=৯৬)

নায়ক-সহায় ভেদ

নায়ক ও নায়িকার মিলন ঘটানোর জন্য সহায়ের দরকার। নায়কের সহায়কে বিবিধ গুণে ভূষিত হতে হবে। সহায়ের গুণ—

নর্মপ্রয়োগে নৈপুণ্যং সদা গাঢ়ানুরাগিতা।
দেশকালজ্ঞতা দাক্ষ্যং রুষ্টগোপী প্রসাদনম্ ॥
নিগূঢ়মন্ত্রতেত্যাদ্যাঃ সহায়ানাং গুণাঃ স্মৃতাঃ ॥

—নর্মবাক্য প্রয়োগে নৈপুণ্য, সদা গাঢ় অনুরাগ (কৃষ্ণের প্রতি), দেশকালের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, কৃষ্ণের প্রতি রুষ্টা গোপীর প্রসন্নতা বিধান, নিগূঢ় মন্ত্রণা দান ইত্যাদি নায়ক-সহায়ের গুণ।

নায়ক-সহায় পাঁচ প্রকার—চেটক, বিট, বিদূষক, পীঠমর্দন ও প্রিয়নর্মসখা।

চেট—"সন্ধানচতুরশ্চেটো গূঢ়কর্মা প্রগলভধীঃ।"

—সন্ধানে চতুর, গূঢ়কর্মদক্ষ অথচ প্রগলভ ও বুদ্ধিমান সহায়কে চেট বলে। ব্রজে ভঙ্গুর, ভৃঙ্গার প্রভৃতি নায়ক-সহায় ছিলেন।

চেটক ভঙ্গুর ভৃঙ্গাদি হএত নফর।
ঠাকুরের অভিমত সন্ধান কৌশল ॥

বিট— বেশোপচার কুশলো ধূর্তো গোষ্ঠী বিশারদঃ।
কামতন্ত্রকলাবেদী বিট ইত্যভিধীয়তে ॥

—বেশ রচনায় ও উপচার প্রয়োগে কুশল, ধূর্ত, গোষ্ঠী-বিশারদ (অর্থাৎ সকলের মনের খবর রাখেন), কামতন্ত্রকলাদেবী (কামশাস্ত্রে অভিজ্ঞ) সহায়কে বিট বলে। কড়ার, ভারতীবন্ধ—প্রভৃতি ব্রজে বিট ছিলেন।

কামতন্ত্রকলা বিট জানে ভাল মতে।
দূত হঞা মিলন যে করায় সঙ্কেতে ॥
নানা ছল করিয়া যায় নায়িকার পাশে।
নায়কের গুণ চরিত্র জানায় বিশেষে ॥

বিদূষক— বসন্তাদ্যাভিধো লোলো ভোজনে কলহপ্রিয়ঃ।
বিকৃতাঙ্গ-বচোবেশৈর্হাস্যকারী-বিদূষকঃ।

—ভোজনে লোলুপ, কলহপ্রিয়, অঙ্গ (দেহ), বাক্য ও বেশের বিকার সাধনের দ্বারা যিনি হাসির উদ্রেক করেন তাকে বিদূষক বলে। এদের নাম সাধারণত হয়—বসন্ত, কোকিল ইত্যাদি। 'বিদগ্ধ মাধব' নাটকের মধুমঙ্গল বিখ্যাত বিদূষক।

বিদূষক সুমঙ্গল করে পরিহাস।
ইঙ্গিতে রসের কথা কহয়ে নির্ব্বাস ॥
যার কথা সে ই [illegible] কথা কয়ে
রসস্বরূপ বাক্য সহজ সুখময়ে ॥

পীঠমর্দ — গুণৈর্নায়ককল্পো যঃ প্রেম্ণা তত্রানুবৃত্তিমান্।
পীঠমর্দঃ স কথিতঃ শ্রীদামাস্যাদ্ যথা হরেঃ॥

—নায়কতুল্য গুণের অধিকারী হয়েও যিনি প্রেমবশতঃ নায়কের অনুবৃত্তি (আনুগত্য) করেন তাঁকে পীঠমর্দ বলে। শ্রীদাম এ জাতীয় সহায়।

পীঠমর্দক গুণ ধরে শ্রীদাম গোপাল।
নায়কের সমান গুণ আদর অপার॥
নায়িকার বন্ধুবর্গে তাহার গণন।
পরোক্ষেতে করে নায়কের দোষ নিবারণ॥

প্রিয়নর্মসখা— আত্যন্তিকরহস্যজ্ঞঃ সখীভাব সমাশ্রিতঃ।
সর্বেভ্যঃ প্রণয়িভ্যোঽসৌ প্রিয়নর্মসখোবরঃ॥

—আত্যন্তিক রহস্যজ্ঞ (যিনি অতি গূঢ় রহস্য জানেন), সখীভাব-সমাশ্রিত (নায়ক ও নায়িকার মিলন ঘটানোর ইচ্ছার ভাবে নিবিষ্ট) এবং সব প্রণয়ীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এমন সহায়কে প্রিয়নর্মসখা বলা হয়। গোকুলে সুবল, অর্জুন প্রভৃতি প্রিয়নর্মসখা।

এই পাঁচ প্রকার সহায়ের মধ্যে চেট হচ্ছেন কৃষ্ণের কিঙ্কর এবং অন্য চারজন কৃষ্ণ সখা— ‘চতুর্বিধাঃ সখায়োঽত্র চেটঃ কিঙ্কর ঈর্যতে’।

কৃষ্ণের সহায় স্বরূপ দূতীগণও আছেন। এরূপ দূতী দুই প্রকার—স্বয়ং-দূতী ও আপ্ত-দূতী। কটাক্ষ ও বংশীভেদে স্বয়ং দূতী দুই প্রকার।

অতি ঔৎসুক্যের জন্য স্খলিত লজ্জা, অনুরাগে মোহিতা এবং স্বয়ং অভিযোক্তাকে স্বয়ং-দূতী বলে। কৃষ্ণের স্বয়ং দূতী তাঁর কটাক্ষ ও বংশীধ্বনি। আর যিনি প্রাণ গেলেও বিশ্বাস ভঙ্গ করেন না, স্নিগ্ধা (স্নেহশীলা) ও বাক্য-নিপুণা তাঁকে আপ্তদূতী বলে। বীরা, বৃন্দা প্রভৃতি আপ্ত-দূতী।

নায়কের সখা চার প্রকার—

সখা প্রিয়সখা আর প্রিয় নর্ম সখা।
সুহৃৎসখা আদি এই চতুর্বিধ লেখা॥

বলরাম, বীরভদ্র, দণ্ডী, প্রভৃতি কৃষ্ণের সুহৃৎসখা। এঁরা—

প্রাণের দোসর সঙ্গে বিঘ্ন নিবারণ।
সংগ্রাম বিজয়ী বল দৈত্য বিনাশন॥
বয়সের যোগ্য নহে তবু করে গোচারণ॥
বাহু যুদ্ধ স্কন্ধ আরোহণ নানা খেলা।
ভাল দ্রব্য খায় খাওয়ায় এই সব লীলা॥

প্রিয় সখা : প্রিয় সখা দাম সুদাম বসুদাম।
স্তোক কৃষ্ণ কিঙ্কিণী প্রিয় সখা অনুপাম॥
নায়কের গুণ ধরে, সর্বরস জানে।
সখা সুখে সুখী আপন সুখ নাহি মানে॥

প্রিয়নর্ম সখা :

প্রিয় নর্মসখা সুবল মধুমঙ্গল নাম।
বয়সে খাটো সে হয়ে রসের নিধান ॥
নায়কের সঙ্গে সেই থাকে নিরন্তর।
কেবল সখার হয় সেবক অনুচর ॥
নিজ সুখের গন্ধ নাহি নায়কের সুখে সুখী।
দূতের প্রায় সন্ধান স্ত্রীস্বভাব দেখি ॥
স্ত্রীর সঙ্গে কথা কহে সর্বগৃহে যায়।
অপেক্ষা নাহিক করে মিলয়ে শিশুপ্রায় ॥
রসেতে বৈদগ্ধ্য সব সর্বকলা জানে।
কৃষ্ণের সঙ্গে গোপীর সুখ অধিক করি মানে ॥
নির্জনে বসিয়া রাধাকৃষ্ণের সেবা করে।
কেবল পুরুষ প্রকৃতির ভাব অন্তরে ॥
শয়নে ভোজনে সঙ্গে থাকে সর্বক্ষণ।
কেবল রাধাকৃষ্ণের বিলাস কারণ ॥

সখা :

সখা বয়সে ছোট আর দাস অভিমান।
অর্জুন বিশাল আর সুবাহু অভিধান ॥

নায়িকা প্রকরণ

॥ ১ ॥

কৃষ্ণপ্রিয়াগণ তাঁর তুল্য সৌন্দর্য ও সুলক্ষণ প্রভৃতি গুণসম্পন্না এবং প্রেম, মাধুর্য ও বৈদগ্ধ্যের চরম পরাকাষ্ঠা সম্পন্ন।

সর্বরসের খনি পরম করুণ কৃষ্ণের বিভিন্ন নায়িকার সঙ্গে যে লীলাবিলাস, তা আদৌ প্রাকৃত ব্যাপার নয়। 'অপ্রাকৃত নিত্য পদার্থ রসের সিন্ধু হয়। / তাহার কণার নাহি আভাস ত্রিজগৎময় ॥'

কৃষ্ণপ্রিয়া বা নায়িকা দু'প্রকার—স্বকীয়া ও পরকীয়া। মধুর রসে তাঁরাই আলম্বন বিভাব। স্বকীয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে -

করগ্রহবিধিং প্রাপ্তাঃ পত্যুরাদেশ তৎপরাঃ।
পাতিব্রত্যাদবিচলাঃ স্বকীয়াঃ কথিতা ইহ ॥ (উ. নী.)

—যাঁরা পাণিগ্রহণবিধি-অনুসারে প্রাপ্তা, পতির আদেশ পালনে তৎপরা এবং পাতিব্রত্যধর্মপালনে অবিচলা, তাঁদের স্বকীয়া নায়িকা বলে।

দ্বারকাতে শ্রীকৃষ্ণের ষোল হাজার একশত আটজন মহিষী আছেন। এঁরা সকলে শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কান্তা। এঁদের প্রত্যেকের আবার অসংখ্য সখী ও দাসী বর্তমান। সখীদের রূপগুণ মহিষীদের তুল্য, দাসীদের অপেক্ষাকৃত ন্যূন। এই মহিষীগণের মধ্যে রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, কালিন্দী, শৈব্যা, ভাদ্রা, কৌশল্যা এবং মাদ্রী—এই আটজন শ্রেষ্ঠা। এঁদের মধ্যে আবার দু'জন সর্বশ্রেষ্ঠা—রুক্মিণী (ঐশ্বর্য্যে) ও সত্যভামা (সৌভাগ্যে)। এ ছাড়া কৃষ্ণ কোন কোন গোপকন্যার পতি—কারণ এই সব গোপকন্যা কাত্যায়নী ব্রতের অনুষ্ঠান করে কৃষ্ণকে পতিভাবে দেখেছিলেন ; কৃষ্ণও গান্ধর্বরীতিতে তাঁদের পতিত্ব স্বীকার করেছেন। রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি কৃষ্ণের নিত্যকান্তা—অনাদিকাল থেকেই। কৃষ্ণ যখন প্রকট হন, তখন তাঁদেরও প্রকট করান এবং লৌকিক রীতিতে তাঁদের বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়।

পরকীয়া— রাগেণৈবার্পিতাত্মানো লোকযুগ্মানপেক্ষিণা।
ধর্মেনাস্বীকৃতা যাস্তু পরকীয়া ভবন্তি তাঃ ॥ (উ. নী.)

—ইহকাল ও পরকালের উপেক্ষা রাখে না, এমন রাগ বশতঃ যাঁরা কৃষ্ণের নিকট আত্মসমর্পণ করেন এবং কৃষ্ণও বহিরঙ্গ ধর্মের বন্ধনের অপেক্ষা না রেখেই যাঁদের স্বীকার করেন, তাঁদের পরকীয়া বলে।

পরকীয়া নায়িকা কোনরূপ লোকবন্ধন, কুল-শীল-লজ্জার অপেক্ষা না করে পরমপুরুষের চরণে জীবনযৌবন—সব সমর্পণ করেন। বিবাহ বন্ধন নয়, আত্যন্তিক আসক্তিই সেখানে মূল কথা। শ্রীকৃষ্ণে প্রীতীবশেই পরকীয়া নায়িকা বেদধর্ম-দেহধর্ম-লোকধর্ম সব বিসর্জন দেন।— 'পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস। / ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস ॥"

কন্যকা ও পরোঢ়া ভেদে পরকীয়া নায়িকা দুই প্রকার—'কন্যকাশ্চ পরোঢ়াশ্চ পরকীয়া দ্বিধা মতাঃ।' অনূঢ়া নারীকে কন্যকা বলে। তাঁরা সলজ্জা, পিতৃপালিতা, সখীকেলিতে বিস্রব্ধা। সুতরাং পরপুরুষ কৃষ্ণের জন্য তাঁদের অনেক বাধাবিঘ্নের দুস্তর পথ অতিক্রম করতে হয়। অনুরাগজনিত তন্ময়তার বশেই তাঁরা কৃষ্ণ প্রেমে মাতোয়ারা। এ'দের মধ্যে গোপ-কন্যার ঐকান্তিকতার আধিক্য বশতঃ কৃষ্ণ তাঁদের প্রতি অধিকতর আসক্ত ছিলেন।

পরোঢ়া— গোপৈর্ব্যূঢ়া অপি হরেঃ সদা সম্ভোগলালসাঃ।
পরোঢ়া বল্লভাস্তস্য ব্রজনার্য্যোহ প্রসসূতিকাঃ॥ (উ. নী.)

বিবাহিতা, অথচ অপুত্রবতী (অপ্রসসূতিকা) যে সকল ব্রজনারী কৃষ্ণের সঙ্গে সম্ভোগের জন্য লালায়িতা, তাদের পরোঢ়া নায়িকা বলে। এই সকল কৃষ্ণপ্রিয়া সর্বাতিশায়িনী এবং লক্ষ্মী প্রভৃতি অপেক্ষা প্রেমসৌন্দর্য-ভূষিতা।

পরোঢ়া কৃষ্ণপ্রিয়া আবার তিন প্রকার—সাধনপরা, দেবী ও নিত্যপ্রিয়া—'তাস্ত্রিধা সাধনপরা দেব্যো নিত্যপ্রিয়াস্তথা।' সাধনপরা পরোঢ়া একক বা যৌথভাবে সাধন করেন। শ্রীকৃষ্ণ দেবাংশে জন্ম নিলে তাঁর তুষ্টি বিধানের জন্য নিত্যকান্তাগণও দেবীরূপে প্রকট হন। এ'রা ব্রজে গোপকন্যারূপে অংশিনী নিত্যপ্রিয়াগণের প্রিয় সখী হয়েছেন। কৃষ্ণের নিত্যপ্রিয়া হলেন— রাধা, চন্দ্রাবলী, বিশাখা, ললিতা, শ্যামা, পদ্মা, শৈব্যা, ভদ্রা, তারা, বিচিত্রা, গোপালী, ধনিষ্ঠা ও পালিকা। এছাড়া লোকপ্রসিদ্ধা নিত্যপ্রিয়াদের মধ্যে আছেন—খঞ্জনাক্ষী, মনোরমা, মঙ্গলা ইত্যাদি অনেকে। এই সকল নিত্যপ্রিয়াদের শত শত যূথ আছে। এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, প্রাকৃত ক্ষেত্রে পরোঢ়া নায়িকা নিষিদ্ধ। কিন্তু অপ্রাকৃত নায়িকা সম্বন্ধে এই নিষেধ প্রযোজ্য নয়—

নাসৌ নাট্যে রসে মুখ্যে যৎ পরোঢ়া নিগদ্যতে।
তত্তু স্যাৎ প্রাকৃত ক্ষুদ্র নায়িকাদ্যনুসারতঃ॥ (উ. নী.)

॥ ২ ॥

শ্রীরাধা

রাধা ও চন্দ্রাবলী অষ্ট প্রধান কৃষ্ণপ্রিয়াদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা। দু'জনের মধ্যে আবার রাধা সর্বশ্রেষ্ঠা। তিনি মহাভাবস্বরূপা ও গুণে বরীয়সী।

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥

—শ্রীরাধা কৃষ্ণময়ী, পরদেবতা, সর্বলক্ষ্মীময়ী, সর্বকান্তি, সম্মোহিনী ও পরা। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বলা হয়েছে :

'কৃষ্ণময়ী'—কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে॥
কিম্বা প্রেমরসময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় এক রূপ॥
কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব 'রাধিকা' নাম পুরাণে বাখানে॥

শ্রীরাধা সর্বসৌন্দর্যকান্তি। 'কান্তি' শব্দের অর্থ কৃষ্ণের ইচ্ছা। কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধিকাতে বর্তমান। রাধিকা কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা পূরণ করেন। কৃষ্ণ জগত-মোহন—রাধা তাঁর মোহিনী। অতএব রাধা সমস্তের 'পরা' ঠাকুরাণী। মাধুর্যের ভগবত্তাসার শ্রীকৃষ্ণ আপনার হ্লাদিনী শক্তির দ্বারা রাধাকে সৃজন করেন। আবার গোপীগণের মধ্যে তিনিই কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠা বল্লভা —'সর্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা'। রাধা ও কৃষ্ণের মূলতঃ কোন ভেদ নেই। মৃগমদ ও তাঁর গন্ধ, অগ্নি ও তার দাহিকাশক্তি যেমন অবিচ্ছেদ্য, রাধা ও কৃষ্ণের মধ্যে তেমন অবিচ্ছেদ্যতা বর্তমান—লীলারস আস্বাদনের প্রয়োজনে তাঁরা দুই রূপ ধারণ করেন মাত্র। কবিরাজ গোস্বামী বলেন :

মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কোন ভেদ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলা রস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ॥

কৃষ্ণের তিনটি প্রধান শক্তি—চিৎশক্তি বা স্বরূপ শক্তি, জীব শক্তি ও মায়া শক্তি। স্বরূপ-শক্তিতে কৃষ্ণ নিজের স্বরূপে অবস্থান করেন। স্বরূপশক্তির তিনটি অংশ—হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ। 'আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী, চিদংশে সংবিৎ তারে জ্ঞান বলি মানি।' শ্রীরাধা এই হ্লাদিনীশক্তির সারভূত অংশ। চৈতন্যচরিতামৃতকার বলেছেন :

হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেমসার ভাব।
ভাবের পরম কাষ্ঠা, নাম মহাভাব॥

মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্বগুণখনি কৃষ্ণ কান্তা শিরোমণি ॥

অথবা, হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেমনাম।
আনন্দচিন্ময়রূপ রসের আখ্যান ॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী ॥

শ্রীরাধিকার অসংখ্য গুণাবলী বর্তমান। তিনি মধুরা, নববয়া, অপাঙ্গদৃষ্টি চঞ্চলা, উজ্জ্বলস্মিতা, চারু সৌভাগ্যরেখাঢ্যা, গন্ধোন্মাদিত মাধবা, সংগীত প্রসরাভিজ্ঞা, রম্যবাক্, নর্মপণ্ডিতা, বিনীতা, করুণার্দ্রা, বিদগ্ধা, পাটবান্বিতা, লজ্জাশীলা, সুমর্যাদা, ধৈর্য ও গাম্ভীর্য-শালিনী, সুবিলাসা, মহাভাব স্বরূপিণী, গোকুলের সকলের প্রিয়, যশস্বিনী, গুরুজনের স্নেহ-ধনা, কৃষ্ণপ্রিয়াগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, সন্তবাশ্রবকেশবা (কেশব যাঁর বাক্যের বশ)। —তিনি সর্বগুণের আকর কৃষ্ণের কান্তাশিরোমণি।

॥ ৩ ॥

সর্বশ্রেষ্ঠ যূথেশ্বরী শ্রীরাধার সর্বোত্তম যূথ মধ্যে যে সকল ব্রজসুন্দরী আছেন, তাঁরা সর্বসদ্‌গুণমণ্ডিতা এবং বিভ্রম বিশেষ দ্বারা সর্বদা মাধবকে আকর্ষণকারিণী। রাধার সহায়রূপা এই সখীগণ পাঁচ প্রকার—

সখ্যশ্চ নিত্যসখ্যশ্চ প্রাণসখ্যশ্চ কাশ্চন।
প্রিয়সখ্যশ্চ পরমপ্রেষ্ঠ-সখ্যশ্চ বিশ্রুতা ॥

—সখী, নিত্যসখী, প্রাণসখী, প্রিয়সখী, পরমপ্রেষ্ঠ সখী।

সখী—কুসুমিকা, বিন্ধ্যা, ধনিষ্ঠা প্রভৃতি।

নিত্যসখী—কস্তুরিকা, মণিমঞ্জরী প্রভৃতি।

প্রাণসখী—শশিমুখী, বাসন্তী, লাসিকা ইত্যাদি। এঁরা প্রায়ই রাধার স্বরূপ লাভ করেন।

প্রিয়সখী—কুরঙ্গাক্ষী, সুমধ্যা, মদনালসা ইত্যাদি।

পরম প্রেষ্ঠসখী—ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী ও সুদেবী—এই আটজন প্রধানা সখী। এদের মধ্যে রাধা ও কৃষ্ণ—দুজনেরই প্রতি প্রেমের চরম পরাকাষ্ঠা প্রকাশিত। সেজন্য কখনো কৃষ্ণ, কখনো রাধার প্রতি তাদের প্রেমের আধিক্য প্রকাশ পায়।—

আসাং সুষ্ঠু দ্বয়োরেব প্রেম্ণঃ পরমকাষ্ঠয়া।
কচিজ্জাতু কচিজ্জাতু তাধিক্যমিবেক্ষতে ॥

॥ ৪ ॥

কৃষ্ণবল্লভাদেরই নায়িকা বলা হয়। নায়িকা দু'প্রকার—স্বকীয়া ও পরকীয়া। এদের প্রত্যেকের আবার তিন প্রকার ভেদ বর্তমান—মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগলভা।

স্বকীয়াশ্চ পরোঢ়াশ্চ যা দ্বিধা পরিকীর্ত্তিতাঃ।
মুগ্ধা মধ্যা প্রগল্‌ভেতি প্রত্যেকং তাস্ত্রিধা মতাঃ॥

মুগ্ধা নায়িকা নববয়া, নবকামা, রতিবিষয়ে বাম্য (অনিচ্ছুক), চারু ও গূঢ় প্রযত্নবাক্, প্রিয়তমের অপরাধে সাশ্রুলোচন, প্রিয় বা অপ্রিয় বাক্যে অনভ্যাস এবং মানে বিমুখী।

মধ্যা— সমানলজ্জামদনা প্রোদ্যত্তারুণ্যশালিনী।
কিঞ্চিৎ প্রগল্‌ভ বচনা মোহান্তসুরতক্ষমা।
মধ্যাস্যাৎ কোমলা ক্বাপি মানে কুত্রাপি কর্কশা॥

—লজ্জা ও মদন সমান, প্রকাশমান তারুণ্যে শ্লাঘা, বাক্যে ঈষৎ প্রগল্‌ভ, রতিবিষয়ে মোহ (মূর্ছা) পর্যন্ত সমর্থ, মানে কখনো কোমল, কখনো কর্কশ।—'বিচিত্র সুরতা আর মত্ত যৌবনা। ঈষৎ প্রগলভা আর লজ্জায়ে মধ্যমা।' (রসকল্পবল্লী)।

মধ্যা নায়িকা আবার তিন প্রকার—ধীরা, অধীরা ও ধীরাধীরা। যে নায়িকা সাপরাধ প্রিয়তমের প্রতি উপহাসমূলক বক্রোক্তি প্রয়োগ করেন, তাকে ধীরা নায়িকা বলে।—'ধীরা তু বক্তি বক্রোক্ত্যা সোৎপ্রাসং সাগসং প্রিয়ম্।'—

ধীরমধ্যা নায়িকা যদি মান করে।
অন্তরে করয়ে কোপ না হয় বাহিরে॥
স্বচ্ছন্দে নায়ক সঙ্গে করে ব্যবহার।
তথাপি অন্তরে বক্র আছয়ে তাহার॥ (বল্লী)

যে নায়িকা ক্রোধের সঙ্গে কঠোর বাক্যে প্রিয়তমকে নিরসন করেন, তাঁকে অধীর-মধ্যা নায়িকা বলে।—'অধীরা পরুষৈর্বাক্যৈ নিরস্যেদ্বল্লভং রুষা।'

অধীরা মধ্যা নায়িকা ক্রোধে রক্তলোচন।
হার ছিণ্ডে ভূমিতে পড়ে করয়ে রোদন॥
পাদাক্রান্ত হৈলে কান্ত তবু তুষ্ট নয়।
স্বামী সম্মুখ হৈলে সে বিমুখ যে হয়॥ (বল্লী)

আর যে নায়িকা সাশ্রু নয়নে প্রিয়ের প্রতি বক্রোক্তি প্রয়োগ করেন, তাঁকে ধীরাধীরা নায়িকা বলে।—'ধীরাধীরা তু বক্রোক্ত্যা সবাষ্পং বদতি প্রিয়ম।' (উ. নি.)।

ধীরাধীরা মধ্যা তবে নানাবিধ হয়।
কভু স্তুতি কভু নিন্দা সোল্লুঠ বাণী কয়॥
কভু কান্তের রূপ রুষি বীভৎস দেখিঞা।
সহচরি সঙ্গে হাসে কৌতুক করিঞা॥
কভু নিঠুর হইঞা করএ স্তবন।
কভু অন্তরের মান করে সম্বরণ॥

মধ্যা নায়িকার মুগ্ধা ও প্রগল্‌ভার সংমিশ্রণ থাকায় মধ্যাতেই সকল রসোৎকর্ষ বিদ্যমান—

সর্ব এব রসোৎকর্ষো মধ্যায়ামেব যুজ্যতে।
যদস্যাং বর্ত্ততে ব্যক্ত মৌগ্ধপ্রাগল্‌ভ্যয়োর্যুতিঃ॥

এরূপর প্রগলভা নায়িকা প্রসঙ্গে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী বলেছেন ঃ

প্রগল্‌ভা পূর্ণতারুণ্যা মদান্ধোরুরতোৎসুকা।
ভূরিভাবোদ্‌গমাভিজ্ঞা রসেনাক্রান্তবল্লভা।
অতিপ্রৌঢ়োক্তিচেষ্টাসৌ মানে চাত্যন্ত কর্কশা॥

—যে নায়িকার পূর্ণযৌবন, যিনি মদান্ধা, সুরত ব্যাপারে অতি উৎসুকা, প্রচুর ভাব প্রকাশে পটু, প্রেম রসে প্রিয়কে আক্রমণে সমর্থা, যার বাক্য ও চেষ্টা অতিশয় প্রৌঢ় (উদ্ভট) এবং মানে অত্যন্ত কর্কশ, তাকে প্রগল্‌ভা নায়িকা বলে।

প্রগল্‌ভা নায়িকাও তিন প্রকার—ধীরা, অধীরা ও ধীরাধীরা। মান বিষয়ে এই প্রভেদ।—

মানবৃত্তেঃ প্রগল্‌ভাপি ত্রিধা ধীরাদিভেদতঃ।

ধীরা প্রগল্‌ভা নায়িকা আবার দু'প্রকার—'উদাস্তে সুরতে ধীরা সাবহিত্থা চ সাদরা॥'

—একপ্রকার নায়িকা মানে সুরত বিষয়ে উদাসীনা হন, অন্য প্রকার মানে অবহিত্থা পূর্বক (মনোভাব গোপন করে) বল্লভের প্রতি প্রেম প্রকাশ করেন। যে নায়িকা ক্রোধে অধীর হয়ে প্রিয়কে তাড়না করেন, তাঁকে অধীরা প্রগল্‌ভা নায়িকা বলে—"সন্তর্জ্য নিষ্ঠুরং রোষাদধীরা তাড়য়েৎ প্রিয়ম্।"

অধীর প্রগল্‌ভা তবে করয়ে ভৎসন।
কদুত্তর কহে আর ঘৃণার বচন॥
গর্বিত ভৎসন করে নানা বাক্য দ্বারে।
বিদগ্ধ নায়কের সুখ উপজে অন্তরে॥

যে প্রগল্‌ভা নায়িকা কখনো ধীরা, কখনো অধীরা, তাকে ধীরাধীরা প্রগল্‌ভা নায়িকা বলে।—'ধীরাধীরগুণোপেতা ধীরাধীরেতি কথ্যতে।'

ধীরাধীরা প্রগল্‌ভার কথা বুঝা নাহি যায়।
কভু স্তুতি কভু নিন্দা কভু ব্যথা পায়॥
কভু বা কান্তের দুখে হয়ে ত সম্মত।
কভু এক আধো কথা কহে ত ছলোক্তি॥

মধ্যা ও প্রগল্‌ভা নায়িকা আবার দু'প্রকার—জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা। নায়িকার প্রতি নায়কের প্রণয়ের আধিক্য ও ন্যূনতাভেদবশতঃই এই শ্রেণী বিভাগ হয়ে থাকে।—

মধ্যা তথা প্রগল্‌ভা চ দ্বিধা সা পরিভিদ্যতে।
জ্যেষ্ঠা চাপি কনিষ্ঠা চ নায়কপ্রণয়ং প্রতি॥

যে নায়িকার প্রতি নায়কের প্রণয়ের আধিক্য দেখা যায়, তাঁকে জ্যেষ্ঠা এবং যাঁর প্রতি নায়কের প্রণয়ের ন্যূনতা দেখা যায়, তাঁকে কনিষ্ঠা নায়িকা বলা হয়। জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা—

এটা নায়িকার আপেক্ষিক ভেদ মাত্র। কারণ সময় বিশেষে জ্যেষ্ঠা নায়িকাও কনিষ্ঠায় পরিণত হতে পারেন। এজন্য নায়িকাভেদ প্রকরণে এদের গণনা করা হয়নি। কিন্তু স্বীয়া ও পরোঢ়া নায়িকা ধীরাদি ভেদে সাত প্রকার। স্বীয়া ও পরোঢ়া অবস্থাভেদে—মুগ্ধা, ধীরমধ্যা, অধীর-মধ্যা, ধীরাধীরামধ্যা, ধীর প্রগল্‌ভা, অধীর প্রগল্‌ভা, ধীরাধীরা প্রগলভা—এই সাত প্রকার বলে গণ্য হন। তাহলে এ পর্যন্ত নায়িকা সংখ্যা দাঁড়ালো : কন্যা + ৭ প্রকার স্বীয়া + ৭ প্রকার পরোঢ়া = ১৫ প্রকার।

॥ ৫ ॥

অষ্টনায়িকা

উপরে কথিত পনেরো প্রকার নায়িকার প্রত্যেকের আবার আট প্রকার ভেদ হতে পারে। তা হোল—

অথাবস্থাষ্টকং সর্বনায়িকানাঃ নিগদ্যতে।
অত্রাভিসারিকা বাসসজ্জা চোৎকণ্ঠিতা তথা ॥
খণ্ডিতা বিপ্রলব্ধা চ কলহান্তরিতাপি চ।
প্রোষিতপ্রেয়সী চৈব তথা স্বাধীনভর্তৃকা ॥ (উ. নী.)

—অভিসারিকা, বাসকসজ্জিকা, উৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্তৃকা, স্বাধীনভর্তৃকা।

পীতাম্বর দাসের "রসমঞ্জরী" গ্রন্থেও এই আট প্রকার নায়িকার কথা বলা হয়েছে।

অভিসারিকা বাসকসজ্জা উৎকণ্ঠিতা।
বিপ্রলব্ধা খণ্ডিতা আর কলহান্তরিতা ॥
স্বাধীনভর্তৃকা আর প্রোষিতভর্তৃকা।
এই অষ্টনায়িকা রসতন্ত্রেতে উক্তিকা ॥

এ'দের মধ্যে স্বাধীনভর্তৃকা, বাসকসজ্জিকা ও অভিসারিকা নায়িকা উৎফুল্লমনা ও অলঙ্কার মণ্ডিতা ; অন্যান্য নায়িকাগণ বিষণ্ণা খেদান্বিতা ও অলঙ্কারবর্জিতা হন।

(ক) অভিসারিকা

যা পর্যুৎসুকচিন্তাতিমদনেন মদেন চ।
আত্মনাভিসরেৎ কান্তং সা মতা হ্যভিসারিকা ॥

নায়কের সঙ্গে মিলনের জন্য নায়িকা কিংবা নায়িকার সঙ্গে মিলনের জন্য নায়কের সংকেত স্থানে গমনকে অভিসার বলে। 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে অভিসারিকার সংজ্ঞা :

যাভিসারয়তে কান্তং স্বয়ং ব্যাভিসরত্যপি।
সা জ্যোৎস্নী তামসী যানযোগ্যবেষাভিসারিকা ॥
লজ্জয়া স্বাঙ্গলীনেব নিঃশব্দাখিলমণ্ডনা।
কৃতাবগুণ্ঠা স্নিগ্ধৈক-সখীযুক্তা প্রিয়ং ব্রজেৎ ॥

—যিনি কান্তকে অভিসার করান, বা স্বয়ং অভিসার করেন—তাঁকে অভিসারিকা বলে। অভিসারিকার অভিসারে গমনযোগ্য বেশ দু'প্রকার—জ্যোৎস্নী ও তামসী। সেই নায়িকা নিজের লজ্জায় নিজেই লীন হয়ে, সমস্ত অলংকারাদি শব্দহীন করে এবং অবগুণ্ঠনবতী হয়ে একজন মাত্র স্নেহশীলা সখী সমেত প্রিয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। 'রসকল্পবল্লী'তে আছে ঃ

অভিসারিকা হয় অনেক ধরন।
নায়কের সঙ্গে হয় নায়িকার মিলন॥
কৃষ্ণ অভিসার করে নায়িকার ঠাঁঞি।
কৃষ্ণ লাগি অভিসার করে কভু রাই॥...
যে সময় যেমন বেশ যোগ্য করিয়া।
সঙ্কেত স্থানে যায় সখী সঙ্গে লঞা॥

সুতরাং 'নায়কের গমন কিংবা নায়িকার গমন'—অভিসারের লক্ষণ। তবে নায়িকার অভিসারই অধিকতর গুরুত্ব পেয়েছে, কারণ গৃহ-পরিজন, কুলশীল, লজ্জা সব অতিক্রম করে যে নারী প্রিয়তমের উদ্দেশ্যে দূর-দুর্গম পথে সঙ্কেত স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, তাঁর আত্যন্তিক অনুরাগের গাঢ়ত্ব ও গূঢ়ত্ব সহজেই অনুভব করা যায়। তাই অমরকোষের সংজ্ঞা ঃ 'কান্তার্থিনী তু যা যাতি সঙ্কেতং সাভিসারিকা॥'

সংস্কৃত সাহিত্যে প্রাকৃত নায়িকার অভিসারের উল্লেখ আছে। কিন্তু তা লৌকিক গণ্ডী অতিক্রম করে নি। বৈষ্ণব পদাবলীর অভিসারের ব্যঞ্জনা আরো গভীর। এই অভিসার লৌকিক গণ্ডী অতিক্রম করে অলৌকিক ভগবৎ প্রেমের অপরূপ মাধুর্যকে প্রকাশ করে। প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেমের গাঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায় এর দ্বারা। যে বস্তু দুঃখে লব্ধ, তা প্রাপ্তির আনন্দও অপরিসীম। অভিসারের পথও তাই দূর-দুর্গম। অন্ধকার রজনীতে দূর-দুর্গম পথে আনন্দের কাঁটা মাড়িয়ে বিরহিনী শ্রীরাধা এগিয়ে চলেন সেই পরম বাঞ্ছিতের উদ্দেশ্যে—যে আছে প্রতীক্ষার বাঁশী নিয়ে—

সে যে বাজায় বাঁশী। প্রতীক্ষার বাঁশী,
সুর তার এগিয়ে চলে অন্ধকার পথে।
বাঞ্ছিতের আহ্বান আর অভিসারিকার চলা—
পদে পদে মিলেছে একতান।
তাই নদী চলেছে যাত্রার ছন্দে,
সমুদ্র দুলছে আহ্বানের সুরে।

—পরম বাঞ্ছিতের অশ্রুত আহ্বান যখন কর্ণে প্রবেশ করে, তখন সমাজ সংসার সব মিছে হয়ে যায়; সব লজ্জা-ভয় জলাঞ্জলি দিয়ে, পথের পর্বতপ্রমাণ বাধাকে উপেক্ষা করে ভক্ত ছুটে চলে সেই পরম পুরুষের দিকে। এই-ই তো অভিসার। "পদাবলী সাহিত্যে শ্রীরাধার অভিসারই সমগ্র লীলাতত্ত্বের মেরুদণ্ড।...ইহাই প্রেমাবেগের চূড়ান্ত।" প্রেমের প্রলয়ঙ্করী উন্মাদনায় শ্রীরাধা আর কোন বাধাকেই বাধা বলে মনে করেন না।

তাঁর দেহাত্মবোধ বিলুপ্ত হয়েছে, এ কথা ঠিক। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বোধ প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠেছে, তা—কৃষ্ণপ্রেম। দুর্গম পথে অভিসারে প্রবৃত্ত শ্রীমতীকে তাঁর সখীরা স্মরণ করিয়ে দেন –

মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট ॥
তঁহি অতি দূরতর বাদর দোল।
বারি কি বারই নীল নীচোল ॥
সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস সুরধুনী পার ॥

—কিন্তু সখীদের এ আশঙ্কা অহেতুক। কুলমর্যাদারূপ কপাট যিনি উদ্‌ঘাটন করেছেন, সামান্য কাঠের কপাট তাঁকে কতটুকু বাধা দিতে পারবে ? নিজ মর্যাদারূপ সিন্ধু যিনি পার হয়েছেন, নদীর বাধা তো তাঁর কাছে সামান্য। নিজের তুচ্ছ দেহের ভাবনাও রাধার নেই। কারণ জীবন তো তাঁর কৃষ্ণপদে সমর্পিত—

'যছু পদতলে জীবন সোপলু'।

'উজ্জ্বলনীলমণি'তে দু' প্রকার অভিসারিকার কথা বলা হয়—জ্যোৎস্নী ও তামসী। কিন্তু পীতাম্বর দাসের 'রসমঞ্জরী'তে আট প্রকার অভিসারের বর্ণনা করা হয়েছে :

সেই অভিসার হয় পুন অষ্ট পরকার।
জ্যোৎস্না তামসী বর্ষা দিবা অভিসার ॥
কুজ্ঝটিকা তীর্থযাত্রা উন্মত্তা সঞ্চরা।
গীত পদ্য রসশাস্ত্রে সর্বজনোৎকরা ॥

জ্যোৎস্নী : মল্লিকামালভারিণ্যঃ সর্বাঙ্গীণার্দ্রচন্দনাঃ।
ক্ষৌমবত্যো ন লক্ষ্যন্তে জ্যোৎস্নায়ামভিসারিকাঃ ॥

—মল্লিকা, আভরণ ও চন্দন-চর্চিত শ্রীরাধা 'ধবলিম' বস্ত্র পরিধান করে জ্যোৎস্না অভিসার করেন।

তামসী : কালাগুরু বিচিত্রাঙ্গী নীলরাগাম্বুদাম্বরা।
চন্দ্রোদয়ে পরিত্রস্তা কৃষ্ণপক্ষাভিসারিকা ॥

—কালো অগুরু মাখা বিচিত্র অঙ্গে নীল নিচোল পরিহিতা রাধা চন্দ্রালোক পরিহার করে কৃষ্ণপক্ষে অভিসার করেন।

দিবা অভিসার : মধ্যাহ্ন সময় যখন প্রচণ্ড দিনমণি।
ঝাঁ ঝাঁ বাত বহে উতপ্ত আগুনি ॥
পুরজন সবঁহু রহে কপাট লাগাই।
দিবসে অভিসার করল অবসর পাই ॥

বর্ষা : মেঘ যামিনী অতি ঘন আন্ধিয়ার।
ঐছে সময়ে ধনি করু অভিসার॥
ঝলকত যামিনী দশদিশ আপি।
নীল বসনে ধনি সব তনু ঝাঁপি॥

কুজ্ঝটিকা : আজু ভেল ভাল কুঝটি আন্ধিয়ার।
অযতনে ধনিক ভেলি অভিসার॥

তীর্থযাত্রা : আজু তিনি যোগ পাওল পুণ্যবান।
সবহু চলল তিথি কালিন্দি সিনান॥
বিদগ্ধ নাগর রসিক মুরারি।
নিরভয়ে তোয়ে মিলল বরনারী॥

উন্মত্তা : কামোদ্ভাব ব্যাকুলাত্মা দূতিপক্ষং বিচিন্তয়েৎ।
তৎপশ্চাদ্রমণোদ্দেশে উন্মত্তা সাভিসারিকা॥

সঞ্চরা : অনঙ্গবাণে মহাপীড়া অশঙ্কিত মন।
নিজ গৃহে স্থির নহে মন উচাটন॥
নিজ অঙ্গের বেশ করিতে না পারে।
ভুজে নেপুর লই কঙ্কণ পদ ধরে॥
অঞ্জন কপালে দেই সিন্দুর অধরে।
উন্মত্তা হয়ে সেই মুরলীর স্বরে॥

বৈষ্ণব সাহিত্যে অভিসার কবি-কল্পনাকে সমধিক জাগ্রত করেছে। বিভিন্ন ঋতুতে, বিভিন্ন পরিবেশে অভিসারের নানা বৈচিত্র্যময় সংঘটন। তবে বর্ষাভিসারই কবিচিত্তকে সমধিক উদ্দীপিত করেছে। অভিসারের শ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দদাসের বর্ষাভিসার-পদাবলী শব্দ ও অলংকার চয়ন কৌশলে অপরূপ সুষমা মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। তাঁর 'কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল'—অভিসার প্রস্তুতি বিষয়ক পদটি নানা কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই বিষয়বস্তু তিনি নিয়েছেন 'কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়'-এর নিম্ন পদ থেকে—

মার্গে পঙ্কিনী তোয়দান্ধতমসে নিঃশব্দ সঞ্চারকং
গন্তব্যা দয়িতস্য মেহদ্য বসতির্মুগ্ধেতি কৃত্বামতিম্।
আজানুদ্ধৃত নূপুরা করতলেনাচ্ছাদ্য নেত্রে ভৃশং
কৃচ্ছ্রাল্লব্ধ পদাস্থিতিঃ স্ব-ভবনে পন্থানমভ্যাসতি॥

প্রতিভার গুণে অনুবাদও মূলরূপে প্রতিভাত হয়। গোবিন্দদাসের পদেও একই বক্তব্য, একই কবি-কল্পনার অতিশায়িতা। দয়িতের উদ্দেশ্যে অভিসারের জন্য শ্রীমতী নিজেকে প্রস্তুত করে নিচ্ছেন। কণ্টক ও সর্প-সঙ্কুল পিচ্ছিল পথে, ঘন অন্ধকারের মধ্য দিয়ে কান্তের উদ্দেশ্যে যাত্রার জন্য প্রয়োজন কঠোর সাধনা—গুরুজন বচন কানে না নিয়ে আপন

গৃহেই চলে সে সাধনা। তারপর একদিন সঙ্গীগণকে ছেড়ে একা পথে বেরিয়ে পড়লেন শ্রীমতী। 'অনুরাগ রীত' বুঝি এরূপই। শ্রীমতী চলেছেন—আকাশে মেঘের ঘন ঘটা, ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুতের শিহরণ, প্রচণ্ড বজ্রনির্ঘোষ, আর 'পবন খরতর বলগই'। মনে মনে উৎকণ্ঠা—'হামারি কান্ত নিতান্ত আগুসরি সঙ্কেত কুঞ্জহি গেল।' দ্বিগুণ উৎসাহে শ্রীমতী পথ চলছেন—'তুরিতে চল অব কিয়ে বিচারহ জীবন মঝু আগুসার। তারপর পরম বাঞ্ছিতের সাক্ষাৎ যখন পাওয়া গেল তখন—

তুয়া দরশন আশে কছু নাহি জানলু'
চির দুখ অব দূরে গেল॥

পরম বাঞ্ছিতের সঙ্গে মিলনে পথের কষ্ট সব দূর হয়ে যায়, পরম আনন্দে, পরম তৃপ্তিতে দেহ-মন পরিপ্লুত হয়ে ওঠে। এখানেই অভিসারের সার্থকতা।

(খ) বাসকসজ্জিকা

স্ববাসকবশাৎ কান্তে সমেষ্যতি নিজং বপুঃ।
সজ্জীকরোতি গেহঞ্চ যা সা বাসকসজ্জিকা॥ (উ, নী,)
নায়ক আসিবে বলি মনেতে উল্লাস।
তাম্বুল পুষ্পের মালা সজ্জার বিলাস॥
নানাভূষা করি রহে সখীর সহিতে।
বাসকসজ্জায় রহে উৎকণ্ঠিত চিতে॥

'স্বীয় অবসর ক্রমে প্রিয় আসবেন'—এই মনে করে যে নায়িকা নিজ দেহ ও গৃহ সুসজ্জিত করে রাখেন তাঁকে বাসকসজ্জিকা বলা হয়। বাসকসজ্জিকা নায়িকা আট প্রকার—মোহিনী, জাগ্রতী, রোদিতা, মধ্যোক্তিকা, সুপ্তিকা, প্রগল্‌ভা, সুরসা, উদ্দেশা।

মোহিনী : সজ্জা করি মোহিনী রহে সখীর সহিতে।
কৃষ্ণকে করিব মোহ অনুমান করে চিতে॥

জাগ্রতিকা : নিজ অঙ্গের ভূষা করি করে জাগরণ।
উঠে বসে দ্বারে যাই করে নিরীক্ষণ॥

রোদিতা : বিলাপ করিয়া ধনি করয়ে রোদন।
অন্তরে হর্ষ হইলা নায়কের মিলন॥

মধ্যোক্তিকা : নিকুঞ্জকানন ধনি করে পরিষ্কার।
নিজগুণ গরিমা কিছু করএ বিস্তার॥
নায়ক আইলে যেমতে করিব মিলন।
মনে কত আশা করে কেলি স্মরণ।

প্রগল্‌ভা : প্রগল্‌ভা একাকী রহে কুঞ্জেতে বসিয়া।
নায়ক আসিব বলি উল্লসিত হিয়া॥
কিশলয় সেজ করে বকুল বিছাঅ।
দূতীকে তর্জন করি সঘন পাঠাঅ॥

সর্পিতকা :	কুন্দ কুসুম বেশ বনাই
কুসুম শয়নে উল্লাস।
কুসুমিত কুঞ্জে বেশ বনাওত
সখী সঙ্গে হাস পরিহাস ॥

সুরসা :	নিজ মন্দিরে রহে নির্ভয় হইয়া।
বস্ত্র আভরণ পরে সেজ বিছাইয়া।
দূতি পাঠাইয়া জানে নায়ক সংবাদ।
বিলম্ব দেখিয়া কিছু করে অনুবাদ ॥

উদ্দেশা :	নায়কের উদ্দেশে নিজ সখীরে পাঠায়।
নানা উপচার করি মঙ্গল গায়।

বাসকসজ্জিকা নায়িকার দৃষ্টান্ত :

সাজল কুসুম শেজ পুন সাজই
জারই জারল বাতী।
বাসিত খপুরে, কপূরে পুন বসাই,
ভৈগেল মদন ভরাতি ॥
অজু রাই সাজলি বাসকসেজ।

(গ) উৎকণ্ঠিতা

অনাগাসি প্রিয়তমে চিরয়ত্যুৎসুকা তু যা।
বিরহোৎকণ্ঠিতা ভাববেদিভিঃ সা সমীরিতা ॥

—নিরপরাধ কান্ত না আসায় উৎসুকা নায়িকাকে বিরহোৎকণ্ঠিতা নায়িকা বলে। "উৎকণ্ঠিতা কান্ত-পথ করে নিরীক্ষণ। কতক্ষণে হইবে নায়ক-মিলন" ॥ এ অবস্থায় নায়িকার গাত্রকম্প, চিন্তা, অশ্রুমোচন ও বিলাপ দৃষ্ট হয়। উৎকণ্ঠিতা নায়িকা আট প্রকার :

উন্মত্তা বিকলা স্তব্ধা চকিতা চ অচেতনা।
সুখোৎকণ্ঠা প্রগল্‌ভা চ নির্বন্ধা চেতিলক্ষণা ॥

উন্মত্তা :	'ছট্‌পট্‌ করে কুসুম শয়ানে।
হরি হরি করয়ে শোওরণে ॥
কাহে করু আভরণ বেশ।
দরশন ভেল সন্দেশ।
বিহি মোরে দুরমতি দেল।
মনমথ হানল সেল ॥
লোরে লোচন ঘন পুরে।

বিকলা : নায়ক না দেখি ধনি হএত বিকলা।
পথ পানে চাহে ধনি হইয়া চঞ্চলা॥
কামশরে জর জর করয়ে রোদন।
কতখনে হইবেক নায়ক মিলন॥

স্তব্ধা : ক্ষেণে উঠে ক্ষেণে বৈসে কাতর বয়নী।
নায়কের বিলম্ব দেখি লেখএ ধরণী॥

চকিতা : খনে বিরহে করে নানা অনুতাপ।
খনে খনে কহি ধনি বচন প্রলাপ॥
নায়ক বিলম্ব দেখি উনমত ধায়।
দূতী উপেখিয়া নিজ সখীরে পাঠায়॥

অচেতনা : অচেতন হঞা ভূমি শয্যাতে জাগিয়া।
চিন্তাজ্বরে মূর্চ্ছাতনু রহএ শুতিয়া॥
জল দেই সহচরী করাএ চেতন।
আইলা নাগর রাজ করহ মিলন॥

সুখোৎকণ্ঠিতা : পূর্বে মুগ্ধা যেন করয়ে বিলাস।
সেই কথা মনে গুণি করয়ে উল্লাস।

প্রগল্‌ভা : প্রগল্‌ভা মূর্চ্ছিতা রাত্রৌ পর্যঙ্কে শয়নং ত্যজেৎ।
কান্তাগমনমুৎকণ্ঠা অগ্রে ধাবতি পদ্ধতীম্‌॥

নির্বন্ধা : ছটফট ধরণী শয়ানে।
কত সহে অবলা পরাণে॥
নিমিখে কলপ করি মান।

উৎকণ্ঠিতা নায়িকার চিত্র :

বঁধুর লাগিয়া শেজ বিছাইনু
গাঁথিনু ফুলের মালা।
তাম্বুল সাজনু, দীপ উজারনু,
মন্দির হইল আলা॥
সই, পাছে এসব হইবে আন।
সে হেন নাগর, গুণের সাগর,
কাহে না মিলল কান॥

(ঘ) বিপ্রলব্ধা

কৃতাসঙ্কেতমপ্রাপ্তে দৈবাজ্জীবিতবল্লভে।
ব্যথমানান্তরা প্রোক্তা বিপ্রলব্ধা মনীষিভিঃ॥

—সংকেত স্থানে দৈবাৎ প্রিয়তমে না আসায় ব্যথান্তরা নায়িকাকে বিপ্রলব্ধা বলা হয়। এই অবস্থায় নায়িকার নির্বেদ, চিন্তা, খেদ, অশ্রুপাত, মূর্ছা ও দীর্ঘনিশ্বাস দেখা দেয়। বিপ্রলব্ধা আট প্রকার—

এই বিপ্রলব্ধা হয় অষ্টমতা।
নির্বন্ধা প্রেমমত্তা ক্লেশা বিনীতা ॥
নিন্দয়া প্রখরা আর দূত্যাদরী।
চঞ্চিতা অষ্টবিধা কবি যারে বলি ॥

নির্বন্ধা :
কেলি সজ্জাতলে রহু রজনী বঞ্চিয়া।
সঙ্কেতে বসিয়া থাকে নির্বন্ধ করিযা ॥
দৈব-নির্বন্ধে কান্ত আসিতে না পায়।
সকল রজনী ধনি কান্দিয়া পোহায় ॥

প্রেমমত্তা :
আন আভরণ পরিহরএ সঙ্কেতে।
জাগিয়া পোহায় নিশি কান্দিতে কান্দিতে ॥
আপন যৌবন দেখি কান্দিয়া বিকল।
নিশি পরভাত হইল ন হৈল সফল।

ক্লেশা :
নায়ক না আইল ঘরে জানিয়া নিশ্চয়।
সহচরী সঙ্গে সব দুঃখ কথা কয় ॥

বিনীতা :
বিরহে বিনয় বাক্য কহয়ে সখীরে।
ঝাঁপ দিব আজি আমি যমুনার তীরে ॥

নিন্দয়া :
সখীমুখে শুনি নায়ক আজি না আইল।
মিথ্যা সঙ্কেত মানি রজনী পুহাইল ॥
হারমালা আভরণ ছিণ্ডিয়া ফেলায়।
পুষ্পমালা আদি সব জলেতে ভাসায় ॥

প্রখরা :
জাগিয়া নয়ান জল নিরবধি ঝরে।
বিরহে বিলাপ করে কান্দে উচ্চস্বরে ॥

দূত্যাদরী :
নায়ক আসিব ঘরে সঙ্কেত জানিল।
কোকিলের বাণী হেন শব্দ শুনিল ॥
গুরুজন জাগি ঘরে উঠিল সত্বর।
নায়ক বিমুখ হঞা গেল নিজ ঘর ॥

চঞ্চিতা :
কোপনবতী।

বিপ্রলব্ধা নায়িকার চিত্র :

তেজ সখী কানু আগমন আশ।
যামিনী শেষ ভেল সবহু নৈরাশ ॥
তাম্বুল চন্দন গন্ধ উপহার।
দূরহি ডারহ যমুনাক পার ॥…

(ঙ) খণ্ডিতা

উল্লংঘ্যসময়ং যস্যা প্রেয়ানন্যোপভোগবান্ ।
ভোগলক্ষ্মাঙ্কিতঃ প্রাতরাগচ্ছেৎ সা হি খণ্ডিতা ।

—নায়ক সঙ্কেত কুঞ্জে না এসে অন্য নায়িকার সঙ্গে সম্ভোগের চিহ্নাঙ্কিত হয়ে প্রাতঃকালে যখন নায়িকার সম্মুখে উপস্থিত হন, তখন নায়িকার খণ্ডিতা অবস্থা। এ অবস্থায় নায়িকার রোষ, নিঃশ্বাস, মৌনভাব ইত্যাদি প্রকাশ পায়।

সকল রজনী ধনী কান্দিয়া পোহায়।
প্রভাতে নায়ক আসে তাহার সভায় ॥
অন্য নারী ভোগ চিহ্ন তার কলেবরে।
খণ্ডিতা সে কোপ করে সেই নায়কেরে ॥

খণ্ডিতা নায়িকা আট প্রকার—নিন্দয়া, ক্রোধা, ভয়ানকা, প্রগল্‌ভা, মুগ্ধা, মধ্যা, রোদিতা, প্রেমমত্তা।

নিন্দয়া :
প্রভাত সময়ে কান্ত আইসে তার ঘর।
অন্য রতি চিহ্ন দেখে তার কলেবর ॥
সাক্ষাতে নিন্দা করে নায়ক পেখিয়া।
ধিক্ ধিক্ ভর্চ্ছনা করে লাজ তেয়াগিয়া ॥

ক্রোধা :
ক্রোধ করি রহে নায়িকা নায়ক সাক্ষাতে।
নায়কের অঙ্গে করয়ে দৃষ্টিপাতে ॥
চরণে পড়য়ে নায়ক ক্রোধ দেখিয়া।
অন্যদিকে যায় নায়িকা কর্ণোৎপল তাড়িয়া ॥
অধীরা নায়িকা সেই নাই লজ্জা ভয়।
ভর্চ্ছ'না করিয়া কিছু নায়কেরে কয় ॥

ভয়ানকা :
নায়কের সব অঙ্গ বীভৎস দেখিয়া।
আপন দোষে ভয় পায় লজ্জা লাগিয়া ॥
নিশবদে রহে নায়ক নাহি কহে বাণী।
সহচরীগণ কহে নায়কে ক্রোধ মানি ॥
ধৃষ্ট নায়ক সেই প্রপঞ্চ কথা কয়।
অঙ্গে চিহ্ন নহে মোর দিব্য করয়।

প্রগল্‌ভা :
নায়কে দেখিয়া সেই নায়িকা কহএ।
স্তুতি নিন্দা অতি যত সোল্লুণ্ঠন কয়ে ॥

মধ্যা :
নায়কের অঙ্গ দেখি ক্রোধে কিছু ভাসে।
আইলা শঙ্কর দেব পূজার অভিলাষে ॥

মুগ্ধা :
মুগ্ধা খণ্ডিতা গরিমা না জানে।
ঠমকি ঠমকি হাসে নায়ক বিদ্যমানে ॥

সিন্দুর কজ্জল দেখি নায়কের গায়।
আঁখি ঠারে সখীগণ তাহা দরসায়॥
সহচরীগণ ক্রোধে বলে নায়কেরে।
ভাল হৈল বুঝিলাম তুমার ব্যবহারে॥

রোদিতা : রোদন করিয়া নিশি আছিলাঙ সঙ্কেতে।
নায়ক মিলল আসি নিশি পরভাতে॥
অন্তরে মহাক্রোধ বাহিরে নিবারে।
দুই এক কথা কয় কোপ পরিহারে॥

প্রেমমত্তা : প্রমত্তা নায়িকা কিছু কহয়ে না জানে।
ক্রোধ করি বাক্য কহে নায়ক বিদ্যমানে॥

খণ্ডিতা নায়িকার চিত্র :

যেই দেহে নিলাজ বঁধু লাজ নাহি বাস।
বিহানে পরের বাড়ী কোন্ লাজে আইস॥
বুক মাঝে দেখি তোমার কঙ্কণের দাগ।
কোন্ কলাবতী আজু পায়্যা ছিল লাগ॥·····

(চ) কলহান্তরিতা

যা সখীনাং পুরঃ পাদপতিতং বল্লভং রুষা।
নিরস্য পশ্চাত্তপতি কলহান্তারিতা হি সা॥

—যে নায়িকা পাদপতিত বল্লভকে সখীগণের সম্মুখে প্রত্যাখ্যান করে পরে অনুতাপের আগুনে দগ্ধ হতে থাকেন, তাঁকে কলহান্তরিকা নায়িকা বলে।

কলহান্তরিতা মানে হইয়া বিমুখ
কান্ত ব্যগ্রতা করে হইয়া সম্মুখ॥
চরণে ধরিয়া কান্ত পড়ে ভূমিতলে।
কোপ করি নিষ্ঠুর কথা অপমান করে॥
বিমুখ হইয়া কান্ত নিজ ঘরে যায়।
পিছে অনুতাপ করে বিকল হয়্যা তায়॥

এ অবস্থায় নায়িকার প্রলাপ, সন্তাপ, গ্লানি, দীর্ঘশ্বাস ইত্যাদি প্রকাশ পায়! কলহান্তরিতা নায়িকা আট প্রকার :— আগ্রহা, বিকলা, ধীরা, অধীরা, কোপনবতী, মন্থরা, সমাদরা, মুগ্ধা।

আগ্রহা : কন্দর্পবাণসংভিন্না হ্যনুতাপং সখীং বদেৎ।
সজনি কহে বাঢ়ায়লুঁ মান।
প্রেম ভঙ্গ ভয়ে অব জীউ কাঁপএ
তুহুঁ পরবোধহ কান॥

সো কর-কিশলয়- পরশ উপেখলুঁ
অব কিশলয়ে তনু ফোর।
নব নব নেহ সুধারস-নিরসনে
গরলে ভরল তনু মোর।

বিকলা : কামোদ্ভবসদাপীড়া কামুকী বিকলাপি চ।
এ সখি কাহে উপেখলুঁ কান।
না জানিয়ে দগধি চলল মঝু মান ॥
অব বিচারহ সখি সো পরবন্ধ।
কানুক জে হোয়ে নিরবন্ধ ॥

ধীরা : চরণে ধরি তুহুঁ কত বেরি নিষেধলু
বেরি বেবি সাধলুঁ হাম।
বিরস বযনে হেরি মোবে তুহুঁ কোপলি
চিতে না গুণলি পরিণাম ॥

অধীরা : অধীরা বলেন সখি কি কাজ কবিলে।
হাতের লছিমি কেন পায়েতে ডাবিলে ॥
পুরুখ আপন দোষে করে অনুতাপ।
সখীকে জানায সে আপন সন্তাপ ॥

কোপনা : মানিনী মান ভুজঙ্গে।
জারল বীখ তবল সব অঙ্গে ॥

সমা : সমা সহচবী দোষে দুই জনা ঘোষে।
নায়িকারে গঞ্জিয়া নায়কেরে দোষে ॥

মধ্যরা : নায়কেরে মান কবি বাই রহযে সদনে।
মানিনীকে সখি কিছু কহয়ে বচনে ॥

মুগ্ধা : মুগ্ধা নাহি জানে কিছু মানের বিভেদ।
অনত্র যায় সে দিয়ে পরিচ্ছেদ ॥
তাহার সখী আসি কানুরে বুঝায়।
নায়ক সাধিয়া তার সম্মান বাড়ায় ॥

কলহান্তরিতার উদাহরণ :—

হাম কাহে উপখলু তায়।
অব মন ঘন ঘন রোয় ॥
মোর দুখ কেহ নাহি জানে।
সো বহুবল্লভ কানে ॥
সো বহুবল্লভ সহজাইঁ ভোর।
কৈছনে জানব বেদন মোর ॥

চলইতে চাহু আদর ভঙ্গ।
সহইতে না পারি মদন-তরঙ্গ ॥
এ সখি কাহে উপেখলু° কান।
না জানিএ দগধি চলল মঝু মান ॥ (গোবিন্দদাস)

(ছ) প্রোষিতভর্তৃকা

'দূর দেশং গতে কান্তে ভবেৎ প্রোষিতভর্তৃকা'—যে নায়িকার কান্ত দূরদেশে আছেন, তাকে প্রোষিতভর্তৃকা বলে। এই অবস্থায় নায়িকার ভাব—প্রিয়নাম কীর্তন, দৈন্য, কৃশতা, জাগরণ, মালিন্য, অনাসক্তি, জাড্যতা ও চিন্তাদি।

প্রোষিতভর্তৃকা নায়িকা তিন প্রকার—ভাবী, ভবন্ ও ভূত।

ভাবী : নায়ক বিদেশ যাবে শুনিয়া সুন্দরী।
সহচরী সঙ্গে নানা বিলাপন করি।

ভবন্ কৃষ্ণ গোকুল হইতে মথুরা চলিলা।
এই কথা গোপীসব শ্রবণে শুনিলা ॥
বস্ত্র না সম্বরে কেহ কেশ নাহি বান্ধে।
উপেক্ষা না করে সভে উচ্চস্বরে কান্দে ॥
জোগ জুগতি যত করলহি° সজনী।
সকলি বিফল ভেল বিআকুল রমণী ॥
অক্রুরে গালি দেই কুবোল বলিয়া।
অনুতাপ করে গোপী বিদরয়ে হিয়া ॥

ভূত : মথুরাতে কৃষ্ণ হেথা গোপীগণ।
নানাভাবে উপজয়ে উন্মাদ-লক্ষণ ॥
নানা প্রলাপ করে করিয়া বিসরে।
কি বলিতে কি করে বুঝিতে না পারে ॥

প্রোষিতভর্তৃকার দৃষ্টান্ত :

**হরি গেল মধুপুর হাম কুলবালা।
বিপথে পড়ল যৈছে মালতী মালা ॥
কি কহসি কি পুছসি শুন প্রিয় সজনি।
কৈসনে বঞ্চব ইহ দিন রজনী ॥
নয়নক নিদ গেও বয়নক হাস।
সুখ গেও পিয়া সঙ্গ হাম দুখ পাশ ॥** (বিদ্যাপতি)

(জ) স্বাধীনভর্তৃকা

"স্বায়ত্তাসন্নদয়িতা ভবেৎ স্বাধীনভর্তৃকা"—নায়ক সর্বদা যে নায়িকার অধীন হয়ে তাঁর কাছে কাছে থাকেন, তাঁকে স্বাধীনভর্তৃকা বলে। প্রেম বিভ্রমে আকৃষ্ট নায়ক বিচিত্র সুখ

স্বপ্নে মগ্ন থাকে, নায়িকার সঙ্গ কখনো পরিত্যাগ করতে চায় না। স্বাধীনভর্তৃকা নায়িকার চেষ্টা—জলকেলি, বনবিহার, কুসুম চয়ন প্রভৃতি। এই শ্রেণীর নায়িকা আট প্রকার—কোপনা, মানিনী, মুগ্ধা, মধ্যা, উক্তকা, উল্লাসা, অনুকূলা ও অভিষেকা।

'রস মঞ্জরী'তে স্বাধীনভর্তৃকা নায়িকার লক্ষণ :—

স্বাধীনভর্তৃকা রহে নায়িকার পাশে।
নায়ক যে বশ হয় তাহার প্রেমরসে ॥
যখন যে কহে নায়ক তাহাতে অনুকূল।
সকল নায়িকা হৈতে হএ বহুমূল ॥

স্বাধীনভর্তৃকা নায়িকা আট প্রকার—কোপন, মানিনী, মুগ্ধা, মধ্যা, উক্তকা, উল্লাসা, অনুকূলা, অভিষেকা।

কোপন : কোপ করি মুগ্ধা যেন রহে অধোমুখে।
নায়কের পীরিতে সে মানে রহে দুখে ॥
তাম্বুল সজ্জা করি যদি কান্ত যাচে।
দূরেভারে সেহো নাহি বৈসে তার কাছে ॥
নিজ অঙ্গে রতিচিহ্ন দেখায় সখীরে।
খর-নখ-দসনজ্বালা রহে কলেবরে ॥
সহচরী পীরিতি করি তাহাকে সাজায়।
নায়ক স্তব্ধ হঞা তাহার মুখ চায় ॥

মানিনী : মানিনী গরব করে নায়কের কাছে।
অধীনকান্ত হেরি তাহাকে জিজ্ঞাসে ॥
কোনখানে ব্যথা তোমার কহনা আমারে।
আপনি না কহ কেনে সখীগণের ডরে।

মুগ্ধা : মুগ্ধা স্বাধীন রহে নায়কের পাশে।
কাতর হইয়া কিছু গদগদ ভাষে ॥

মধ্যা : নিজ হাতে নায়ক তাহার বেশ করে।
আগুসরি নায়ক আসি লয়া যায় ঘরে ॥
পথশ্রান্ত দেখি তারে কুশল জিজ্ঞাসে।
ঘাম দূর করে তার চামর বাতাসে ॥

উক্তকা : রতিশ্রান্ত হঞা ধনি বড়ই কাতর।
কাতরে কহয়ে দেখ মোর কলেবর ॥
নিজ হাতে বেশভূষা করহ আমারে।
কেশ ভূষণ সজ্জা সাজহ তাম্বুলে ॥

উল্লাসা : নিজ গর্বেতে ধনি হইয়া উল্লাস।
সখীগণে জানায় সে সৌভাগ্য পরকাশ ॥

নিভৃতে নায়ক সঙ্গে যায় অন্য বন।
অধীন হইয়া কান্ত অনুকূল মন ॥
যমুনার তীরে নব নীরস কুঞ্জে।
পুলকিত তরুবর কিশলয় পুঞ্জে ॥

মনঃকল্পা : নিজের সৌভাগ্যভারে গর্বেতে অধিকা।
সর্বত্র সমান দেখি বাম্য রাধিকা ॥
সকল যূথেশ্বরী মধ্যে একা রাধিকা লইয়া।
অন্য বনে গেলা কৃষ্ণ অনুকূল হঞা ॥

কৃতাভিসারিকা : গোপী-যূথেশ্বরী মধ্যে রাধিকা প্রধান।
সভার অধিক করে তাহার সম্মান ॥
বৃন্দাবনেশ্বরী করি রাইরে বসাইল।
রত্ন-সিংহাসনে তাকে অভিষেক করিল ॥

স্বাধীনভর্তৃকা নায়িকার দৃষ্টান্ত :

যূথে যূথে রঙ্গিনী ব্রজকুল রমনী
কামিনী কানন-মাহ।
সবজন পরিহরি কুঞ্জে চলল হরি
ভুজে ধরি রাইক বাহ ॥
সজনি অব হরি কোন বনে গেল।
গুণবতী গুণহিঁ কানু মন বাঁধল
নাগর অনুকূল ভেল ॥ (গোপালদাস)

উপরে বর্ণিত অষ্টবিধ নায়িকার প্রত্যেকের আবার তিন প্রকার ভেদ বর্তমান—উত্তমা, মধ্যমা ও কনিষ্ঠা। ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রতি প্রেমের তারতম্য হেতু এই প্রকার ভেদ। তবে প্রশ্ন ওঠে—গোপীদের কৃষ্ণপ্রেমে তারতম্য ঘটবে কেন? উত্তর—উত্তমাদি নায়িকাদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যাঁর যেমন ভাব, কৃষ্ণেরও তাঁদের প্রতি তেমন ভাব বর্তমান।—

ভাবঃ স্যাদুত্তমাদীনাং যস্যা যাবান্ প্রিয়ে হরৌ।
তস্যাপি তস্যাং তাবান্ স্যাদিতি সর্বত্র যুজ্যতে ॥

পূর্বে পঞ্চদশ প্রকার নায়িকার কথা বলা হয়েছে। তাদের প্রত্যেকের আবার আট প্রকার ভেদ। তাহলে দাঁড়াল ১৫ × ৮ = ১২০। তাদের আবার উত্তমাদি তিন প্রকার ভেদ। তাহলে মোট নায়িকা সংখ্যা ১২০ × ৩ = ৩৬০। তবে শ্রীকৃষ্ণে যেমন নিখিল নায়কের সকল গুণ বর্তমান, শ্রীরাধাতেও সর্বৈব গুণাদি বর্তমান।

নায়িকার দূতীভেদ

নায়কের সঙ্গে মিলনের জন্য নায়িকার আশ্রিতা-সহায়া নারীকে দূতী বলে। দূতী দু' প্রকার—স্বয়ং দূতী ও আপ্ত দূতী।

স্বয়ং দূতী—অত্যোৎসুক্যাত্রুটদ্ ব্রীড়া যা চ রাগাতিমোহিতা।
স্বয়মেবাভিযুঙ্‌ক্তে সা স্বয়ং দূতী ততঃ স্মৃতা॥

—যাঁর লজ্জা টুটে গেছে, যিনি অনুরাগে বিমোহিত এবং স্বয়ং নায়কের নিকট অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, তাঁকে স্বয়ং দূতী বলে। স্বাভিযোগ (নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ) তিন প্রকার—বাচিক, আঙ্গিক ও চাক্ষুষ। বাচিক হচ্ছে ব্যঞ্জনাময়। এটা দুই প্রকার—শব্দভব ও অর্থভব। এই দুটির প্রত্যেকটি আবার দুই প্রকার—শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক ও অগ্রবর্তি দ্রব্য বিষয়ক (পুরস্থ)। কৃষ্ণবিষয়ক ব্যঙ্গ্য আবার দুই প্রকার—সাক্ষাৎ ও ব্যপদেশ। সাক্ষাৎ বিষয়ক ব্যঙ্গ্য—গর্ব, আক্ষেপ, যাচ্ঞা, নর্ম ইত্যাদি ভেদে বহু প্রকার। ব্যপদেশ অর্থে ব্যাজ বা ছল—অন্য বর্ণনা দ্বারা গূঢ় মনোভাব প্রকাশ করা। অন্য কোন বস্তুর বর্ণনা দ্বারা গূঢ় অভীষ্ট প্রকাশ করাকে ব্যপদেশ বলে—'জল্পে ব্যাজেন কেনাপি ব্যপদেশঃত্র কথ্যতে।' কৃষ্ণ শুনলেও যেন শুনছেন না, এমন মনে করে ছল করে সামনের কোন জন্তুকে লক্ষ্য করে যে জল্প বা উক্তি, তকে পুরস্থ বিষয় বলে।

আঙ্গিক স্বাভিযোগ—অঙ্গুলিসংকেত, সম্ভ্রম ছলে অঙ্গাচ্ছাদন, চরণে ভূমিলিখন, কর্ণ কণ্ডূয়ন, তিলক রচনা, বেশরচনা, ভ্রূ-কম্পন, সখীর প্রতি আলিঙ্গন ও তাড়ন, অধর দংশন, ভূষণ ধ্বনি, তরুতে লতার সংযোগ ইত্যাদি।

চাক্ষুষ—নেত্রের হাস্য, ঘূর্ণন, সঙ্কোচ, বক্রদৃষ্টি, বামচক্ষু দ্বারা দর্শন ও কটাক্ষ প্রভৃতি।

আপ্ত দূতী— ন বিশ্রম্ভস্য ভঙ্গং য কুর্যাৎ প্রাণাত্যয়েষ্বপি।
স্নিগ্ধা চ বাগ্মিণী চাসৌ দূতী স্যাদ্‌গোপসুভ্রুবাম্।
অমিতার্থা নিসৃষ্টার্থা পত্রহারীতি সা ত্রিধা॥

—যিনি প্রাণ গেলেও বিশ্বাস ভঙ্গ করেন না, বাক্য প্রয়োগে নিপুণ ও স্নেহশীলা—তাকে আপ্তদূতী বলা হয়। আপ্তদূতী তিন প্রকার—

অমিতার্থা—যিনি যুগলের ইঙ্গিত বুঝে বিবিধ উপায়ে দুজনের মিলন ঘটান।

নিসৃষ্টার্থা—যিনি নায়ক-নায়িকা দুজনের কোন একজনের কাছ থেকে কার্যভার পেয়ে যুক্তি দ্বারা দুজনের মিলন ঘটান।

পত্রহারী—যিনি নায়ক বা নায়িকার বার্তা বহন করেন।

এই সকল আপ্ত দূতীদের মধ্যে ব্রজে শিল্পকারী, দৈবজ্ঞা, লিঙ্গিনী (তাপসী বেশ-ধারিণী), পরিচারিকা, ধাত্রী কন্যা, বনদেবী এবং সখী আছেন। এঁদের মধ্যে সখী বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সখী—স্বাত্মনোঽপ্যাধিকং প্রেম কুর্বাণান্যোন্যমচ্ছলম্।
বিশ্রম্ভিণী বয়োবেশাদিভিস্তুল্যা সখী মতা॥

যাঁরা পরস্পরের প্রতি নিজের অপেক্ষা অধিক প্রেম পোষণ করেন, পরস্পরের বিশ্বাস-ভাজন এবং বয়স, বেশাদি (অর্থাৎ ভূষণে, রূপে, গুণে, বৈদগ্ধ্যে, সৌন্দর্যে, বিলাসে) পরস্পরের তুল্য, তাঁদের সখী বলে।

রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলায় সখীগণের ভূমিকা অপরিহার্য। তাঁরা—"প্রেমলীলাবিহারাণাং সম্যগ্ বিস্তারিকা সখী। বিশ্বাসরত্নপেটী চ।" ব্রজ সখীগণ রাধার কায়ব্যূহরূপা—কান্তাভাবের বৈচিত্র্য সাধনের জন্য শ্রীরাধাই অনন্ত ব্রজগোপীরূপে প্রকটিতা। রাধাকৃষ্ণের মিলন সম্পাদনেই তাঁদের সুখ। তাঁদের নিজেদের কোনো কামনা নেই।

সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
কৃষ্ণসহ নিজ লীলায় নাহি সখীর মন॥
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজ কেলি হৈতে তাহে কোটি সুখ পায়॥

অথবা,

সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার॥
সখী বিনু এই লীলা পুষ্ট নাহি হয়।
সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়॥

সখীদের ক্রিয়া নানা প্রকার। যেমন—নায়ক-নায়িকার পরস্পরের মধ্যে আসক্তি করানো, উভয়ের অভিসার করানো, নিজ সখীকে কৃষ্ণে সমর্পণ, নর্ম পরিহাস, আশ্বাস-দান, ভূষণ-বিধান, হৃদয়ভাব প্রকাশে পটুতা, দোষের আচ্ছাদন, চামরাদি দ্বারা সেবন, দোষে নায়ক-নায়িকাকে ভর্ৎসনা, পরস্পরের বার্তা প্রেরণ ইত্যাদি।

মঞ্জরীদের সঙ্গে সখীদের পার্থক্য আছে। মঞ্জরী প্রধানা সখীদের অনুবর্তিনী হয়ে রাধাকৃষ্ণের সেবার অংশ নেন। কিন্তু সখীদের মত কৃষ্ণসুখের নিমিত্ত তাঁরা প্রয়োজনে দেহদান করেন না, সে অধিকারও তাঁদের নেই। রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবার অধিকার লাভ করেই তাঁরা কৃতার্থ বোধ করেন। সেবায় আনন্দ লাভই তাঁদের একান্ত কাম্য—

হরি, হরি, হেন দিন হইবে আমার।
দুহুঁ মুখ নিরখিব দুহু অঙ্গ পরশিব
সেবন করিব দোঁহাকার॥
ললিতা বিশাখা সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে
মালা গাঁথি দিব নানা ফুলে।....

মধুর বা শৃঙ্গাররস-ভেদ

বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারি ভাবের সংযোগে স্থায়ী-ভাব রসে পরিণত হয়। মধুর ভক্তি রসের আলম্বন বিভাব—কৃষ্ণ ও কান্তাগণ; অনুভাব—নৃত্য, গীত, অশ্রু, কম্প, পুলক ইত্যাদি, উদ্দীপন বিভাব—গুণ, চেষ্টা, প্রসাধন, স্মিত, বংশী, অঙ্গ, সৌরভ ইত্যাদি, ব্যভিচারী ভাব—নির্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি ইত্যাদি তেত্রিশটি। এই সকলের সম্মিলনে মধুরা রতি নামে স্থায়ীভাবের রস-নিষ্পত্তি ঘটে। বর্তমান ক্ষেত্রে মধুর রসের ভেদ সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।

মধুর রসের দুইটি ভেদ—বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ।

—'স বিপ্রলম্ভঃ সম্ভোগ ইতি দ্বেধোজ্জ্বলো মতঃ'।

বিপ্রলম্ভ

যুনোরযুক্তয়োর্ভাবো যুক্তোয়োর্বাথ যো মিথঃ।
অভীষ্টালিঙ্গনাদীনামনবাপ্তৌ প্রকৃষ্যতে।
স বিপ্রলম্ভ বিজ্ঞেয়ঃ সম্ভোগোন্নতি কারকঃ॥

—নায়ক ও নায়িকার যুক্ত বা অযুক্ত অবস্থায় পরস্পরেব অভীষ্ট আলিঙ্গনাদির অপ্রাপ্তিতে যে ভাব দেখা দেয়, তাকে বিপ্রলম্ভ বলে। বিপ্রলম্ভ সম্ভোগের উন্নতিকারক।

ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে।
কষায়িতে হি বস্ত্রাদৌ ভূয়ান্ রাগো বিবর্দ্ধতে॥

—বিপ্রলম্ভ ছাড়া সম্ভোগের পুষ্টি হয় না। যেমন—রঞ্জিত বস্ত্র আবার রঞ্জিত করলে তাঁর রাগ (উজ্জ্বলতা) আরো বৃদ্ধি পায়।

বিপ্রলম্ভ চার ভাগে বিভক্ত:

পূর্বরাগস্তথা মানঃ প্রেমবৈচিত্ত্যমিত্যপি।
প্রবাসশ্চেতি কথিতো বিপ্রলম্ভশ্চতুর্বিধঃ॥

—পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস—বিপ্রলম্ভের এই চারটি ভেদ কথিত হয়েছে।

(ক) পূর্বরাগ

পূর্বরাগের সংজ্ঞা:

রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্বং দর্শনা শ্রবণাদিজা।
তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্বরাগ স উচ্যতে॥

মিলনের পূর্বে দর্শন ও শ্রবণের দ্বারা নায়ক-নায়িকার হৃদয়ে যে রতি উন্মীলিত হয়, তাকে বলে পূর্বরাগ। মিলনের পূর্বে রূপ-দর্শনে বা রূপগুণাদির কথা শ্রবণে নায়ক বা নায়িকার মনে যে রতির উদ্গম হয়, তার ফলে মিলনের বাসনা জন্মে। কিন্তু তৃষ্ণা পরিপূরিত না হওয়ায় বিপ্রলম্ভের উদ্ভব। এই বিপ্রলম্ভকালে নায়ক বা নায়িকার সঙ্গে অনন্যমনা চিন্তার ফলে স্ফূর্তিতে বিষয়ালম্বন বিভাবের আবির্ভাব এবং তখন মানস, চাক্ষুষ ও কায়িক সম্ভোগ হয়। এভাবেই পূর্বরাগ রতি আস্বাদ্য রূপে রসত্ব প্রাপ্ত হয়।

'রসকল্পবল্লী'তে পূর্বরাগের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : 'সঙ্গ নহে রাগ জন্মে কহি পূর্বরাগ।' এই উক্তির দ্বারা হৃদয়কমলের প্রথম উন্মেষ-চেতনাকে বোঝাচ্ছে। ইংরাজীতে একেই বলা হয়েছে : 'Love at the first sight।' তবে ইংরাজি সংজ্ঞাটির মধ্যে পূর্বরাগের সংকুচিত অর্থের সন্ধান মেলে। এক কথায় পূর্বরাগের সহজ সংজ্ঞাটি হচ্ছে, প্রথম দর্শনে বা শ্রবণে নায়ক বা নায়িকার হৃদয়ে যে রাগ-লক্ষণ অঙ্কুরিত হয়, তাকে বলে পূর্বরাগ।

নায়ক বা নায়িকা—যে কারো মনে পূর্বরাগ রতির প্রথম উন্মীলন হতে পারে। তবে রসশাস্ত্রে প্রথমে নায়িকার পূর্বরাগ বর্ণনার বিধি দেওয়া হয়েছে। সাহিত্যদর্পণকার বলেছেন —'আদৌ বাচ্যঃ স্ত্রিয়া রাগঃ পশ্চাৎ পুংসস্তদিঙ্গিতৈঃ।' 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে আছে—'অপি মাধব রাগস্য প্রাথম্যে সম্ভবত্যপি। আদৌ রাগে মৃগাক্ষীণাং প্রোক্তে স্যাচ্চারুতাধিকা॥'

—কৃষ্ণের পূর্বরাগ প্রথমে উদ্ভব হলেও, তাঁর প্রিয়াগণের পূর্বরাগ প্রথমে বর্ণিত হলে অধিক চারুতা হয়।

দর্শন ও শ্রবণ—দু'ভাবে পূর্বরাগ রতির উন্মীলন। দর্শন আবার তিন প্রকার—সাক্ষাৎ দর্শন, চিত্রে দর্শন, স্বপ্নে দর্শন। 'রসকল্পবল্লী'তে বলা হয়েছে :

দর্শনে শ্রবণে রাগ দুই ত প্রকার।
সাক্ষাৎ দর্শন এক চিত্র পটে আর॥
স্বপ্ন দেখি উঠি এক করে আলিঙ্গন।
এই অনুভব সূত্র বিষম দর্শন॥

সাক্ষাৎ দর্শন :

বেলি অবসান কালে একা গিয়েছিলাম জলে
জলের ভিতরে শ্যাম রায়।
ফুলের চূড়াটি মাথে মোহন মুরলী হাথে
পুন কানু জলেতে লুকায়॥ (রামানন্দ বসু)

চিত্রে দর্শন :

এমন মূরতি কেমন করি।
লিখিলে বিশাখা ধৈরজ ধরি॥
দেখি দেখি পট আনহ কাছে।
এমন পুরুষ কি জগতে আছে॥ (রাধামোহন)

স্বপ্নে দর্শন :

মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে এথা
শুন শুন পরাণের সই।
স্বপনে দেখিলুঁ যে শ্যামল বরণ দে,
তাহা বিনু আর কারো নই॥ (জ্ঞানদাস)

শ্রবণ : সখী, দূতী, ভাট প্রভৃতির কাছ থেকে রূপগুণাদির বর্ণনা শ্রবণে কিম্বা সুরলহরী শ্রবণে পূর্বরাগ জন্মে। 'কদম্বের বন হইতে কিবা শব্দ আচম্বিতে'—পদটি এর উদাহরণ।

॥ ২ ॥

পূর্বরাগ তিন প্রকার—সাধারণ, সমঞ্জস ও প্রৌঢ়। সাধারণী রতিতে জাত পূর্বরাগকে বলা হয় সাধারণ পূর্বরাগ। সাধারণী রতি অর্থে যে রতি গাঢ় নয়। কৃষ্ণকে দর্শন করে, তাঁর রূপলাবণ্যে বিহ্বল হয়ে সম্ভোগকামনায় এই রতির জন্ম। এই রতির মূলে থাকে ইন্দ্রিয়পিপাসা চরিতার্থের বাসনা। এই 'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা'কে রতি বলা হয় এ কারণেই যে, 'কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা'—অতি সামান্য হলেও এতে বর্তমান থাকে। কুব্জার পূর্বরাগ এই স্তরের।

কৃষ্ণের রূপগুণের কথা শ্রবণ করে যেখানে সম্ভোগেচ্ছা জন্মে এবং শাস্ত্রমতে বিবাহের দ্বারা সম্ভোগেচ্ছা পূরণের আকাঙ্ক্ষা দেখা দেয়, তাকে বলা হয় সমঞ্জসা রতি। সত্যভামা ও রুক্মিণীর কৃষ্ণবিষয়ক রতি সমঞ্জসা।

প্রৌঢ় পূর্বরাগ এ দুই থেকে অনেক উচ্চ স্তরের। সমর্থা রতিতে জাত পূর্বরাগকে বলা হয় সমর্থ বা প্রৌঢ়পূর্বরাগ। সমর্থা রতির বৈশিষ্ট্য এই যে, এই রতি স্বসুখবাসনাগন্ধলেশশূন্যা, কৃষ্ণের প্রীতি-ইচ্ছা পূরণের অভিলাষেই এর উন্মীলন। লোকধর্ম, দেহধর্ম, বেদধর্ম —সব কিছুই এতে তুচ্ছ মনে হয়। কৃষ্ণ-সুখই একমাত্র লক্ষ্য। ব্রজগোপীদের রতি সমর্থা। বৈষ্ণবরস-শাস্ত্রে সমর্থারতিই শ্রেষ্ঠা।

॥ ৩ ॥

প্রৌঢ় পূর্বরাগে নায়িকার দশ দশা উপস্থিত হয়। এই দশ দশা হোল :

লালসোদ্বেগজাগর্য্যাস্তানবং জড়িমাত্র তু।
বৈয়গ্র্যং ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দশা দশ ॥

—লালসা, উদ্বেগ, জাগর্য্যা, তানব, জড়িমা, বৈয়গ্র্য, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু। পূর্বরাগের প্রৌঢ়তাবশতঃ এই সকল দশাও প্রৌঢ়ই হয়।

লালসার সংজ্ঞা : 'অভিষ্টলিপ্সয়া গাঢ়গৃধ্নুতা লালসো মতঃ।'—অভীষ্ট বস্তুকে পাওয়ার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষাকে বলা হয় লালসা। এতে ঔৎসুক্য, চপলতা, ঘূর্ণাশ্বাস—প্রভৃতি ভাবোদয় হয়। লালসা যত তীব্র হয়, তত তার গাঢ়ত্ব সূচিত হয়। এই স্তরে প্রাপ্তির উৎকণ্ঠা যতই তীব্র হোক, তা থাকে মনের সংগোপনে। কিন্তু উদ্বেগস্তরে মনের চঞ্চলতা, দীর্ঘশ্বাস, অশ্রু, চাপল্য, বৈবর্ণ, স্বেদ প্রভৃতি প্রকাশ পায়। 'উদ্বেগো মনসঃ কম্পস্তত্র নিশ্বাসচাপলে'। আর জাগর্য্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : 'নিদ্রাক্ষয়স্তু জাগর্য্যা স্তম্ভশোষগদাদিকৃৎ।' জাগর্য্যায় নিদ্রার অভাব দেখা দেয়। তানব অর্থে অঙ্গের কৃশতা বোঝায়—'তানবংকৃশতাগাত্রে দৌর্বল্যভ্রমণাদিকৃৎ।' উৎকণ্ঠা, চিন্তা, নিদ্রার অভাব ইত্যাদি কারণে শরীর দুর্বল ও কৃশ হয়ে পড়ে। [তাতে দৌর্বল্য ও ভ্রমণাদি প্রকাশ পায়। জড়িমা স্তরে নায়িকার ইষ্ট-অনিষ্টের কোন জ্ঞান থাকে না, দর্শন ও শ্রবণ শক্তি লুপ্ত হয়ে যায়। —"ইষ্টানিষ্টাপরিজ্ঞানং যত্র প্রশ্নেষ্বনুত্তরম্। দর্শন-শ্রবণাভাবো জড়িমা সোঽভিধীয়তে ॥" এ স্তরে বাহ্যজ্ঞান-লুপ্ত নায়িকার হুঙ্কার, স্তম্ভ, ভ্রম, শ্বাস প্রভৃতি ভাব প্রকাশ পায়। বৈয়গ্র্য অর্থে বোঝায় ভাবগাম্ভীর্যজনিত বিক্ষোভের অসহিষ্ণুতা। ভাবোৎকণ্ঠায় তীব্র আলোড়নে মন বিক্ষুব্ধ হয়। হৃদয়-বেদনা হয়ে ওঠে একান্ত অসহনীয়। এই স্তরে

অবিবেক, নির্বেদ, খেদ, অসূয়া—ইত্যাদি দেখা দেয়। বৈয়গ্র্যের সংজ্ঞা : বৈয়গ্র্যং ভাবগাম্ভীর্য্যবিক্ষোভাসহতোচ্যতে।' আর ইষ্টের অ-প্রাপ্তিতে শরীর যখন পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করে এবং উত্তপ্ত হয়, তখন হয় ব্যাধি দশা।—'অভীষ্টালাভতো ব্যাধিঃ পাণ্ডিমোত্তাপলক্ষণঃ।" এই দশায় শীত, স্পৃহা, মোহ, বিশ্বাস ও পতন সূচিত হয়। উন্মাদ দশার লক্ষণ :

সর্বাবস্থাসু সর্বত্র তন্মনস্কতয়া সদা।
অতস্মিং স্তদদি ভ্রান্তিরুন্মাদ ইতি কীর্ত্ত্যতে।

—সর্বদাই তন্ময়ভাব, ফলে যে বস্তু যা নয়, তাই বলে ভ্রান্তি জন্মে। এই অবস্থায় অভীষ্ট বস্তুর প্রতি দ্বেষ, নিঃশ্বাস, নিমেষ-বিরহ প্রকাশ পায়। মোহের স্বরূপ : 'মোহো বিচিত্ততা প্রোক্তো নৈশ্চল্য-পতনাদিকৃৎ।' মোহ হচ্ছে বিচিত্ততা অর্থাৎ চিত্তের বিপরীত গতি। মোহ চেতনারহিত, ফলে নিশ্চলতা ও পতন হয়ে থাকে মৃত্যুদশার লক্ষণ :

তৈস্তৈঃ কৃতৈঃ প্রতিকারৈঃ যদি ন স্যাৎ সমাগমঃ।
কন্দর্পবাণ কদনাত্তত্র স্যান্মরণোদ্যমঃ॥

—দূতী প্রেরণ ও পত্রের মাধ্যমে প্রেম নিবেদন করা সত্ত্বেও যদি কান্ত সমাগত না হন, তাহলে কন্দর্পবাণের পীড়নে মরণের উদ্যম হয়। এই মরণোদ্যম কালে নায়িকা নিজের প্রিয়বস্তু সখীগণকে অর্পণ করেন। এই দশায় ভৃঙ্গ, মন্দ পবন, জ্যোৎস্না, কদম্ব, জলধর, বিদ্যুৎ, ময়ূর, কোকিলরব প্রভৃতি বহু উদ্দীপন বিভাব প্রকটিত হয়।

সমর্থারতিতে যে দশটি দশার কথা উল্লিখিত হোল, তার প্রত্যেকটির মধ্য দিয়ে আকর্ষকের আকর্ষণের তীব্রতা সূচিত হয়। লালসা থেকে পূর্বরাগের শুরু, মৃত্যুদশায় গিয়ে তা চরমে উন্নীত। প্রেমাঙ্কুরের মহীরুহরূপ ধারণের অতিপ্রত্যক্ষ আভাস পাওয়া যায় পূর্বরাগ পর্য্যায়ের এই দশ দশার ভিতর দিয়ে।

॥ ৪ ॥

মধুররসের পদাবলীতে পূর্বরাগ প্রেমাভিব্যক্তির তথা রসপর্যায়ের সূচনা স্তর। কৃষ্ণকে দেখে বা তাঁর কথা শুনে রাধার হৃদয়মুকুল প্রস্ফুটিত হওয়া কিম্বা রাধার কারণে কৃষ্ণহৃদয়ে প্রেমাঙ্কুর উপ্ত হওয়া—সাধারণ দৃষ্টিতে প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার প্রেম-চেতনার মতই মনে হয়। মানবপ্রেমের রূপবিন্যাসে বর্ণিত রাধাকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গের বৈচিত্র্য পূর্বরাগ স্তরেও লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এ সবই অলৌকিক।

এই অলৌকিক রূপ ও রসবৈচিত্র্যের সুষ্ঠু প্রকাশের জন্য ভক্ত কবিগণ তিলে তিলে সুচয়িত ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার প্রভৃতির জন্য কাব্যলক্ষ্মীর আরাধনাও করেছেন। পূর্বরাগ বর্ণনায় কবিগণ অনেক ক্ষেত্রেই কবিমানসের প্রভাবাধীন হয়ে পড়েছেন। ফলে কেউ রাধার, কেউ কৃষ্ণের পূর্বরাগ বর্ণনায় সমধিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। দেহের বর্ণনায় বিদ্যাপতি এবং হৃদয় রহস্যে উন্মোচনে চণ্ডীদাস সমধিক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

রাধার হৃদয়ে সঞ্জাত পূর্বরাগ প্রথম থেকেই অতি গভীর স্তরে নিহিত। চণ্ডীদাসের রাধা তো প্রথম স্তরেই প্রৌঢ় পারাবতী। হওয়া স্বাভাবিক। প্রথম দর্শনজাত বা শ্রবণজাত

রতি হচ্ছে পূর্বরাগ। এ তো আলঙ্কারিক অর্থে। আসলে কি তাই? 'আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি যুগল প্রেমের স্রোতে, অনাদিকালের হৃদয় উৎস হতে'—সেই অনাদিকালের পথ বেয়েই তো চলেছে তাঁদের যুগল প্রেমের রঙ্গলীলা। তবুও বৈষ্ণব রসপর্যায় অনুসারে পূর্বরাগকে বলা হয় প্রেমের সূচনা সুর। কৃষ্ণপ্রেমের মাধুর্য, মহিমা ও আকর্ষণ এমনই যে, কৃষ্ণকে চকিত দর্শন করেই রাধার হৃদয়-মন উন্মথিত উঠেছে :

আধক আধ— আধ চিঠি অঞ্চলে
যব ধরি পেখলুঁ কান।
কত শত কোটি কুসুম শরে জর জর
রহত কি যাত পরাণ॥

চকিত দর্শনেই রাধা একেবারে আত্মহারা। দুর্নিবার হৃদয়াবেগ তাঁকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলেছে। ঘরছাড়ানো বংশী ও বংশীধারী—দুয়ের আকর্ষণই অতি প্রবল ও সক্রিয়। ফলে ঘর-সংসারের কোন মোহই রাধাকে আকৃষ্ট করতে পারছে না। রূপসাগরে ডুব দিয়ে যে অরূপরতনের সন্ধান পেয়েছে, অন্য সব কিছু ভুলে সমস্ত হৃদয়মন তো তাতেই নিমগ্ন থাকতে চায়—

রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥
ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরান।
অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি করে প্রাণ॥

কৃষ্ণের রূপ ও স্বরূপ—দুয়ের আকর্ষণেই রাধা অধীরা। শুধু—'উড়ু উড়ু আনছান ধক ধক করে প্রাণ।' এখন রাধা—

বিরতি আহারে রাঙাবাস পরে
যেমতি যোগিনী পারা।

॥ ৫ ॥

কৃষ্ণের পূর্বরাগে রাধার দেহের প্রতি আকর্ষণই অধিক প্রকাশিত। এটা স্বাভাবিক। নারী মুগ্ধ হয় পুরুষের গুণে, আর পুরুষ মুগ্ধ হয় নারীর অপরূপ দেহ-সৌন্দর্যে। অন্ততঃ প্রথম প্রেমের ক্ষেত্রে এ উক্তি সত্য। যেমন, বিদ্যাপতির পদে কৃষ্ণ কর্তৃক দৃষ্ট রাধিকার সৌন্দর্য :

যব গোধূলি সময় বেলি।
ধনি মন্দির বাহর ভেলি।
নব জলধর বিজুরি রেহা
দ্বন্দ্ব পসারি গেলি॥

রাধা মন্দির থেকে বাইরে এলেন গোধূলি বেলায়। মনে হোল : মেঘের বুকে যেন বিদ্যুতের চমক খেলে গেল। এখানে নবজলধর ও বিদ্যুৎরেখা—এই দুয়ের বৈপরীত্যজাত

সৌন্দর্যের যে আবেদন, তা তো কৃষ্ণের হৃদয়ের কাছে। বিদ্যাপতির আর একটি পদের দুটি পংক্তি :

লোচন জনু থির ভৃঙ্গ আকার।
মধু মাতল কিএ উড়ই না পার॥

শ্রীরাধার চোখ যেন চোখ নয়, দুটি কালো ভ্রমর। স্থির ভ্রমর। স্থির কারণ মধুপানে মত্ত হয়ে আর উড়তে পারছে না। রাধিকার রূপবহ্নি শুধু আকৃষ্ট করে না কৃষ্ণকে, তাঁর গমন-ভঙ্গীর চকিত দৃশ্যটুকুও তাঁর হৃদয়ে উদ্দীপনা জাগায়—'চলে নীল শাড়ি নিঙারি নিঙারি পরাণ সহিত মোর।' এই রতিরাগের আবেশেই নায়কের মর্মবেদনা উচ্ছ্বসিয়া ওঠে :

যাহাঁ যাহাঁ নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি।
তাহাঁ তাহাঁ বিজুরি চমকময় হোতি॥

ভক্ত কবিও সখীর কণ্ঠে গেয়ে ওঠেন :

এমন পিরীতি কভু নাহি শুনি।
পরাণে পরাণে বান্ধা আপনা আপনি॥

(খ) মান

'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে শ্রীরূপ গোস্বামী মানের নিম্নলিখিত সংজ্ঞা নির্দিষ্ট করেছেন :

স্নেহস্তূৎকৃষ্টতা ব্যাপ্ত্যা মাধুর্য্যং মানয়ন্নবম্।
যো ধারয়ত্য দাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীর্ত্যতে॥

অর্থাৎ "যে স্নেহ উৎকৃষ্টতাপ্রাপ্তিহেতু নূতন মাধুর্য্য অনুভব করায় এবং স্বয়ং অদাক্ষিণ্য (কৌটিল্য) ধারণ করে, তাহাকে মান বলা হয়।" স্নেহ গাঢ়তা প্রাপ্ত হয়, ফলে প্রিয়ের মাধুর্য্য নূতনতর বলে অনুভূত হয়। কিন্তু বাহ্যিক হাবভাবে প্রকাশিত হয় কৌটিল্য বা বামতা। 'ভিতরে প্রচুর আনন্দ সত্ত্বেও যে বাহিরে অদাক্ষিণ্য বা কৌটিল্য—বাম্য, বক্র ব্যবহার, ইহাই হইতেছে মানের প্রধান লক্ষণ।" (গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন)।

কিন্তু এখানে প্রশ্ন জাগে—প্রেমের গূঢ়ত্ব, গাঢ়ত্ব এবং তার আস্বাদন, সব কিছুরই তাৎপর্য যখন স্বয়ং সচ্চিদানন্দ পরম রসঘন বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ, তখন এই কৌটিল্য কেন? এর উত্তরে বলা যায় যে, প্রেমের গতি বড়ই কুটিল—ভাগবত প্রেমও। আর বক্রতার বৈচিত্র্যের মধ্যেই উপলব্ধ হয় নূতনতর আনন্দের স্বাদ, যা শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দিত ক'রে তোলে।

শ্রীল রূপ গোস্বামী মানের সংজ্ঞা অন্য ভাষায়ও দিয়েছেন—

দম্পত্যোর্ভাব একত্র সতোরপ্যনুরক্তয়োঃ।
স্বাভীষ্টাশ্লেষবীক্ষাদিনিরোধী মান উচ্যতে॥

—একত্র থাকলেও পরস্পর অনুরক্ত নায়ক-নায়িকার নিজ নিজ ইচ্ছানুযায়ী আলিঙ্গন, দর্শন, প্রিয়ভাষণ প্রভৃতির প্রতিবন্ধক ভাবকে মান বলে।

মানের সঞ্চারিভাব— নির্বেদ, শঙ্কা, অমর্ষ, চাপল্য, গর্ব, অসূয়া, অবহিত্থা, গ্লানি ও চিন্তা।

মান দু'প্রকার—সহেতু, নির্হেতু। অন্য নায়িকার প্রতি নায়কের আকর্ষণের ব্যাপার দেখে ও শুনে ঈর্ষায় সহেতু মান নায়িকার মনে দেখা দেয়। নায়কের প্রতি প্রণয়ের আধিক্যই এই ঈর্ষার কারণ। সখী বা শুকমুখে শ্রবণ। দর্শন—প্রিয়গাত্রে ভোগাঙ্ক, গোত্রাস্খলন (প্রতি নায়িকার নামোচ্চারণ) প্রভৃতি। নায়ক ও নায়িকার মধ্যে অতি আসক্তির ফলে অকারণে নির্হেতু মানের উদ্ভব হয়। অতি আসক্তির পরিণামেই এটা ঘটে থাকে।

মানের দু'ভাগ—উদাত্ত মান, ললিত মান। ঘৃতস্নেহজাত মান হচ্ছে উদাত্ত মান আর মধুস্নেহজাত মান হচ্ছে ললিত মান। চৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত আছে :

সাধন ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হৈলে পরে প্রেম নাম কয়॥
প্রেম বৃদ্ধি ক্রমে স্নেহ মান প্রণয।

ঘৃত স্নেহ জাতীয় প্রেমে থাকে তদীয়তাময় ভাব—অর্থাৎ 'আমি তোমার'—এই ভাব, আর মধুস্নেহ জাতীয় ভাবে মদীয়তাময় অর্থাৎ 'তুমি আমার'—এই ভাব বর্তমান থাকে।

উদাত্তমানকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে—দাক্ষিণ্যোদাত্ত মান, বাম্যগন্ধোদাত্ত মান। দাক্ষিণ্যোদাত্ত মান হচ্ছে—অন্তরে কৌটিল্য, কিন্তু বাইরে দাক্ষিণ্য অর্থাৎ সারল্যের ভান। যেমন—শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর সামনে শ্রীরাধার প্রশংসা করলে চন্দ্রাবলী অন্তরে কুপিত হলেন ; কিন্তু বাইরে উদারতা প্রকাশ করলেন।

আর বাম্যগন্ধোদাত্ত মান হোল : অন্তরে দাক্ষিণ্য, কিন্তু বাইরে কৌটিল্যের প্রকাশ। যেমন, একবার শ্রীকৃষ্ণ দীর্ঘ অদর্শনের পর গোপীদের সম্মুখে উপস্থিত হ'লে তাঁরা ঈষৎ ভ্রূভঙ্গী দ্বারা তাঁকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। এখানে অন্তরে তাঁরা পরিপূর্ণভাবে কৃষ্ণপ্রেম মাধুর্য আস্বাদন করছেন, কিন্তু বাইরে কুটিলতা প্রদর্শন করছেন।

ললিত মান সম্পর্কে বলা হয়েছে, "মধুস্নেহ যদি স্বাতন্ত্র্য দ্বারা হৃদয়ঙ্গম কৌটিল্য এবং নর্ম-বিশেষ ধারণ করে, তাহা হইলে তাহাকে ললিত মান বলা হয়।" ললিত মান দু'প্রকার —কৌটিল্যললিত ও নর্মললিত।

পদাবলী সাহিত্যে মানের তাৎপর্য ও প্রাধান্য বর্তমান। মানের হেতু—নায়িকা মনে করে, নায়ক তাকে অবহেলা করে অন্য নায়িকার প্রতি আসক্ত। বৈষ্ণব সাহিত্যে রাধা নায়িকা, কৃষ্ণ নায়ক, আর প্রতিনায়িকা চন্দ্রাবলী অসীম গুণসম্পন্না। তার মাধুর্য ও প্রেম কৃষ্ণ উপেক্ষা করতে না পেরে তার কুঞ্জে রাত্রি যাপন করেছেন ; পরদিন এসেছেন শ্রীরাধিকার কাছে। নয়ানের কাজর বয়ানে লেগেছে সর্বাঙ্গে ভোগচিহ্ন। খণ্ডিতা শ্রীরাধার প্রেম বামতা প্রাপ্ত হয়। তিনি রুষ্টা হন। এ অবস্থার নাম খণ্ডিতা। খণ্ডিতা নায়িকা যখন নায়কের সঙ্গে কলহে প্রবৃত্ত হন, তখন তিনি কলহান্তরিতা। তখন শেল সম বচনে বিদ্ধ করতে থাকেন নায়ককে। সমস্ত বিশ্বাস আজ নষ্ট হয়ে গেছে। তিনি কুঞ্জ থেকে চলে যেতে বললেন কৃষ্ণকে। নানা প্রবোধ বাক্যে রাধিকাকে শান্ত করতে না পেরে কৃষ্ণকে চলে যেতে হোল। কিন্তু তার পরেই শ্রীমতীর অনুতাপ শুরু। তিনি বুঝলেন :

আকুল প্রেম পহিল নহি জানলু
সো বহুবল্লভ কান।
আদর সাধে বাদ করি তা সঞে
অহর্নিশি জ্বলত পরাণ॥

কিন্তু মানের রহস্যই এই যে, হৃদয়ের কথা ব্যক্ত কিছুতেই করবেন না শ্রীমতী। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের আগ্রহ তাঁর প্রবল, কিন্তু বাইরে তিনি এমন ভাব দেখাচ্ছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতি তাঁর মনে বিরক্তিই উৎপাদন করছে। সুতরাং বিরক্তি অপনোদনের জন্য প্রয়োজন অন্য পক্ষের সক্রিয় প্রচেষ্টা। শ্রীকৃষ্ণই তাই অগ্রণী হলেন—'স্মরগরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং দেহি পদপল্লবমুদারম্।'

চরণ কমলে পড়ল কান।
সখীর বচনে তেজল মান॥
ধনি মুখ শশি হবি চকোর।
হেরিতে দুহুঁক গলয়ে লোর॥

ক্ষণিকের অভিমান চোখের জলে ভেসে গেল। এ অশ্রু মিলনের আনন্দাশ্রু। মাধব, চন্দ্রাবলীর নন, অন্য কারো নন, একান্ত আমারই। 'হৃদয় উপর থুওল রাই।"

দুহুঁ মুখ দরশনে দুহুঁ ভেল ভোর।
দুহুঁক নয়নে বহে আনন্দ লোর॥...
মান বিরামে ভেল এক সঙ্গ॥

মানের পদে ফুটে উঠেছে—ভক্তের অসীম আকুতির একটি নিখুঁত প্রতিচ্ছবি। সর্ব সমর্পণ করেও পরম ভক্ত যখন সেই সচ্চিদানন্দ রসঘন বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের কৃপা পায় না, তখন তার অভিমান জন্মে। প্রেমের প্রগাঢ়তা এতে বেশী বলেই মান পর্যায় এত রসঘন। সকল প্রকার ভেদবুদ্ধি এখানে লুপ্ত।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে উল্লিখিত হয়েছে:

প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হৈতে তাহা হরে মোর মন॥

প্রিয়ার ভর্ৎসনার ভিতর দিয়েই তাঁর গভীর প্রেমের পরিচয় পেয়ে পুলকিত হয়ে ওঠেন কৃষ্ণ। 'ঐশ্বর্য শিথিল প্রেমে নহে মোর প্রীত'—শ্রীকৃষ্ণের উক্তি। মধুর রসের সাধনাতেই তিনি সবচেয়ে বেশী মুগ্ধ। আমরা 'দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা'। ঐশ্বর্যজ্ঞানে নয়, আমাদের গার্হস্থ্য পরিবেশের পটভূমিকায় আমাদের একজন মনে করেই চলে তাঁর আরাধনা। সুতরাং দাম্পত্য প্রেমে যেমন আছে প্রীতির প্রকাশ, আবার সেই প্রণয়কে বৈচিত্র্য দানের জন্য চলে মান-অভিমানের পালা। রসশাস্ত্রে মানভঞ্জনের ছয়টি পদ্ধতি—সাম, দান, ভেদ, নতি, উপেক্ষা, রসান্তর—থাকলেও বৈষ্ণব সাহিত্যে জয়দেব প্রবর্তিত রীতিই অধিকতর অনুসৃত হয়েছে।

(গ) প্রেমবৈচিত্ত্য

প্রেমবৈচিত্ত্যের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে :

প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্ত্তিস্তং প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে ॥

—প্রেমের উৎকর্ষের ফলে প্রিয়তম সন্নিকটে থাকলেও প্রিয়বিচ্ছেদ আশঙ্কায় যে আর্তি জন্মে, তাকে বলে প্রেমবৈচিত্ত্য। এ অবস্থায় নায়িকার সমস্ত চিত্তবৃত্তি নায়কেই নিহিত থাকে ; এর ফলে গাঢ় তন্ময়তা জন্মে, তাতে নায়ক কৃষ্ণ অতি নিকটে থাকলেও নায়িকা রাধা বুঝতে পারেন না ; কিংবা বুঝতে পারলেও ঐকান্তিক নিবিড়তার বশবর্তী হয়ে বিচ্ছেদ ব্যথায় কাতর হয়ে পড়েন। প্রেমের উৎকর্ষবশতঃই এরূপ ঘটে থাকে। প্রেম-বৈচিত্ত্য কথার অর্থ হচ্ছে প্রেমের বিচিত্ততা, অর্থাৎ চিত্তের অন্যথাভাব। প্রিয় সন্নিকর্ষে থেকেও প্রগাঢ় প্রেমের প্রভাবে বিরহভ্রান্তি প্রেমবৈচিত্ত্যের লক্ষণ। বৈষ্ণবরসসাহিত্যে প্রেম-বৈচিত্ত্যের তাৎপর্য অসীম। এর দ্বারা একদিকে যেমন রাধার প্রেমের অসীমতা সঙ্কেতিত হয়, অন্যদিকে বিরহের বেদনাস্পর্শ বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে লীলাকে ব্যাপ্ত করে তোলে। 'রসকল্পবল্লী'তে প্রেমবৈচিত্ত্যের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

দম্পতীর পরস্পর প্রেমোৎকর্ষ হয়।
অধিকারিতা সেই বিচারি না লয় ॥
অঞ্চলে বান্ধিয়া রত্ন চাহি ফিরে ফিরে।
কোলেতে থাকিয়া হয় বিচ্ছেদ অন্তরে ॥

প্রেমবৈচিত্ত্য নায়িকার নায়কের প্রতি সুগভীর অনুরাগের পরিচায়ক। 'উজ্জ্বলনীল-মণি'তে আছে :

সদানুভূতমপি যঃ কুর্যান্নবনবং প্রিয়ম্।
রাগো ভবন্নবনব সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে ॥

যে রাগ সর্বদা প্রিয়কে নূতন নূতন রূপে অনুভব করায়, তাকে বলে অনুরাগ। অনুরাগ নায়ক-নায়িকার হৃদয়ে অতিগাঢ় প্রীতির বৈচিত্র্যমণ্ডিত রূপ। এই অনুরাগের বশেই কৃষ্ণের রূপ, গুণ, মাধুর্য বারবার আস্বাদন করেও রাধার তৃপ্তি হচ্ছে না ; সর্বদাই একটা অতৃপ্তির সুর রাধার হৃদয়-মন ভরে আছে। 'তৃষ্ণা শান্তি নহে, তৃষ্ণা বাঢ়ে নিরন্তর ॥' প্রিয়কে নিত্য নূতনভাবে অনুভব করায় বলেই তৃপ্তি পাওয়া যায় না, পরিপূরিত হয় না তৃষ্ণা। কৃষ্ণকে পেয়েও মনে হয় পাইনি ; মিলনের লগ্নেও আসে তাই বিরহ ভ্রান্তি :

নাগর-সঙ্গে রঙ্গে যব বিলসই
কুঞ্জে শুতলি ভুজপাশে।
কানু কানু করি রোয়ই সুন্দরি
দারুণ বিরহ হুতাশে ॥

এই ভয়ের পিছনে থাকে অননুভূতপূর্ব মাধুর্যের অনুভূতি। প্রতি মুহূর্তেই নিত্য নূতন রূপে এই মাধুর্য প্রতিভাত হতে থাকে। প্রগাঢ় অনুরাগ থাকে বলে এর মূলে সর্বদাই একটা ভয়—"এই ভয় ওঠে মনে এই ভয় ওঠে। না জানি কানুর প্রেম তিল জনি জোটে।" তাই প্রিয় সান্নিধানে থেকেও প্রিয়ের অন্তর্ধান জনিত বিরহবেদনায় অস্থির হ'য়ে ওঠেন রাধা। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রেমবৈচিত্ত্য গাঢ় অনুরাগের একটি লক্ষণ। অন্য লক্ষণগুলি হচ্ছে, পরস্পর বশীভাব, অপ্রাণীতে জন্মলালসা বিপ্রলম্ভে বিস্ফূর্তি।

(ঘ) প্রবাস

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রবাসের সংজ্ঞা দিয়েছেন নিম্নরূপ ঃ

পূর্বসঙ্গতয়োর্যুনোর্ভবেদ্দেশান্তরাদিভিঃ।
ব্যবধানন্তু যৎ প্রাজ্ঞৈঃ স প্রবাস ইতীর্যতে॥

—পূর্বে মিলিত নায়ক-নায়িকার দেশান্তরে গমনজনিত ব্যবধানকে প্রবাস বলে। প্রাথমিক বিশ্লেষণে প্রবাস—বুদ্ধিপূর্বক ও অ-বুদ্ধিপূর্বক—এই দু'প্রকার। কার্যব্যপদেশে দূরে গমনের ফলে যে প্রবাস, তা বুদ্ধিপূর্বক এবং পরাধীনতার ফলে উদ্ভূত যে সুদূর প্রবাস, তা অ-বুদ্ধিপূর্বক। বুদ্ধিপূর্বক প্রবাস আবার দু'প্রকার—দূর ও নিকট। বৃন্দাবনের গোচারণে গমন জনিত প্রবাস নিকট প্রবাস। দূর প্রবাস তিন প্রকার—ভাবী, ভবন্ ও ভূত।

কৃষ্ণকে মথুরায় নিয়ে যাওয়ার জন্য অক্রুর ব্রজে এলে ব্রজের সকল গোপ-গোপী, বিশেষ করে রাধা, সেই সংবাদ শুনে বিচ্ছেদ ভাবনায় অস্থির হ'য়ে পড়েন। কৃষ্ণ বিরহ সম্ভাবনায় যে বিরহ কল্পনা, তাই ভাবী বিরহ। ভাবী বিরহের লক্ষণ প্রসঙ্গে 'রসকল্পবল্লী' গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

নায়ক বিদেশে যাবে শুনিয়া সুন্দরী।
সহচরী সঙ্গে বিলাপ নানাবিধ করি॥
দুষ্ট অক্রুর এ দেশে কেনে বা আইল।
কৃষ্ণকে লইয়া যাবে একথা শুনিল॥
কুৎসিত স্বপনে দেখে দক্ষিণ অঙ্গ নাচে।
অনুক্ষণ উচাটন নিরবধি কান্দে॥

পদাবলী সাহিত্যে ভাবী বিরহের দৃষ্টান্ত ঃ

কিয়ে সখি চম্পক— দাম বনায়াসি
করইতে রভস-বিহার।
সো বর নাগর, যাওব মধুপুর,
ব্রজপুর করি আঁধিয়ার॥ (যদুনন্দন)

অক্রুরের রথে চড়ে কৃষ্ণ মথুরা চলেছেন। এই নিদারুণ দৃশ্যে ব্রজকুল বিরহে কাতর হ'য়ে পড়েন। এই হোল ভবন্ বিরহ। ভবন্ বিরহের লক্ষণ—

শ্রীকৃষ্ণ চলিলা রথে দেখি ব্রজনারী।
সহচরী সঙ্গে রাই যায় গড়াগড়ি॥
আলুয়াইল কেশপাশ তাহা নাহি বান্ধে।
লোকাপেক্ষা নাহি করে উচ্চস্বরে কান্দে॥ (রসকল্পবল্লী)

ভাবী বিরহ অপেক্ষা ভবন্ বিরহের বেদনা অনেক বেশী। কৃষ্ণের মথুরাগমন ব্রজকুলের হৃৎপিণ্ড ছেদনের তুল্য। সারা বিশ্বব্যাপ্ত হ'য়ে একী অমঙ্গলের হাহাকার! কানু বিনা জীবন তুষানলে জ্বলতে থাকবে। এই মর্মদাহী বিরহসন্তাপ সহ্যের ক্ষমতা কারো নেই। এখন 'করুণা সাগরে, বিরহ বেয়াধিনী, ডুবায়ল স্বজন চিত।' কৃষ্ণের গমন পথের উপর এদের বিরহ বিলাপ প্রমূর্ত হয়েছে বৈষ্ণবপদে :

খেণে খেণে কান্দি লুঠই রাই রথ আগে
খেণে খেণে হরি মুখ চাহ।
খেণে খেণে মনহি, করত জানি ঐছন,
কানু সঞে জীবন যাহ॥ (রাধামোহন)

কৃষ্ণ মথুরায় চলে গেছেন। আর ফিরে আসেন নি। সমস্ত ব্রজ তাঁর বিরহে ক্ষীয়মাণ। বিরহের এই অবস্থাটি ভূত বিরহের অন্তর্গত। এই ভূত বিরহই মাথুর বিরহ। রাধার বিরহ বেদনা দিক্ দিগন্তর পরিপ্লাবিত করে তুলেছে। তিনি ক্রন্দন করে ওঠেন :

অব মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকুল মাণিক কো হরি নেল॥...

ভূত বিরহের বৈশিষ্ট্য :

কৃষ্ণ গেলা মধুপুরি হেথা গোপীগণ।
না জানয় রাত্রি-দিবা প্রাণ উচাটন॥
কৃষ্ণসঙ্গে যত সুখ সে সব ভাবিয়া।
গুঙ্গায় সকল দিন রোদন করিয়া॥

প্রবাস জনিত বিরহের দশটি উল্লিখিত হয়েছে : চিন্তা, জাগর্যা, উদ্বেগ, তানব, মালিন্য, প্রলাপ, উন্মত্ততা, ব্যাধি, মোহ ও মৃত্যু।

সম্ভোগ

সম্ভোগের সংজ্ঞা :

দর্শনালিঙ্গনাদীনামানুকূল্যান্নিষেবয়া।
যুনোরুল্লাসমারোহন্ ভাবঃ সম্ভোগ ঈর্যতে॥

—"নায়ক ও নায়িকার (পরস্পর বিষয় ও আশ্রয়ের) দর্শন, আলিঙ্গন, সম্ভাষণ ও স্পর্শাদির যে পরস্পর সুখতাৎপর্যমূলক নিষেবণ, তাহাদ্বারা উল্লাসপ্রাপ্ত ভাবই পণ্ডিতগণ

কর্তৃক সম্ভোগ বলিয়া কথিত হয়।" মুখ্য ও গৌণ ভেদে সম্ভোগ আবার দু'প্রকার। মুখ্য সম্ভোগ জাগ্রত অবস্থায় সম্ভোগ, গৌণ সম্ভোগ হচ্ছে স্বপ্ন সম্ভোগ।

মুখ্য সম্ভোগকে আবার চারভাগে ভাগ করা হয়েছে— সংক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ, সম্পন্ন, সমৃদ্ধিমান। সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ হচ্ছে লজ্জা, সম্ভ্রমহেতু যে সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ। যে সম্ভোগে নায়িকা সম্পূর্ণ ধরা দেয় না, তাহা সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ। মানের পরে এ সম্ভোগ হয়। অদূর প্রবাসের পরে হয় সম্পন্ন এবং সুদূর প্রবাসের পরে হয় সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ।

গৌণ সম্ভোগকে প্রথমে দু'ভাগ করা হয়েছে—সামান্য ও বিশেষ। মুখ্য সম্ভোগের মত গৌণ সম্ভোগও—সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, সম্পন্ন, সমৃদ্ধিমান্—এই চারপ্রকার। এ বিষয়ে আগেই বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

পদাবলীর রস-পর্যায়

বৈষ্ণব পদাবলী বৈষ্ণব তত্ত্বের রস-ভাষ্য, রস-প্রকাশ। সর্ব-চিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ মদন, শৃঙ্গার-রসরাজময় মূর্তি, আত্মপর্যন্ত-সর্বচিত্তহর গোলকাখ্য শ্রীকৃষ্ণকে নানাভাবে সাধনা করা চলে—'নানা ভক্তে রসামৃত নানা মত হয়।' এর মধ্যে আবার 'কান্তাপ্রেম সর্বসাধ্য সার'। এই কান্তাপ্রেমের বহুধা বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে সাধ্যশিরোমণি রাধার প্রেমের সর্বাতিশায়িতা তুলনারহিত। পদাবলী সাহিত্যে মধুর রসের প্রগাঢ়তা সুনিপুণভাবে চিত্রিত হয়েছে। প্রেমের গাঢ়তা ও গূঢ়তার বিকাশ অনুসারে বৈষ্ণব পদাবলীর কয়েকটি স্তর লক্ষ্য করা যায়— পূর্বরাগ, অনুরাগ ও রূপোল্লাস, অভিসার, মান ও কলহান্তরিতা, প্রেম-বৈচিত্ত্য, আক্ষেপানুরাগ, নিবেদন, মাথুর, ভাবসম্মিলন। কৃষ্ণপ্রেমের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ের ভাব-সত্যকে পদকর্তা ছন্দোবদ্ধ বাণী রূপ দিয়েছেন। এ ছাড়া সখ্য ও বাৎসল্য রসের পদও আছে। তবে মধুর রসের পদাবলীতেই বৈষ্ণবপদকর্তাদের চূড়ান্ত কবিত্ব শক্তির পরিচয় নিহিত। সাধারণভাবে, পদাবলী বলতে মধুর রসের পদাবলীই বুঝায়।

মধুর রসের পদাবলীর রসপর্যায়গত বিভাগের কথা আগেই বলা হয়েছে। এ ছাড়া নায়িকাভেদেও পদাবলী বিভাগ করা যায়—যথা, শ্রীরাধার অষ্ট নায়িকাবস্থার বাঙ্ময় রসরূপ। তবে মধুর রসের পদাবলীর স্তর পরম্পরায় প্রেমের বিকাশের রূপটি দেখা যায়। পূর্বরাগে দর্শন বা শ্রবণে প্রেমের উদ্‌গম, অভিসারে মিলনের আকূতি বশে পরমের উদ্দেশে দূর দুর্গম পথে যাত্রা, সব কিছু দিয়েও পরিপূর্ণভাবে তাঁকে না পাওয়ার জন্য মান ও আক্ষেপ, মাথুরে কৃষ্ণ-বিরহে নিদারুণ বেদনা, পরিশেষে ভাবসম্মিলন পর্যায়ে এসে মানস-মিলনে সে বেদনার পরিসমাপ্তি। এক আত্মা, দুই দেহ পুনরায় মিলিত হলে সব জ্বালা-যন্ত্রণার উপশম হয়—তখন 'কি কহব রে সখি আনন্দ ওর। চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর ॥' সমগ্র বৈষ্ণব পদাবলী মোহনার উদ্দেশে গমনের বহু বিচিত্র রস-প্রকাশ। আর গৌরচন্দ্রিকা তার মুখবন্ধ স্বরূপ।

গৌরচন্দ্রিকা—'পালাবদ্ধ রস-কীর্তনের পূর্বে তার মুখবন্ধ স্বরূপ গৌরাঙ্গবিষয়ক যে পদ গীত হয়, তাকে বলা হয় গৌরচন্দ্রিকা।' এ জাতীয় পদের উৎস ও অবলম্বন শ্রীগৌরাঙ্গদেব ; বর্ণনার বিষয় তাঁর দিব্য জীবনলীলার বিচিত্র ভাবসম্পদ।

ষোড়শ শতাব্দীর বাংলার প্রাণপুরুষ শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর দিব্য জীবনের পাবনী স্পর্শে উদ্ভাসিত করে তুলেছিলেন তমসাচ্ছন্ন জাতির জীবনকে। বহিরঙ্গ দিক থেকে—ধর্মপ্রচারের দ্বারা আচার-সর্বস্ব, খণ্ডছিন্ন জাতিকে এক সূত্রে বিধৃত করা ও শুষ্ক আচার অনুষ্ঠানের শাসন-শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে প্রেমমন্ত্রে দীক্ষিত করার জন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব। শুষ্ক আচার-বিচার নয়, ঐকান্তিক কৃষ্ণপ্রেমই মানবকে সেই সচ্চিদানন্দ রসঘন বিগ্রহের করুণা লাভের পথ প্রদর্শনে সমর্থ—সমগ্র জগৎ মহাপ্রভুর কাছ থেকেই প্রথম একথা শুনল। মহাপ্রভুর ঘোষণা—'কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়। যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই

গুরু হয়॥' কেননা—'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।' শুধু ধর্মের ক্ষেত্রেই নয়, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও মহাপ্রভুর প্রভাবে মরা গাঙে বান ডাকল। মহাপ্রভু কিন্তু নিজে কোন গ্রন্থ রচনা করেন নি; তার প্রয়োজন ছিল না। তাঁর জীবনই ছিল তাঁর বাণী। কিন্তু তাঁর মহিমায় অনুপ্রাণিত হ'য়ে কত শত ভক্ত কবি বাঙ্ময় ভক্তি-পুষ্প উপহার দিয়েছেন সচ্চিদানন্দ রসঘন-বিগ্রহ পরম ব্যক্তিত্বের উদ্দেশে। মহাপ্রভুই তার উৎস, মহাপ্রভুই তার অনুপ্রেরণা।

কিন্তু গোড়ীয় বৈষ্ণবের মতে, মহাপ্রভু আবির্ভূত হয়েছিলেন প্রেমরস আস্বাদনের কারণে। (১) শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা কিরূপ, (২) শ্রীরাধা কর্তৃক আস্বাদিত শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়-মহিমাই-বা কিরূপ, (৩) শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য আস্বাদন করে রাধার সুখই-বা কিরূপ—এই তিন অভীপ্সা পূরণের জন্য রাধাকৃষ্ণের দেহ-ভেদ গত হ'য়ে ঐক্যপ্রাপ্তরূপে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ঃ

এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ।
বিজাতীয় ভাবে নহে তাহা আস্বাদন॥
রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার বিনে।
সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে॥

মহাপ্রভুর জীবন সাধনায় শ্রীরাধার ভাবমাধুর্য প্রকটিত হয়েছে। প্রকটকালের শেষ দ্বাদশ বৎসর রাধাভাবে ভাবিত হ'য়ে তিনি অবিরত প্রলাপ বকতেন ঃ

রাধিকার ভাব মূর্তি প্রভুর অন্তর।
সেই ভাবে সুখ-দুঃখ ওঠে নিরন্তর॥
শেষ লীলায় প্রভুর বিরহ উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ॥
রাধিকার ভাব যৈছে উদ্ধব দর্শনে।
সেইভাবে মত্ত প্রভু রহে রাত্রি দিনে॥
রাত্রে বিলাপ করে স্বরূপের কণ্ঠ ধরি।
আবেশে আপন ভাবে কহেন উঘাড়ি॥

শ্রীচৈতন্য-পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে শ্রীরাধার যে ভাবরূপ ফুটে উঠল, তাতে রাধা ও গৌরাঙ্গ এক হ'য়ে গেলেন। যেমন ঃ

রামানন্দ স্বরূপের সনে।
বসি গোরা ভাবে মনে মনে॥
চমকি কহয়ে আলি আলি।
খেনে খেনে রহিয়া বাঁশীরে দেয় গালি॥
পুন কহে স্বরূপের পাশে।
বাঁশী মোর জাতি কুল নাশে॥

ধ্বনি কানে পশিয়া রহিল।
বধির সমান মোরে কৈল ॥
নরহরি মনে মনে হাসে।
দেখি এই গৌরাঙ্গ বিলাসে ॥

বৈষ্ণব পদাবলী মূলতঃ মধুর রসের সাধনায় রাধার জীবনের কবুণার্তির বাণীময় প্রকাশ; আর চৈতন্যদেবের সমগ্র জীবনই হোল এই অপ্রাকৃত রাধাপ্রেমের ভাব-ব্যাখ্যা—বৈষ্ণব পদাবলীর রস-সাগরে প্রবেশের নিগূঢ় চাবিকাঠি। • "সাধারণ লোকের পক্ষে অপ্রাকৃত রাধা-প্রেম একটি তত্ত্ব-ভাবনা মাত্র; এই তত্ত্ব-ভাবনা সকল বিষয়ীকৃত হইয়াছিল মহাপ্রভুর জীবনে; সাধারণ জীবের পক্ষে তাই মহাপ্রভুর প্রেমের দ্বারা রাধাপ্রেমকে বুঝিয়া লওয়াই প্রকৃষ্ট পন্থা।"

(ডাঃ শশিভূষণ দাসগুপ্ত) •

বাসু ঘোষের একটি পদে এই তত্ত্ব চমৎকার কাব্যরূপ লাভ করেছে:

যদি গৌরাঙ্গ না হোত কি মেনে হইত কেমনে ধরিতাম দে।
রাধার মহিমা প্রেমরস সীমা জগতে জানাত কে ॥
মধুর-বৃন্দা-বিপিন-মাধুরী প্রবেশ-চাতুরী সার।
বরজ যুবতী ভাবের ভকতি শকতি হইত কার ॥

চৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত আছে, নীলাচল বাসের শেষ দ্বাদশ বৎসর মহাপ্রভুর এক প্রকার দিব্যোন্মাদ অবস্থায় কাল কাটত।—

কৃষ্ণের বিয়োগে গোপীর দশ দশা হয়।
সেই দশ দশা হয় প্রভুর উদয় ॥
এই দশ দশায় প্রভু ব্যাকুল রাত্রি দিনে।
কভু কোন দশা উঠে স্থির নহে মনে ॥

মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের মধ্যে অন্যতম, মুকুন্দ, মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ অবস্থা দেখা দিলে 'ভাবের সদৃশ পদ' গান করতেন:

প্রভুর অন্তর মুকুন্দ জানে ভাল মতে।
ভাবের সদৃশ পদ লাগিল গাহিতে ॥

এখানে ভাবের সদৃশ বলতে বোঝায়—চৈতন্যদেব প্রেমধারার যে বিশিষ্ট ভঙ্গীটির দ্বারা আবিষ্ট হ'তেন, তার অনুরূপ রাধাভাবের পদ। এ পদ কিন্তু গৌরচন্দ্রিকা নয়। গৌরচন্দ্রিকা হচ্ছে— রাধাভাবানুগ গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ ৮। লীলাকীর্তনের পূর্বে গৌরচন্দ্রিকা গীত হ'য়ে থাকে। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, শ্রীরাধার যে ভাবটিকে আশ্রয় করে রস-পর্যায়টি ছন্দোবদ্ধ বাণীরূপ লাভ করেছে, চৈতন্যদেবের জীবনে ঠিক সেই ভাবের বিলাস যে পদে রসরূপ লাভ করে সেগুলিই গৌরচন্দ্রিকা। একেই বলা হয় —'তদুচিত গৌরচন্দ্রিকা' কিংবা 'তদ্‌ভাবানুগ গৌরচন্দ্রিকা'। • অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তী বলেছেন—

'গৌরলীলা বৃন্দাবনলীলার ভাব প্রতিরূপ। এই গৌরলীলার প্রতিটি স্পন্দন ছন্দোবন্ধনে বাঁধা পড়িয়াছে গৌর পদাবলীতে। এই সকল পদের নাম "গৌরচন্দ্রিকা"। গৌর-চন্দ্রিকার সংজ্ঞা সুতরাং নিম্নরূপ হ'তে পারে—পালাবদ্ধ রস কীর্তনের আগে তদ্‌ভাবানুগ গৌরাঙ্গবিষয়ক যে পদ গীত হয় তাকে বলা যায় গৌরচন্দ্রিকা।)

(গৌরাঙ্গবিষয়ক অন্যান্য পদকে গৌরাঙ্গচন্দ্রিকা বলা যাবে না। সেগুলিকে গৌরলীলাপদ নামে অভিহিত করা যেতে পারে। এতে গৌরাঙ্গ আছে, চন্দ্রিকাও আছে, কিন্তু গৌরচন্দ্রিকা অনুপস্থিত। গৌরচন্দ্রিকাও অবশ্য গৌরলীলাপদ। কিন্তু বিশেষ ধরনের।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবভক্তের বিশ্বাস—'আমার গোরা ভাবের রাধারাণী।' তদনুযায়ী রাধাভাবে ভাবিত চৈতন্যদেবের বিচিত্রভাব অবলম্বনে রচিত গৌরচন্দ্রিকার সঙ্গে সাধারণত আমরা পরিচিত থাকলেও কৃষ্ণভাব অবলম্বনে রচিত গৌরলীলা তথা গৌরচন্দ্রিকার পদ-ও দেখা যায়। যেমন—বাসু ঘোষের 'হেদে রে নদীয়াবাসী কার মুখ চাও। বাহু পসারিয়া গোরাচাঁদেরে ফিরাও॥' পদটিতে সন্ন্যাসগ্রহণ কালে চৈতন্যদেবের নদীয়া ত্যাগের এই চিত্রটি কৃষ্ণের ব্রজমণ্ডল ত্যাগ করে মথুরাগমনমূলক পদাবলীর গৌরচন্দ্রিকারূপে এঁকেছেন ভক্ত কবি।

পালাকীর্তনের আগে গৌরচন্দ্রিকা পদ গীত হওয়ার সার্থকতা নানা প্রকার। ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত লিখেছেন—"বৃন্দাবনের বিপিনে যে লীলা মাধুর্যের বিস্তার ঘটিয়াছে তাহার ভিতরে প্রবেশ-চাতুরি-সার হইল এই গৌরাঙ্গ প্রেম। এইজন্য রাধাপ্রেম কীর্তন করিবার পূর্বে ভক্তচিত্তে নিগূঢ় তত্ত্বভাবনা জাগ্রত করিবার জন্য এই গৌরচন্দ্রিকা কীর্তন করিয়া লইতে হয়।"

তাছাড়া বহিরঙ্গ কারণ; কীর্তন গানের আগে গৌরচন্দ্রিকা গানের দ্বারা রসজ্ঞ শ্রোতা বুঝে নিতে পারেন যে, কোন্ রসের পদ তখন গীত হবে। এদিক থেকেও গৌরচন্দ্রিকার সার্থকতা।

তৃতীয়ত, বৈষ্ণব কবিতা রাধাকৃষ্ণের মিলন বিরহের মধুর আবেশের ছন্দোবদ্ধ বাণীরূপের প্রতিফলন মাত্র। সাধারণ পাঠক বা শ্রোতা পদাবলীকে স্থূল কামকেলি বলে মনে করতে পারেন। কিন্তু ভক্ত কবি নিজেদের জীবন সরোবরে বিকশিত পদ্ম কান্তপ্রেমকে, রাধাকান্তপ্রেমে পরিণত করেছেন। ব্যক্তিক ভোগ-বাসনা প্রকাশের সুযোগ বৈষ্ণব পদে নেই। এঁরা ছিলেন লীলাশুক। শুকের মতই দূর থেকে রাধাকৃষ্ণলীলা দর্শন করে তাঁরা তাকে বাঙ্ময়রূপ দিয়েছেন মাত্র। আর কাম ও প্রেমের স্পষ্ট গণ্ডীও তাঁদের জানা ছিল। কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায়ঃ

কাম আর প্রেমের দুই স্বরূপ লক্ষণ।
লোহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

সুতরাং স্পষ্টতই বলা চলে যে, তত্ত্ব-জ্ঞানহীন লোকের পক্ষে বৈষ্ণব কবিতা অনেক ক্ষেত্রে অশ্লীল বলে মনে হ'লেও মহাপ্রভুর আস্বাদিত ও অনুপ্রেরণায় রচিত বৈষ্ণব পদাবলী কখনই প্রাকৃত কামকলার পরিপোষক হ'তে পারে না। কেননা ঃ

রসাভাস হয় যদি সিদ্ধান্ত বিরোধ।
সহিতে না পারে প্রভু মনে হয় ক্রোধ॥

পদাবলী কীর্তনের পূর্বে গৌরচন্দ্রিকা কীর্তনের ফলে মহাপ্রভুর দিব্যজীবনবিভার স্মরণে গায়ক ও শ্রোতার মন পরিশীলিত হয়। একটি আধ্যাত্মিক ভাবব্যঞ্জনা সমগ্র পরিমণ্ডলকে অপরূপায়িত করে তোলে। শ্রীচৈতন্যদেবের কথা এভাবে স্মরণ করলে চিত্তদর্পণ মার্জিত হয় ; ফলে পদাবলীর গূঢ় তাৎপর্যটি শ্রোতার চিত্তে সহজে সঞ্চারিত হয়। সুতরাং আধ্যাত্মিক ভাবব্যঞ্জনা নিরূপণের জন্যও গৌরচন্দ্রিকার অবদান অসামান্য।

এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র লিখেছেন, "মহাপ্রভু কৃষ্ণলীলার চমৎকারিত্ব যেরূপ ভাবে আস্বাদন করিয়াছিলেন, এমন আর কেহ করেন নাই। বস্তুত, সেই নিখিল-রস-মাধুরী-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নিজ রসমাধুর্য নিজেই আস্বাদন করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারই অনুগত হইয়া রসাস্বাদন করিবার যে প্রতিজ্ঞা গায়ক ও ভক্তগণ করেন, তাহা তত্ত্বের দিক দিয়া সর্বথাযোগ্য বলিয়া মনে হয়।" রায় রামানন্দের ভাষায়, গৌরচন্দ্রিকা রসকীর্তনে পরমান্নে কর্পূরবিন্দুস্বরূপ।

তাছাড়া, প্রাণে যিনি সাড়া জাগিয়েছেন, যাঁর পূতস্পর্শে ভাবের মরাগাঙ্গে বান ডেকেছে, কমলা-শিব-বিধির দুর্লভ প্রেমধন যিনি করুণাভরে জগজ্জনকে দান করেছেন, সেই মহাজীবনকে স্মরণ করা জাতির কর্তব্য। বৈষ্ণবপদাবলী কীর্তনের পূর্বে গায়ক জাতির মুখপাত্রস্বরূপ সেই কৃত্য সমাপন করে থাকেন। গৌরচন্দ্রিকার প্রত্যেকটি পদেই চৈতন্যদেবের ভাবজীবনের চিত্র প্রতিফলিত। এগুলি পদাবলী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

বাল্যলীলা

বাৎসল্য রসের পদ বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রচুর নয়। প্রাক্-চৈতন্য যুগে এ জাতীয় পদ প্রায় ছিলই না। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে সখ্যপ্রেম ও বাৎসল্য প্রেম যখন উত্তম বলে পরিগণিত হোল, তখন এ জাতীয় পদ রচনায় মহাজন কবিদের আগ্রহ দেখা দিল। বৈষ্ণব মতে, 'কান্তাপ্রেম সর্বসাধ্যসার' হলেও বাৎসল্যপ্রেম অবহেলিত নয়। 'আমারে ত যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে। তারে সেই ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে॥'—কৃষ্ণের উক্তি। ভগবান আরো বলেছেন ঃ

মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধভক্তি॥
আপনাকে বড় মানে আমারে সমহীন।
সর্বভাবে হই আমি তাহার অধীন॥

মাতা মোরে পুত্র ভাবে করেন বন্ধন।
অতি হীন জ্ঞানে করে লালন পালন ॥
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন বড়লোক তুমি আমি সম ॥ (চৈ. চ. ১।৪)

কৃষ্ণের বাল্যলীলাবিষয়ক পদে সখ্য ও বাৎসল্য এই দু'জাতীয় পদ পাওয়া যায়। তত্ত্বের দিক থেকে, এতে ঐশ্বর্যের কোন জ্ঞান থাকে না। সখ্যে থাকে সমত্ববোধ ; বাৎসল্যে মমত্ববুদ্ধির আধিক্য বশত কৃষ্ণকে হেয়জ্ঞান। কৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান—এ অনুভবও শ্রীদাম-সুদাম, কিম্বা নন্দ-যশোদার মনে অণুমাত্র জাগে না।

সন্তানকে ঘিরে মাতৃহৃদয়ের স্বতোৎসারিত স্নেহধারা বাল্যলীলার পদে অভিসিঞ্চিত হয়েছে। শিশুর প্রতিটি আচরণ—তার হাসি, চাপল্য, ভাবভঙ্গী – সব কিছু মায়ের মনে আনন্দের তুফান তোলে। সন্তানের মধ্যেই মা অনুভব করেন সমস্ত জগৎকে।

দেখসিয়া রামের মাগো গোপাল নাচিছে তুড়ি দিয়া।
কোথা গেল নন্দ রায় আনন্দ বহিয়া যায়
নয়ান ভরিয়া দেখসিয়া ॥

কখনো গোপাল মায়ের কোলে বসে পা নাচায়, ফলে নূপুরের শব্দ হয়। হাসিমুখের অমৃত সিঞ্চিত আধ আধ বাণী মায়ের প্রাণ জুড়িয়ে দেয়। মনে হয়—'ধরণী আনন্দিত অঙ্গ বিরাজিত, সুন্দর বাল গোপাল।'

একবার গোপাল আবদার ধরেছে, মায়ের কোলে উঠবে। কিন্তু মায়ের কাখে কলসী, সেটি না নামিয়ে সন্তানকে কোলে নেবেন কি করে। অতএব, নানা কথায় তাকে নিরস্ত করতে হয়—

মরি বাছা ছাড় রে বসন।
কলসী উলায়্যা তোমারে লইব এখন ॥
মরি তোমার বালাই লয়্যা, আগে আগে চল ধায়্যা,
ঘাঘর নূপুর কেমন বাজে শুনি।
রাঙ্গা লাঠি দিব হাতে, খেলাইও শ্রীদামের সাথে,
ঘরে গেলে দিব ক্ষীর-ননী ॥ (নরসিংহ দাস)

মায়ের এই সামান্য অনুযোগে গোপালের অভিমান হয়। বংশীবদনের একটি পদে এই চিত্র : যাদুমণি রাণীর আগে আগে চলেছে, মায়ের ডাকে অভিমান ভরে ফিরেও তাকাচ্ছে না। চোখে তার জল। মা উতলা হয়ে পড়েন। 'না জানি কেমন বিধি লাগিল আমারে।' কিন্তু যাদুমণির জন্য শুধু চোখের জলই ফেলেন না মা যশোদা। সন্তান অন্যায় করলে তিনি তাকে শাসন করতেও দ্বিধাবোধ করেন না। সেখানেও থাকে সন্তানের মঙ্গল চিন্তা—

হেদে গো রামের মা ননীচোরা গেল এই পথে।
নন্দ মন্দ বলু মোরে, লাগালি পাইলে তারে,
সাজাই করিব ভাল মতে ॥

শূন্য ঘরখানি পায়্যা, সকল নবনী খায়্যা,
দ্বারে মুছিয়াছে হাতখানি।
আঙ্গুলির চিনাগুলি, বেকত হইবে বলি,
ঢালিয়া দিয়াছে তাহে পানী ॥...
যে মোরে দিলেক তাপ, সে মোর হয়্যাছে বাপ,
পরাণে মারিব ননীচোরা ॥...(যদুনাথ দাস)

বাল্যলীলার গোষ্ঠবিষয়ক পদে বাৎসল্য ও সখ্য—দুই রসের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বলাই ও সখাদের সঙ্গে কানাই যখন গোঠে যায়, তখন পিছনে তাকিয়ে যশোদার স্নেহবিহ্বল দুটি উৎকণ্ঠ নয়ন। কানুকে তিলেকের অদর্শনে নানা অমঙ্গল চিন্তায় মাতৃহৃদয় হাহাকার করে ওঠে। মাতা বার বার তাকে সাবধান হ'য়ে চলতে উপদেশ দেন—যাতে কোন অমঙ্গল তাকে স্পর্শ না করে।

আমার শপতি লাগে না ধাইও ধেনুর আগে
পরাণের পরাণ নীলমণি।
নিকটে রাখিও ধেনু পুরিহ মোহন বেনু
ঘরে বসি আমি যেন শুনি ॥
বলাই ধাইবে আগে আর শিশু বাম ভাগে
শ্রীদাম সুদাম সব পাছে।
তুমি তার মাঝে ধাইও সঙ্গ ছাড়া না হইও
মাঠে বড় রিপু ভয় আছে ॥ (যাদবেন্দ্র দাস)

গোঠে যাওয়ার সময় মাকে প্রণাম করে কানু অন্য শিশুদের সঙ্গে গোঠের পানে চলল। কানুর যে দণ্ডে দণ্ডে ক্ষিধে পায়, একথা মা ভোলেন নি। তাই তিনি ক্ষীর-নবনী উপযুক্ত পরিমাণে তাঁর সঙ্গে দিয়েছিলেন। দলবদ্ধ সেই গমন দৃশ্যটি অতি মনোরম—

প্রণতি করিয়া মায় চলিলা যাদব রায়
আগে পাছে ধায় শিশুগণ।
ঘন বাজে শিঙ্গা-বেণু গগনে গো-খুর-রেণু
শুনি সবার হরষিত মন ॥
আগে আগে বৎসপাল পাছে ধায় ব্রজ-বাল
হৈ হৈ শবদ ঘনরোল।
মধ্যে নাচি যায় শ্যাম দক্ষিণে সে বলরাম
ব্রজবাসী হেরিয়া বিভোর ॥ (মাধব দাস)

গোষ্ঠলীলায় সখ্যরসেরও চরম উৎকর্ষের চিত্র পাওয়া গেছে। খেলায় পরাজিত কানাই সখা সুবলকে কাঁধে চড়িয়েছে—সখ্যপ্রীতির কি অদ্ভুত মহিমা!

আজু কানাই হারিল দেখ বিনোদ খেলায়।
সুবলে করিয়া কান্ধে বসন আঁটিয়া বান্ধে
বংশীবটের তলে লইয়া যায় ॥ (বলরাম দাস)

'বাল্যলীলা'র পদের রসমূল্য তত না হলেও তা মাতৃহৃদয়ের ঐকান্তিক নিবিড়তা, স্নেহের উৎসারণ, সখ্যের সহজ প্রীতি ও সারল্যের অকৃত্রিম ভাবসম্পদে অমূল্য।

আক্ষেপানুরাগ

আক্ষেপানুরাগের মূলেও থাকে কৃষ্ণের প্রতি রাধিকার অনুরাগ। পূর্বরাগে প্রেমের সূচনা, অনুরাগে প্রেমের শিকড় অতি গভীরে চলে যায়। আক্ষেপানুরাগে শ্রীরাধা 'অনুরাগের আধিক্যে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া অনুপস্থিত প্রিয়কে, নিজেকে ও স্বজনকে ভর্ৎসনা' করেন। সর্বত্রই ধ্বনিত হ'তে থাকে একটি আক্ষেপের সুর। এই আক্ষেপজনিত বেদনা ও নৈরাশ্যই আক্ষেপানুরাগ পদাবলীর উপজীব্য। এক কথায় বলা যায়—নায়ক-নায়িকার মিলনের পরে গাঢ় অনুরক্তিজনিত যে আক্ষেপ, তাকেই বলা যায় আক্ষেপানুরাগ।

'রসকল্পবল্লী'তে বলা হয়েছে :

আক্ষেপানুরাগ উক্ত নানাবিধ হয়ে।
দিগ্‌দরশন লাগি কিঞ্চিৎ কহিয়ে ॥
কৃষ্ণকে আক্ষেপ করে আর মুরলীকে।
দূতীকে আক্ষেপ করে আর যে সখীকে ॥
গুরুজনে আক্ষেপ আর কুলশীল জাতি।
আপনাকে নিন্দে কভু দৈন্য ভাব গতি ॥
কন্দর্পেরে মন্দ বলে করিয়া ভর্ৎসনা।
বিপক্ষাদির ব্যঞ্জিয়া কভু করয়ে বঞ্চনা ॥
বিধাতাকে মন্দ বলে কভু দৈবে দোষে।"

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগ—উভয় রসপর্যায়েই রাধার হৃদয়ের বেদনা নৈরাশ্য ও আক্ষেপের আকারে প্রকাশিত। উভয় পর্যায়েই থাকে অতি গাঢ় ও গূঢ় অনুরাগের দ্যোতনা। তা সত্ত্বেও এ দুয়ের মাঝে ভেদচিহ্ন বর্তমান। প্রেমবৈচিত্ত্য পর্যায়ে কৃষ্ণসান্নিধ্যে অবস্থিতিকালেই রাধার হৃদয়ে বিরহভ্রান্তিজনিত বেদনার প্রকাশ; অপরদিকে আক্ষেপানুরাগে অনুপস্থিত নায়কের উদ্দেশে কিংবা তাঁকে কেন্দ্র করেই চলে রাধার বিলাপ অথবা ভর্ৎসনা। একটা বঞ্চনাবোধজনিত শূন্যতার বেদনা রাধার হৃদয়কে নিরন্তর দহন করতে থাকে। এই বেদনার অভিঘাতেই রাধা বিলাপ করেন :

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল ॥

—যে প্রেম-স্পর্শকে চন্দ্রকিরণের মত শীতল বলে মনে হয়েছিল, এখন দেখা যায় তাতে সূর্যকিরণের জ্বালা। এ জ্বালা প্রেমেরই জ্বালা। রাধা প্রেম করেছেন তাই এ জ্বালা। শ্রীমতি আত্মধিক্কার দিয়ে বলে ওঠেন:

বঁধু, সকলি আমার দোষ।
না জানিয়া যদি, করেছি পীরিতি,
কাহারে করিব রোষ॥......

এখন তাই—'জাতিকুলশীল সকলি মজিল ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি।' কাঁদতে কাঁদতেই রাধার জীবন যাবে। কেননা, এ প্রেম—'শঙ্খ বণিকের করাত যেমন আসিতে যাইতে কাটে।' রাধিকা কৃষ্ণের উদ্দেশে বলেন:

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥
রাতি কৈলুঁ দিবস, দিবস কৈলুঁ রাতি।
বুঝিতে নারিলুঁ বন্ধু তোমার পীরিতি॥

—কেমন করেই বা পারবেন? নিত্য নূতন করে প্রিয়তমের যে মাধুর্য রাধা আস্বাদন করছেন, তার শেষ কোথায়? রাধার দিক থেকে কৃষ্ণকে সর্বস্ব সমর্পণের মধ্যে কোন ত্রুটি নেই। তবুও কৃষ্ণপ্রেম-রহস্যের কূল-কিনারা না পেয়ে তিনি বেদনায় অস্থির। ঘর-সংসার-গৃহজন-পরিজন-মান-লোকলজ্জা—সব কিছু যিনি কৃষ্ণকে পাবার আশায় ত্যাগ করতে পেরেছেন, তাঁর পক্ষে এতদূর উৎকণ্ঠ হওয়াই স্বাভাবিক। কৃষ্ণপ্রেমবঞ্চিতা হ'য়ে এ বিশ্বে শ্রীরাধিকা এখন একা। আপন দুঃখের কথা শোনানোর মত আপনজন তাঁর কেউ নেই। পরম ব্যাকুলতায় রাধা তাই কৃষ্ণের কাছেই কৃষ্ণের ঔদাসিন্যের কথা শোনান:

তোমারে বুঝাই বঁধু তোমারে বুঝাই।
ডাকিয়া শুধায় মোরে হেন জন নাই॥.....
খাইতে সোয়াস্তি নাই নাহি টুটে ভুক।
কে আর ব্যথিত আছে কারে কব দুখ॥ (চণ্ডীদাস)

ক্রন্দন ক'রে মনের ভার শ্রীমতি কিছুটা হালকা করে নেবেন, সে উপায়ও নেই। গুরুজন পরিজনের ভয় তো আছেই, তারপরে আছে দুর্জন স্বামীর পাঁজরবেঁধানো বাক্যবাণ। অন্য রমণী পর্যন্ত রাধাকে দেখে চোখ ঠারাঠারি করে। পাপ ননদিনী বিষের অধিক বিষ। দারুণ শাশুড়ী যেন জলন্ত আগুনের মত। এমত অবস্থায়—

কান্দিতে না পাই বঁধু কান্দিতে না পাই।
নিশ্চয় মরিব তোমার চান্দ মুখ চাই॥
শাশুড়ী ননদীর কথা সহিতে না পারি।
তোমার নিঠুরপণা সোঙরিয়া মরি॥
চোরের রমণী যেন ফুকারিতে নারে।
এমত রহিয়ে পাড়া পড়শীর ডরে। (জ্ঞানদাস)

—রাধার প্রতি কৃষ্ণের উপেক্ষার বেদনা রাধার হৃদয়ে শেলসম বিদ্ধ হয়েছে। তারপর আবার রাধা যখন বুঝলেন যে,—কৃষ্ণ তাঁকে উপেক্ষা করে অন্য নায়িকাতে আসক্ত, তখন রাধা একেবারে ভেঙ্গে পড়েন :

বন্ধুর লাগিয়া সব তেয়াগিনু লোকে অপযশ কয়।
এ ধন আমার লয় আনজনা ইহা কি পরাণে সয়॥
সই কত না রাখিব হিয়া।
আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায় আমারি আঙিনা দিয়া॥

এই অবমাননা ও উপেক্ষার ব্যথা রাধার পক্ষে সহ্যাতীত। তাই নিদারুণ কষ্টেই রাধা অভিশাপ বাণী উচ্চারণ করলেন—'আমার পরাণ যেমতি করিছে তেমতি হউক সে।' সংক্ষিপ্ত, অথচ কত তীব্র এই বাণী অনলংকৃত, অথচ সকল অলংকারকে হারিয়ে দিয়ে পরম বেদনার রাজ্যে মহীয়ান্। এরপর রাধিকার মনে হোল, দোষ তাঁরও নয়, অন্য কারো নয়, সব দোষ অনঙ্গ দেবতার। অনঙ্গ দেবের হাতে নিপীড়িত হচ্ছেন বলেই রাধার এই দুর্দশা। তাই মদনের উদ্দেশে তাঁর উক্তি :

কতহুঁ মদন তনু দহসি হামারি।
হাম নহে শঙ্কর হুঁ বরনারী॥

—মন্মথ দেবতার ধর্মবিচার নেই ; সে নারীর মনের মাঝারে প্রবেশ করে সরম দূরীভূত করে দিয়েছে ; ফলে কালার পীরিতি-শরবিদ্ধ হ'য়ে রাধা যন্ত্রণায় ছটফট করছেন!

শেষ পর্যন্ত শ্রীমতী ঠিক করলেন—কালাকেই তিনি সর্বস্ব সমর্পণ করবেন। 'যোগিনী হইয়া যাব দেশে দেশে যেথায় নিঠুর হরি।' সখিদের প্রবোধবাক্যও তাঁকে এ সঙ্কল্প থেকে বিরত করতে পারল না। শ্রীমতীর প্রেমের প্রবল বেগ যারা উপলব্ধি করতে পারছে না, তারা মূঢ়। তাঁদের কথায় রাধা কোন কান দেবেন না। এখন 'খাইতে শুইতে চিতে, আন নাহি হেরি পথে, বন্ধু বিনে আন নাহি ভয়।' তাই শ্রীমতীর শেষ সঙ্কল্প :

সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।
জীয়ন্তে মরিয়া যে, আপনা খাইয়াছে,
তারে তুমি কি আর বুঝাও॥
পরাণ পুতলি করি, লয়্যাছি মোহন রূপ,
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ।
পীরিতি আগুন জ্বালি, সকলি পোড়াঞাছি,
জাতি-কুল-শীল অভিমান॥
না জানিয়ে মূঢ় লোকে, কি জানি কি বলে মোকে,
না করিয়ে শ্রবণ-গোচরে।
স্রোত বিথার জলে, এ তনু ভাসাঞাছি,
কি করিবে কুলের কুকুরে॥ ('মুরারী গুপ্ত)

—এ কূল হারানো তো গোকুলে উত্তীর্ণ হওয়ার আশায়। এই-ই তো রাধার মনের চরম কথা।

আক্ষেপানুরাগে রাধার মনের বেদনা তাঁর কল্পিত আশঙ্কার ফলেই সৃষ্ট। কেননা, শ্রীকৃষ্ণ এখনও রাধার প্রতি সমভাবে অনুরক্ত। প্রগাঢ় অনুরাগ বশেই শ্রীরাধার হৃদয়ে নানা আশঙ্কার উদয় হচ্ছে। রাধার দুঃখ একান্ত ভাবে রাধার মনেরই সৃষ্টি।

কৃষ্ণ রাধার এই কল্পিত দুঃখের উত্তরে বলেছেন :

সুন্দরি, কাহে করসি তুহু খেদ।
তুয়া বিনে রাতি— দিবস হাম না জানিয়ে
কোন্ কয়ল তুহে ভেদ ॥......
তোহারি নাম গুণ, অবিরত জপি হাম,
সদয় হৃদয় তুয়া চাই ॥ (প্রেমদাস)

নিবেদন

গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন—"সর্বধর্মান্ পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥" সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে সেই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পরম বাঞ্ছিতের পদে শরণাপন্ন হলে তিনিই আমাকে সর্বপ্রকার পাপ থেকে মুক্ত করবেন। বৈষ্ণবদর্শন এ সিদ্ধান্তকে অতিক্রম করে নতুনতর জীবনবাণী শোনাল। কৃষ্ণভক্তিই যেখানে শেষ কথা, সেখানে মোক্ষের কথা আসে কি করে ? বৈষ্ণবের মতে, 'অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কৈতব। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ বাঞ্ছা আদি সব ॥ তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান। যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান ॥' বৈষ্ণব ধর্মে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চ রসের সাধনার মধ্য দিয়ে কৃষ্ণলীলা উপভোগ করাই জীব জগতের চরম ও পরম কর্তব্য। এর মধ্যে মধুর রসের সাধনাই সর্বোৎকৃষ্ট। তার মধ্যে আবার "রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি। যাহার মহিমা সর্বশাস্ত্রেতে বাখানি ॥" তত্ত্ববেত্তাদের মতে—সমস্ত জীব জগৎ ছুটে চলেছে অসীমের পথে—সচ্চিদানন্দ, পরম রসঘন বিগ্রহ, পরম বাঞ্ছিত গোলকের অধিপতি শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে। শ্রীরাধা এই জীবজগতের প্রতীক। অবশ্য পরম বৈষ্ণবের মতে, রাধা কৃষ্ণেরই হ্লাদিনী শক্তি। 'রাধা শক্তি কৃষ্ণ শক্তিমান। দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ ॥" কবিরাজ গোস্বামী আরো বলেছেন :

মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কোন ভেদ ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ ॥

লীলারসের পুষ্টির জন্যেই অদ্বৈত থেকে দ্বৈতের সূচনা। আবার এই দ্বৈত থেকে অদ্বৈতের পথে পরিক্রমণের আলেখ্যই সমগ্র বৈষ্ণব কবিতা। পূর্বরাগ থেকে শুরু হয় দয়িতের উদ্দেশে যাত্রা। অভিসারে গিয়ে আকৃতির চরম অভিব্যক্তি দর্শিত হয়।

নিবেদন পর্যায়ে এসে রাধা সর্বসমর্পণ করে দয়িতের কাছে আশ্রয় কামনা করেন। এই যাচ্ঞার ভিতর আছে সর্বসমর্পণের সুখ, বাঞ্ছিতকে প্রাপ্তির আশ্বাস। রাধা দেখেন—এই

বিশ্বভুবনে তিনি একা। কৃষ্ণকে তিনি হৃদয়-মন-প্রাণ সমর্পণ করেছেন, কিন্তু হারিয়েছেন সমাজ, সংসার, গৃহজন, পরিজন। আজ 'রাধা বলি কেহ শুধাইতে নাই দাঁড়াব কাহার কাছে।' নিঠুর কালা কৃষ্ণের উদ্দেশে রাধা শব্দ করে কাঁদতে পর্যন্ত পারেন না। ফলে—"রন্ধনশালায় যাই তুয়া বঁধু গুণ গাই ধোঁয়ার ছলনা করিয়া কাঁদি।" এত বিঘ্ন বলেই হয়ত কৃষ্ণের জন্য রাধার প্রেম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। 'নিবেদন' পর্যায়ে এসে রাধার বক্তব্য : "সব সমর্পিয়া এক মন হৈয়া নিশ্চয় হইলাম দাসী।" আত্মসমর্পণের দুরন্ত তাগিদে রাধা সমাজ, সংসার, গৃহজন-পরিজন সব ত্যাগ করেছেন, অসহ্য গঞ্জনা সহ্য করেছেন। তবু রাধার দুর্জয় আত্মবিশ্বাস :

কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।
বঁধু, তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ॥

কৃষ্ণ-পিরীতির সুখ-সায়র মাঝে কুলশীল-লাজ-মান সবই ডুবেছে। এর মাঝে শ্রীমতী ভাবছেন কৃষ্ণকে কিছু নিবেদনের কথা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে :

কি দিব কি দিব বন্ধু মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি॥

রাধার শ্রেষ্ঠ ধন হচ্ছেন কৃষ্ণ। কৃষ্ণকেই কৃষ্ণ দান করবেন—এ অতি রহস্যের কথা। কিম্বা বলা যায়—শক্তি ও শক্তিমান যখন তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত হয়, তখন দুইয়ের মধ্যেকার ভেদচিহ্ন একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়। তখন—"ন সো রমণ ন—হাম রমণী। দুহুঁ মন মনোভব পেশল জানি।" নিবেদনের পদে দেখা গেল, কৃষ্ণপদে নিজেকে একেবারে নিবেদন করে দেওয়াতেই রাধার পরম সার্থকতা। অহৈতুকী ভক্তিই এর মূলকথা।

আবার শ্রীভগবানও ভক্তের আবেদনে সাড়া না দিয়ে পারেন না। এক অর্থে ভগবানও ভক্তের অধীন—প্রেম-ভক্তির বন্ধনে আবদ্ধ। "আমারে তো যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে। তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে।" কিন্তু ভগবান সবচেয়ে বেশি আনন্দ পান এই মধুর রসের ভজনায়। 'ঐশ্বর্য শিথিলপ্রেমে নহে মোর প্রীতি।' আর ভক্তকে না হ'লে ভগবানের চলে না। কেননা, একাকী লীলা হয় না। ভক্তের কথা—'আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হোত যে মিছে।' এই প্রেমেরই দুরন্ত আকর্ষণে ভগবান ভক্তের কাছে আসেন, বলেন :

রাই তুমি যে আমার গতি।
তোমারই কারণে রসতত্ত্ব লাগি
গোকুলে আমার স্থিতি॥

ভক্তের কাছে ভগবানের আগমন—ভক্তেরই প্রেম-ভক্তির তীব্রতা সূচিত করে। নিবেদনের পদগুলিতে রাধার সেই গভীরতম হৃদয়ানুভূতির বাঙ্ময় প্রকাশ।

মল্লার

নামহি অক্রূর ক্রূর নাহি যা সম
সো আওল ব্রজমাঝে।
ঘরে ঘরে ঘোষই শ্রবণ অমঙ্গল
কালি কালিন্দু সাজ ॥

অক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছেন। ঘরে ঘরে অমঙ্গল বার্তা ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু শ্রীরাধা তা বিশ্বাস করেন না—শ্যাম তো তাঁর অন্তর-মন্দিরে অনুরাগের তুলিকাশয্যায় নিদ্রিত। কোন্ পথে বঁধু পলায়ন করবে? "ঐ বুক চিরিয়া বাহির করিব গো তবে তো শ্যাম মধুপুরে যাবে ॥" কিন্তু শ্রীমতীর এ আশ্বাস বেশিক্ষণ টিকল না। কর্তব্যের আকর্ষণে শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলে গেলেন অক্রূরের রথে চড়ে। পিছনে পড়ে রইল সাজানো কুঞ্জবন, ব্রজপুর, গোপগোপী; আর রইলেন শ্রীরাধা। অতল হৃদয়বেদনা-বিমথিত নিশিজাগরণের পালা চলল তাঁর এখন থেকে। গোকুল-মাণিক হৃত হয়েছে। ফলে—

শূণ ভেল মন্দির শূণ ভেল নগরী।
শূণ ভেল দশ দিশ শূণ ভেল সগরি ॥

শূন্যতার বেদনায় পরিপ্লাবিত দিক্‌দিগন্তের এক কোণে বিরহিণী রাধিকা। তিনি কৃষ্ণ-প্রেমে বিরহিণী, কৃষ্ণ অন্তর্ধানে বিরহিণী। রাধিকার এই হৃদয়বেদনাই মাথুর পালার উপজীব্য।

বিশ্ব-জগতে রাধিকার আজ কেউ নেই। প্রিয় সমাগমে যৌবন-মধুর দিনগুলি কেটেছে, এখন তার স্মৃতিই শুধু অবলম্বন। কিন্তু 'কৈছনে বঞ্চব ইহ দিন রজনী।' চোখে ঘুম নেই, প্রিয়-সঙ্গসুখ চিহ্নটুকুও চলে গেছে, দুঃখের অমানিশাই আজ তাঁর একমাত্র সঙ্গী। অথচ যে প্রিয় তাকে এমনি অবহেলায় ফেলে চলে গেল, তার সঙ্গে মিলনের জন্য রাধিকা কি না করেছেন। প্রতিকূল ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসেই সেই প্রিয় আজ দূরে। গরবিনীর গরব এমনি করেই বুঝি ভূমিসাৎ হয়। রাধিকা আর্ত ক্রন্দন করেন:

চির চন্দন উরে হার না দেলা।
সো অব নদী-গিরি আঁতর ভেলা ॥
পিয়াক গরবে হাম কাহুক না গণলা।
সো পিয়া বিনা মোহে কে কি না কহলা ॥
আন অনুরাগে পিয়া আন দেশে গেলা।
পিয়া বিনে পাঁজর ঝাঁঝর ভেলা ॥

প্রিয় তাঁকে ভুলতে পারলেও রাধিকা কি করে তাঁকে ভুলবেন? কিন্তু আশা নিয়েই বা কতদিন কাল কাটবে? নব যৌবনবেদনায় উচ্ছলিত দিনগুলি একে একে চলে গেলে প্রিয়সমাগমের মূল্যই বা কি?

অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে।
এ নব যৌবন বিরহে গোঙায়ব
কি করব সো পিয়া লেহে॥

বর্ষণমুখর রাত্রিতে এই বিরহবেদনা আরো উচ্চকিত হয়ে ওঠে। বর্ষণমুখর রাত্রির প্রাকৃতিক দৃশ্য ও বস্তু-নিচয় রাধার হৃদয়বেদনাকে ঘনীভূত করে তুলেছে। বর্ষণমুখর ভরা ভাদ্র, বাজ পড়ছে, তার মধ্যে শূন্য মন্দিরে একা যামিনী জাগরণে শ্রীরাধা। মত্ত দাদুরি, ময়ূর, বজ্র, বর্ষা—এ সবই উদ্দীপন বিভাব হিসাবে কাজ করছে। আর সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠছে রাধার হৃদয়ের শূন্যতার বেদনা :

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥
ঝম্পি ঘন গর- জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘন খর শর হন্তিয়া॥

সম্পূর্ণ উদ্ধৃতিযোগ্য এই পদটিতে রাধার হৃদয়বেদনা বিশ্বব্যাপ্ত হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে প্রকাশ পাচ্ছে ভালবাসা-রূপ ঐশ্বর্যের উচ্চকিত ঘোষণা। কিন্তু ব্যর্থ যৌবনবেদনা বহন করে প্রতীক্ষার কাল যে দীর্ঘ হ'তে দীর্ঘতর হতে থাকে। প্রিয় আর আসে না। দিন যেতে যেতে মাস, মাস যেতে যেতে বছর কাটল, বছরও এক এক ক'রে কেটে গেল। এখন 'ছোড়লু' জীবনক আশা'। অবশেষে সখীর মারফত শ্রীমতী খবর পাঠালেন—

কহিও কানুরে সই কহিও কানুরে।
একবার পিয়া যেন আইসে মধুপুরে॥

সেই সঙ্গে তিনি ব্রজপুরের সব খবরই পাঠাচ্ছেন—এক নিজের খবর ছাড়া। এখানেই রাধার দুঃখ যে কত নিবিড়—তা বোঝা যায়। নিজের কারণে কৃষ্ণকে তিনি আসতে বলছেন না। কারণ রাধা তো তখন এ জগতে থাকবেন না। শুধু—

দুখিনী আছয়ে তার মাএ যশোমতী।
আসিতে যাইতে তার নাহিক শকতি॥
তারে আসি পিয়া যেন দেয় দরশন।

শ্রীরাধার এই মরণের সাধ প্রেমেরই কারণে। কৃষ্ণবিরহে তিনি প্রাণত্যাগে ইচ্ছুক। কিন্তু তাঁর কামনা—

যাঁহা পহুঁ অরুণ চরণে চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণী হইয়ে মঝু গাত॥

যো দরপণে পহুঁ নিজ মুখ চাহ।
মঝু অঙ্গ জ্যোতি হোই তথি মাহ॥
এ সখি বিরহ-মরণ নিরদন্দ।
ঐছনে মিলই যব গোকুলচন্দ॥

মৃত্যুর পর পঞ্চভূতে বিলীন দেহ-সুরভি পাবে কৃষ্ণের সংস্পর্শ। তাতেই সুখ, তাতেই শান্তি।

মাথুর পর্যায়ে কবি-কল্পনার চূড়ান্ত পরিচয়। "মাথুরের বারমাস্যা কবিতাগুলি পদবিন্যাসের মাধুর্যে, ছন্দোবৈচিত্র্যের চাতুর্য্যে, অলঙ্করণের ঐশ্বর্য্যে জগতের বিরহ-সাহিত্যে অপূর্ব দান।" এ প্রসঙ্গে মাথুরের সঙ্গে বিরহের পার্থক্য নির্ণয় করা যেতে পারে। মাথুরও বিরহ-পর্যায়ের। কিন্তু বিশেষ ধরনের বিরহ। কৃষ্ণের মথুরা গমনের পর রাধাহৃদয়ের বেদনার্তির বাঙ্ময় রসরূপ হোল মাথুর পদগুলি। আর পদাবলীর সর্বত্রই তো বিরহের ছড়াছড়ি। বলা যায়, পদাবলী বিরহের গীতি আলেখ্য। পূর্বরাগ থেকে মাথুর পর্যন্ত চলেছে এই বেদনারই অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ। এমন কি মিলন লগ্নেও বিচ্ছেদ আশঙ্কার বেদনা বাণীবহ হয়ে উঠেছে। আর এই বেদনাময় বলেই তো পদাবলী সাহিত্য এত মধুর। "Our sweetest songs are those that tell of saddest thought". আর রাধাবিরহ-ই বৈষ্ণব পদাবলীর প্রাণ-স্বরূপ।

ভাবসম্মিলন

অক্রুরের রথে চড়ে শ্রীকৃষ্ণ কঠোর কর্তব্যের আহ্বানে মথুরায়—মাধুর্যের জগত থেকে ঐশ্বর্যের জগতে চলে গেলেন। যে কৃষ্ণ একদিন পরম প্রেমের আবেশে গোপীদের কথা দিয়েছিলেন যে, 'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি'—সেই নিষ্ঠুর কালিয়া ব্রজভূমি ত্যাগ করে চলে গেলেন। পিছনে পড়ে রইল শোকাচ্ছন্ন ব্রজভূমি, তার তরুলতা-পাতা, আকাশ-বাতাস, কৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন গোপীগণ এবং স্বয়ং শ্রীরাধা। অথচ শ্রীমতী ও গোপীদের তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন—আবার তিনি ফিরে আসবেন। কিন্তু দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়—তিনি এলেন না। মথুরায় সিংহাসনে আসীন কৃষ্ণের ঐশ্বর্য-ঝলমল মুহূর্তে ব্রজের কথা হয়ত মনে পড়ত, হয়ত পড়ত না। এদিকে বিরহের তরুণ তাপে সমস্ত ব্রজবাসী ক্ষীয়মান, মর্মবেদনায় অস্থির। শ্রীরাধার অবস্থা আরো সঙ্গীন। মেঘ দেখে তাঁর মনে হয় কৃষ্ণ; কৃষ্ণভ্রমে তিনি তমালবৃক্ষ আলিঙ্গন করেন। শ্রীরাধার 'দিনে দিনে ক্ষীণ তনু হিমে কমলিনী জনু।' বৈষ্ণব কবিদের কাছে এ বেদনা অসহ্য হয়ে উঠল। বাস্তবে মিলন ঘটানো সম্ভব হোল না—তাই তাঁরা করালেন রাধাকৃষ্ণের মানস-মিলন। এই হচ্ছে ভাবসম্মিলন।

তত্ত্বের দিক থেকে দেখতে গেলেও মাথুরে পদাবলীর শেষ হতে পারে না। কেননা—'রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান। দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ॥' লীলার

জন্য তাঁরা দুই দেহরূপের আশ্রয় নিয়েছিলেন। লীলার শেষে আবার তাঁরা এক হয়ে গেলেন। ভাবসম্মিলন এই অদ্বয়-তত্ত্বের প্রতিপাদন।

এছাড়া, ভারতীয় সাহিত্যে ট্র্যাজেডির স্থান নেই। পরলোকে বিশ্বাস ইত্যাদি কারণে ভারতীয়গণ মনে করেন যে, এ-জীবনে দয়িতের সঙ্গে মিলন না হলেও পরলোকে মিলন হবেই। হিন্দুদর্শনের এই বিশ্বাস ভাবসম্মিলনের তত্ত্বে প্রভাব বিস্তার করেছে বলে মনে হয়।

ভাবসম্মিলনের পদাবলী উপর্যুক্ত তত্ত্বসমূহের রস-প্রকাশ। এখানে নিত্য মিলনের পরমক্ষণে বিরহের ছায়া নেই। "ভাবলোকে বিরহ নাই, সেখানে রাধা-কৃষ্ণের মিলন নিত্যমিলন। কবিরা রসসম্ভোগের জন্য ভাবকে রূপের মাঝারে অঙ্গ দিয়াছিলেন। এই কথাই তাঁহারা বলিয়াছেন অন্যভাবে—অরূপ লীলারস-সম্ভোগের জন্য রাধাকৃষ্ণ এই দুইরূপে প্রকট হইয়াছিলেন, তারপর লীলান্তে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'রূপ আবার ভাবের মাঝারে' ছাড়া পাইল—অসীম সীমার নিবিড় সঙ্গ ত্যাগ করিলে সীমা অসীমের মাঝে হারা হইল। বৃন্দাবনের রূপ লীলাই বিরহ, রূপের ভাবে ফিরিয়া যাওয়াই ভাবসম্মিলন। এই মিলনই নিত্য মিলন। এই মিলনের আনন্দই ভাবসম্মিলনের প্রধান উপজীব্য।"

(পদাবলী সাহিত্য)

ভাবসম্মিলনের পদে তত্ত্ব আছে একথা ঠিক। কিন্তু তত্ত্ব অপেক্ষা কাব্য এখানে অনেক বড়ো। তত্ত্বের কর্পূরখণ্ড কাব্যের পরমান্নকে স্বাদুতর করে তুলেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু শ্রীরাধার অন্তহীন বিরহের সকরুণ বেদনার অবসানে মানস-মিলনের উল্লাস যখন শত কলাপের বহু বিচিত্র পাখা বিস্তার করে, তখন রসজ্ঞের মন আপনা থেকেই এক অনির্বচনীয় মাধুর্যের নন্দন-কানন-সান্নিধ্য-সুরভির নেশায় মেতে ওঠে। রস চমৎকৃতির এটাই তো লক্ষণ।

সকাল থেকেই সব শুভ বলে মনে হচ্ছে। মাধবের আগমন সংবাদ দ্যোতিত হচ্ছে। কুদিন হয়ত শেষ হোল। এখনও অবশ্য দ্বিধা। কেননা স্পষ্ট প্রমাণ তো পাননি শ্রীরাধা। শুধু 'কপাল কহিয়া গেল।' কিসে বুঝলেন?

চিকুর ফুরিছে বসন উড়িছে
পুলক যৌবন ভার।
বাম অঙ্গ আঁখি সঘনে নাচিছে
দুলিছে হিয়ার হার॥
প্রভাত সময় কাক কলকলি
আহার বাঁটিয়া খায়।
পিয়া আসিবার কথা শুধাইতে
উড়িয়া বসিল তায়॥

প্রিয়ার আগমন আভাসে শ্রীমতী এখন ভাবতে বসেছেন—বঁধুয়াকে কি দিয়ে কেমন করে অভ্যর্থনা জানাবেন। স্থির করলেন ঃ

পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে।
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে॥

প্রিয় এলে সব কথা, সব উল্লাস যেন উদ্বেলিত হয়ে উঠল। কিন্তু এত কথা, এত গানে দেহপ্রাণমন ভরে উঠলেও বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না।' বিগত দুঃখের কথা, অধুনাতন উল্লাসের কথা কিছুই তো বলা হোল না। শান্ত অবস্থায়, নিবানন্দ ভাষায় শ্রীমতী বললেন—শুধু গুটিকয়েক কথা ঃ

বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে॥
এতেক সহিল অবলা বলে।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে॥
দুখিনীর দিন দুখেতে গেল।
মথুরা নগরে ছিলে তো ভাল॥

স্বল্পাক্ষর সমন্বিত এই উক্তির মধ্য দিয়ে 'বেদনায় প্রাণ মূর্ছিত, দেহ-মন স্তিমিত' শ্রীরাধার তপোক্লিষ্ট চিত্র ফুটে ওঠে। কিন্তু ধৈর্যের বাঁধ বেশীক্ষণ থাকে না। দীর্ঘদিন পরে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের উল্লাসকে কিছুতেই আর হৃদয়ে নিবদ্ধ রাখা যায় না। বিদ্যাপতির রাধা বিশ্বজগৎকে শোনাতে থাকেন ঃ

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ
পেখলুঁ পিয়ামুখচন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশ দিশ ভেল নিরদন্দা॥

হৃদয়ের গভীরতম স্তর থেকে উত্থিত এই উল্লাসের সমুদ্রে সর্বাঙ্গ ডুবিয়ে সেই মিলনের আনন্দকে রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করতে থাকেন শ্রীমতী। বিধি আজ অনুকূল। তাই আকাশে এক চন্দ্র নয়, লক্ষ চন্দ্র উদিত। পঞ্চবাণ নয়, লক্ষ বাণে বিদ্ধ হ'য়েও এত সুখ! এত আনন্দ!

সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচ বাণ অব লাখ বাণ হোউ
মলয় পবন বহু মন্দা॥

এ উল্লাস ভাবোল্লাস বলেই এত লাখের সমাবেশ। যথার্থ-ই এ সীমাহীন রাজসিক উল্লাস। সুখ বুঝি তাই বিলাস—হৃদয়ের, মনের। এই সুখ-বিলাসের অকুণ্ঠ আতিশয্যেই শ্রীরাধা বলেন ঃ

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলন-মুহূর্তে শ্রীরাধিকা বড়ো বেদনায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন : এ হিয়া হইতে বাহির হইয়া কিরূপে আছিলা তুমি।' আধুনিক সমালোচকের দেওয়া ভাবসম্মিলনের ব্যাখ্যা এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য : "রাধার হিয়ার ভিতর হইতে শ্যামকে বাহির করিল বৈষ্ণব কবিরাই। ইহাতেই তো বৃন্দাবন লীলা। সমগ্র লীলাবিলাস হিয়ার ভিতর হইতে বহিষ্কারিত হৃদয়ের ধনকে ফিরিয়া পাইবার জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর কিছুই নয়। হিয়ার ধনের হিয়ায় ফিরিয়া যাওয়ার নামই ভাবসম্মিলন।" মিলন-মুহূর্তে শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে বলেন :

বঁধু আর কি ছাড়িয়া দিব।
এ বুক চিরিয়া যেখানে পরাণ
সেইখানে লয়ে থোব।

আর এই অদ্বয়তত্ত্বই ভাবসম্মিলনের শেষ কথা।

প্রার্থনা

প্রার্থনা বিষয়ক পদের মধ্য দিয়ে প্রাক্ ও পরচৈতন্য—এই দুই যুগের ভাব-বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত। প্রাক্ চৈতন্যযুগে মুক্তিবাঞ্ছাই ছিল ভক্তের চরম ও পরম কাম্য। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ -এই চতুর্বর্গ ফলপ্রাপ্তির জন্য জীবের উৎকণ্ঠার সীমা থাকত না। কিন্তু প্রাক্-চৈতন্যযুগের কবি বিদ্যাপতির কবিতায় দেখি সৃষ্টির মূল রহস্য সম্পর্কে তিনি সচেতন—

কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগর লহরি সমানা॥

সুতরাং তিলতুলসী দিয়ে তিনি নিজেকে অর্পণ করেছেন মাধবের পায়ে। তিনি যেন তাঁকে একবার দয়া করেন অর্থাৎ এই ভবসিন্ধু থেকে মুক্তি দেন।

ভনয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভব সিন্ধু।
তুয়া পদপল্লব করি অবলম্বন
তিল দেহ এক দীনবন্ধু॥

কিন্তু পরচৈতন্যযুগে জীবের মুক্তিবাঞ্ছা যে কৈতব-প্রধান হ'য়ে গেল, তা আগেই বলা হয়েছে। এ যুগে জীবের পঞ্চম ও চরম পুরুষার্থ হোল প্রেম। মূলতঃ প্রেম সাধনাই ভগবদ্‌সাধনা। 'ভক্তিরস্য ভজনম্'। প্রেমই ভক্তি। এই প্রেমভক্তি সাধনার আবার

প্রকার ভেদ আছে— রাগাত্মিকা ভক্তি, রাগানুগা ভক্তি এবং বৈধি ভক্তি। রাগাত্মিকা ভক্তি স্বতস্ফূর্ত। গোপীদের মধ্যেই তার বিকাশ। তা সাধনার দ্বারা লব্ধ নয়। একমাত্র শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনে রাধাজীবনের রাগাত্মিকা ভক্তি বিকশিত হয়েছিল। জীবের কর্তব্য গোপীদের অনুগত হ'য়ে রাধাকৃষ্ণ সেবা। একেই বলে রাগানুগ ভজন। রাধাকৃষ্ণের লীলাবৈচিত্র্য উপলব্ধি করাই জীবজগতের একমাত্র কাম্য। ভক্ত-সাধকদের এজন্য লীলাশুক বলা হয়। নরোত্তম দাসের পদে এই ভাব সুষ্ঠু প্রকাশ লাভ করেছে :

হরি হরি হেন দিন হইবে আমার।
দুহুঁ অঙ্গ পরশিব দুহুঁ অঙ্গ নিরখিব
সেবন করিব দোঁহাকার॥
ললিতা বিশাখা সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে
মালা গাঁথি দিব নানা ফুলে।
কনক সম্পুট করি কর্পূর তাম্বুল পুরি
যোগাইব অধর যুগলে॥

প্রার্থনার পদে ভক্তহৃদয়ের নিবিড় আকুতি বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। ভুক্তি মুক্তিবাঞ্ছা কিম্বা সেবা-বাসনা—যাই হোক, তার প্রকাশে ভক্ত কবির সৃজন প্রতিভার আশ্চর্য প্রকাশ ঘটেছে ভাবকে ভাষার মাধ্যমে, ছন্দের বন্ধনে সুচারু উপস্থাপনের দ্বারা। তবু এখানেও যে যথার্থ কাব্য হয়ে উঠেছে—পাঠক সহজেই তা অনুভব করতে পারেন। আর রসনিবিড় উপলব্ধির আনন্দ-নিষ্যন্দি মনোময়তাই তো কাব্য আস্বাদনের শেষ কথা।

কবি-পরিচিতি

চণ্ডীদাস

॥ ১ ॥

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চণ্ডীদাস কয়জন, কোথায় কার জন্মভূমি, তাঁরা প্রাক্‌চৈতন্য কি পরচৈতন্য যুগের, ইত্যাদি নিয়ে বিতর্ক ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে। চণ্ডীদাসের নামে প্রাপ্ত বিচিত্র সাহিত্যসম্ভার এবং তাঁর সম্পর্কে প্রচলিত জনশ্রুতি ভাবিকদের কল্পনার বল্গাকে মুক্তি দিয়েছে। কিন্তু এ ধরনের বিতর্ককে আমরা পাশ কাটিয়ে যেতে চাই। আমাদের আলোচ্য—চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত রসসমৃদ্ধ পদগুলি।

॥ ২ ॥

কিন্তু তাতেও সমস্যার অন্ত নেই। চণ্ডীদাসের পদাবলীর কাব্যমূল্য বিচারে অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের নিরাশ হ'তে হয়, আবার অনেক ক্ষেত্রেই অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তির পরম আনন্দে মন উল্লসিত হয়ে ওঠে। এর কারণ : চণ্ডীদাস যে কবি ছিলেন, তার চেয়েও বড় কথা—তিনি সাধক ছিলেন। আপন পরিবেশ সম্পর্কে উদাসীন, আত্মবিস্মৃত, ভাবমগ্ন, সাধক কবি আপন একতারায় তান দিয়ে যে সুর সাধনা করেছেন, তা একান্তভাবে পরম দেবতার পদপ্রান্তে ভক্তি-উপচার। বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত, পরিবেশের প্রতি উদাসীন হয়ে চণ্ডীদাস যে পদ রচনা করেছেন, সে যেন আপন মনে উচ্চারিত অনলংকৃত অথচ ভাবসমৃদ্ধ বাণী। ভাবের অতি গভীরতম স্তরে অতি সহজেই তাঁর গতায়াত; কিন্তু বক্তব্য বিষয়কে শিল্প সুষমায় মণ্ডিত করার প্রতি তাঁর সমান অনাগ্রহ। তিনি যত বড় দ্রষ্টা ছিলেন, তত বড় স্রষ্টা ছিলেন না—চণ্ডীদাস সম্পর্কে বিদগ্ধ সমালোচকের এ মনোভাব অতি সত্য। কোন গুরু-গম্ভীর তত্ত্ব ও তথ্যের সমারোহ নয়, হৃদয়ের অতি গভীরতম স্তর থেকে উত্থিত বাণীর অনাড়ম্বর প্রকাশেই চণ্ডীদাসের কৃতিত্ব। এ বাণীও তাঁর সচেতন মনের প্রকাশ নয়, ভাববিহ্বল কবির আসংজ্ঞান মনের উপচে পড়া তরঙ্গ-বিক্ষেপ মাত্র। যেটুকু কূল ছাপিয়ে পড়ল, রস-অনুসন্ধিৎসুকে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। তবে নিপুণ রসিক বিন্দুতে সিন্ধু-দর্শনের ন্যায় সেই সামান্য উপকরণ থেকে মূলের ধারণাটি করে নিতে পারবেন। বুঝবেন—চণ্ডীদাস সিন্ধুকে বিন্দুর মধ্যে ধরে দেওয়ার জন্য মহাকবি, চণ্ডীদাস বলার চেয়ে না বলার মহাকবি। এ বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠত্ব, চণ্ডীদাসের সীমাবদ্ধতা—দুই-ই।

চণ্ডীদাস সম্পর্কে আরো বলার আছে। পালাবদ্ধ রসকীর্তনের জন্য চণ্ডীদাসের পদ সংকলন করতে গিয়ে গায়ককে বিলক্ষণ অসুবিধায় পড়তে হয়। কারণ চণ্ডীদাসের কোন পদই সুস্পষ্ট ভাবে কোন রসপর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। চণ্ডীদাসের রাধা

পূর্বরাগের সুরেই—'বিরতি আহারে রাঙ্গাবাস পরে যেমতি যোগিনীপারা', মিলনের পরম লগ্নেও অতি সংযত স্বরে দুঃখের কথা কয়ে ওঠে—'দুখিনীর দিন দুখেতে গেল। মথুরা নগরে ছিলে তো ভাল।' পূর্বরাগের পর্যায়েই আত্ম-নিবেদনের সুর, কিংবা বিরহের স্তরেও বিরহোত্তীর্ণ অনুভূতি—চণ্ডীদাসের পদে এর বহু দৃষ্টান্ত সহজেই মেলে। এর মূলেও ছিল চণ্ডীদাসের বিশিষ্ট কাব্য ভাবনাটি। চণ্ডীদাসের কবিমনের 'বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে ভিতর দুয়ার খোলা।' সুতরাং বাইরের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ কবিচিত্তকে আকৃষ্ট করবে কি করে? রূপসাগরে ডুব দিয়ে কবি অরূপরতন আশা করেন না। গহন মনের সংগোপন থেকে আত্মবিহ্বল কবি অন্যমনস্কভাবে তুলে আনেন অনুভূতির হীরকখণ্ডটি। অবিন্যস্ত, অপরিশীলিত সে হীরকখণ্ডটি বিদগ্ধ সমাজের অনুপযোগী বলে মনে হলেও তার বহুমূল্যতা অস্বীকার করবে কে? তাই বলি, চণ্ডীদাস সহজতম ভাষার কবি, প্রাণের গভীরতম স্তর থেকে যে জীবনবাণী উদ্ধার করেন তিনি, তাতে উপরিভাগের বর্ণাঢ্য বৈচিত্র্য ও রূপ-রসের স্পর্শ না থাক, শাশ্বত প্রেম-সত্যের গভীরতম পরিচয়টি নিহিত আছে।

চণ্ডীদাসের কাব্য গহনে প্রবেশ করলে পাঠকদের তাই আপাতদৃষ্টিতে স্বাদহীন, বৈচিত্র্য-হীন লাগে। অবশ্য যেসব পাঠক নিত্যনূতন বৈচিত্র্যের অভিলাষী, আমি তাদের কথা বলছি। বৈদগ্ধ্যের আতশবাজি, অর্থদীপ্তির চোখ-ঝলসানো সমারোহ নাইবা থাক্ চণ্ডী-দাসের পদে, তথাপি মহত্তম আবেগের সহজতম প্রকাশে চণ্ডীদাস অনন্য। কঠিনতম ভাবটিকে সহজভাবে বলতে পারার কৃতিত্ব যদি প্রতিভার পরিচয় হয়, চণ্ডীদাস সেই সহজের কবি, সহজিয়া কবি; ধর্মে তিনি যাই হোন না কেন। সহজের সাধনায় চণ্ডীদাসের যে আত্মবিলোপ, তার মধ্যেই চণ্ডীদাসের বিশিষ্ট কাব্যভাবনা ও তার পরিচয়টি পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে। চণ্ডীদাস অনেক ক্ষেত্রেই রাধার হৃদয়ের সঙ্গে আপন হৃদয়কে এক করে ফেলেছেন। রাধার হৃদয়বেদনা অনেক ক্ষেত্রে কবিরই হৃদয়বেদনা। কবি-আত্মার নিষ্কাষিত বেদনার মাধুর্যে যেন গড়া হয়েছে বিষণ্ণ-মলিন রাধার সৌন্দর্য-প্রতিমা। ফলত—চণ্ডীদাসের অনেক পদ আত্মভাবনালীন গীতিকবিতার লক্ষণাক্রান্ত। বৈষ্ণবদর্শনের দিক থেকে বিচারে চণ্ডীদাসের এই কবি-বৈশিষ্ট্য হয়তো সমালোচনার বিষয়বস্তু হ'তে পারে, কিন্তু চণ্ডীদাসের মানস-প্রকরণ এর জন্য দায়ী। নিজেকে হারিয়ে ফেলার মধ্যেই চণ্ডী-দাসের সুখ ও আনন্দ। চণ্ডীদাস নিরাসক্ত শিল্পী নন, দূর থেকে লীলাশুকের মত রাধাকৃষ্ণের লীলাবৈচিত্র্য দর্শন করতে করতে কখন যেন নিজেকেই রাধার অঙ্গীকৃত করে নিয়েছেন। আধুনিক সমালোচক অনুমান করেছেন—এমন হওয়া সম্ভব হয়েছিল, কারণ চণ্ডীদাসের নিজের জীবনেও ঠিক অনুরূপ বেদনামুখর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল বলে। চণ্ডীদাসের জীবনে রামী সম্পর্কিত সমস্ত কিংবদন্তী কতদূর সত্য, সে বিষয়ে সন্দেহ জাগা পাঠকমনে স্বাভাবিক। তবুও একথা অনুমান করা সম্ভব যে, চণ্ডীদাসের ব্যক্তি-জীবনে হয়ত কিছু ঘাত-প্রতিঘাত জুটেছিল, যার প্রবল ঢেউ তাঁর কবি-আত্মার রসসাগরে তুফান তুলেছিল। আমাদের মনে হয়, চণ্ডীদাস যে আক্ষেপানুরাগের শ্রেষ্ঠ কবি, তার কারণ, তাঁর কবিমনের ভাবনার বিশেষ গড়ন। বিষাদ ও বেদনার কৃষ্ণপক্ষ মেঘখণ্ড দিয়ে

ওঁর মনের আকাশটি গড়া। তাই সে আকাশে যে চিত্রকল্প ফুটে উঠবে, তাতে বিষণ্ণতার স্পর্শ থাকবেই। বিদ্যাপতির কবিভাবনা নির্বিশেষের পথে। অর্থাৎ বিশেষ অনুভূতিটিকে রঙে, রসে চিত্রকল্পে তিনি ফুটিয়ে তুলতে জানেন। কিন্তু চণ্ডীদাস নৈব নৈব চ। অবশ্য, একেবারে যে কোথাও করেন নি, তা বলা ভুল হোল। 'চলে নীল শাড়ি নিঙারি নিঙারি পরাণ সহিত মোর'—এ ধরনের পংক্তি চণ্ডীদাসে মেলে, কিন্তু কদাচিৎ যেন এ ধরনের পংক্তি আকস্মিক ভাবে ছিটকে এসেছে। নইলে চণ্ডীদাস মনে-প্রাণে আত্মবিস্মৃত কবি। অনুভূতির যে স্তরে তিনি পৌঁছেছেন, সেখানে রূপের বৈচিত্র্য নেই, আছে গভীরতম উপলব্ধির মহত্তম বাণী। গভীরতম সত্যের চরম মর্ম-উপলব্ধিতেই চণ্ডীদাস সার্থক।

এতক্ষণ চণ্ডীদাস সম্পর্কে যে সাধারণ আলোচনা করা হোল, তাতে পাঠক লক্ষ্য করে থাকবেন যে, চণ্ডীদাসের কাব্য-বৈশিষ্ট্যের কোন বৈচিত্র্য আমরা দেখাতে পারি নি, বৈচিত্র্য দেখানো সম্ভব নয় বলেই। চণ্ডীদাসের কাব্যে উপরি ভাগের রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ সমন্বিত বাণী-বৈচিত্র্য নেই, অন্তরতম সত্তার নির্বিশেষ রূপটি নিরাবরণ ভাষায় ধরা দিয়েছে চণ্ডীদাসের কাব্যে। এইটাই চণ্ডীদাসের অকৃত্রিম কাব্য-বৈশিষ্ট্য।

॥ ৩ ॥

পূর্বরাগের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে আলঙ্কারিক বলেন যে, মিলনের পূর্বে নায়ক-নায়িকার দর্শন বা শ্রবণজাত যে রতি রাগ-রূপে মনে উন্মীলিত হয়, তাকে বলে পূর্বরাগ। অর্থাৎ পূর্বরাগ—প্রেমপুষ্পের প্রথম মুকুল বিকশিত হওয়া। কিন্তু চণ্ডীদাসের রচিত পূর্বরাগের পদে, বিশেষ করে রাধিকার পূর্বরাগের পদে, এ ধরনের মাপকাঠি অচল। রাধা প্রথমেই ঘোষণা করছেন :

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥

প্রথম শ্রবণেই মরমে ঘা দেয়, প্রাণ আকুল করে তোলে,—এ ঠিক সাধারণ স্তরের পূর্বরাগ নয়। মহাভাবময়ী শ্রীরাধার পূর্বরাগের আকুলতা প্রকাশিত এতে। তারপর 'জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো'—এ উক্তি অনুরাগের সূচনা মাত্র, একথা বলা যায় না। এ যেন 'আমরা দুজন ভাসিয়া এসেছি যুগল প্রেমের স্রোতে, অনাদিকালের হৃদয় উৎস হ'তে।' সেখানে ব্যক্তিপুরুষটি নয়, তার নামটিই রতিবোধের গভীরতম স্তরে নাড়া দিতে সমর্থ। হৃদয়ের এই আলোড়নের ফলেই রাধা 'পুলকে আকুল দিক নেহারিতে সব শ্যামময় দেখি।' আপন মনের অনুরাগেই বিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে শ্যামের অস্তিত্ব অনুভব করেছেন রাধা। কবিতাটির আধ্যাত্মিক তাৎপর্য প্রসঙ্গে গ্রন্থের সমালোচকের উক্তি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় : "এই কবিতাটিতে প্রথমতঃ, নাম শোনার প্রসঙ্গ। সামান্য নায়ক-নায়িকার নাম শুনিয়া প্রেম উৎপন্ন হয় না। দ্বিতীয়তঃ, নামের মাধুর্য—ইহাও ভগবৎ

প্রেমের লক্ষণ। তৃতীয়তঃ, নাম-জপ (মন্ত্রস্য সুলঘুচ্চারো জপঃ)—ইহাও ভগবৎ প্রেম ভিন্ন অন্য কিছু বুঝায় না।"

কৃষ্ণপ্রেমে রাইয়ের তনুমন এখন বিকল, বিবশ। জলদবরণ কানুর দুই নয়নের কটাক্ষবাণ যেন মদন-শরের মত রাধার প্রতি নিক্ষিপ্ত হচ্ছে, তা—'পশিয়া মরমে ঘুচায়া ধরমে পরাণ সহিত টানে॥' আর তার ফলে রাধা দিশাহারা—লজ্জা, ভয়, সঙ্কোচ, কুলমান—সব ত্যাগ করে কৃষ্ণপ্রেম রস-সমুদ্রে নিমজ্জনের জন্য একান্তভাবেই উদ্গ্রীব।—কৃষ্ণের অনুপম রূপ দর্শনে রাধার অনুভূতি—"যেজন দেখিল/সেজন ভুলিল/কি তার কুল বিচার॥" কৃষ্ণের রূপ মাধুরী রাধার দৃষ্টিতে কিরূপ? উত্তরে রাধার উক্তি—'দেখিনু সে শ্যাম/যিনি কোটি কাম। বদন জিতল শশী।/ভাঙ ধনু ধাম/নয়নের বাণ/হাসি খসে সুধারাশি॥' বস্তুত কৃষ্ণের এই রূপ দর্শন গতানুগতিক আলংকারিক চাতুর্যমুখর বর্ণনামাত্র। কারণ চণ্ডীদাসের রাধা কৃষ্ণের রূপ অপেক্ষা স্বরূপে পৌঁছাতে অধিক তৎপর। তাই কৃষ্ণরূপের চকিত দর্শনেই তিনি আত্মহারা হয়ে পড়েন।—

সজনি, কি হেরিনু যমুনার কূলে।
ব্রজ-কুল-নন্দন হরিল আমার মন
ত্রিভঙ্গ দাঁড়াঞা তরুমূলে॥
গোকুল নগরমাঝে আর যত নারী আছে
তাহে কোন না পড়িল বাধা।
নিরমল কুলখানি যতনে রেখেছি আমি
বাঁশী কেনে বলে রাধা রাধা॥

দর্শনমাত্রই হৃদয়ে সুগভীরভাবে অনুপ্রবিষ্ট ও প্রস্তরক্ষোদিত হয়েছে কৃষ্ণের মধুর মূরতিখানি। ফলে নিজ পরিজনকেও আর রাধার আপন বলে মনে হচ্ছে না। কৃষ্ণকে তিনি ভুলতে চান, অথচ ভুলতে পারছেন না। চিত্রপটে দেখা কৃষ্ণরূপ রাধিকার চিত্তপটে চিরস্থায়ী আসন পেতেছে। এখন তাঁর উপায় কি? বিশাখা আনীত চিত্রপটে কৃষ্ণকে বিরলে বসে রাধা দেখেছেন, তাতেই তাঁর এই ব্যাকুলতা। তাঁর মনে এখন ভাবান্তর উপস্থিত। কিন্তু এই আকস্মিক হৃদয়-আলোড়নের কারণ এখনো তাঁর কাছে স্পষ্ট নয়, কিংবা কারণ তিনি ঠিকই বুঝেছেন,—কিন্তু ভালোমন্দ কিছুই জানেন না, এমতাবস্থায় তাঁর এরূপ ভাব-ব্যাকুলতার স্বরূপ কি, সে বিষয়ে, তিনি অজ্ঞ,—এমন কথার ছলে রাধা তাঁর কৃষ্ণ-প্রীতির গাঢ়তা ও গূঢ়তাকেই যেন আরো স্পষ্ট করে দেখাতে চাইছেন। চিত্রপটে কৃষ্ণরূপ দর্শনমাত্র রাধার হৃদয়ে প্রেমানল প্রজ্বলিত হয়েছে, কৃষ্ণপ্রেমের রসসাগরে তিনি নিমজ্জিত হয়েছেন, এ থেকে তাঁর আর পরিত্রাণ নেই। বলাবাহুল্য পরিত্রাণ তিনি চানও না।—

নিজ পরিজন সে নহে আপন
বচনে বিশ্বাস করি।
চাহিতে তা পানে পশিল পরাণে
বুক বিদরিয়া মরি॥

চাহি ছাড়াইতে ছাড়া নহে চিতে
এখন করিব কি।
কহে চণ্ডীদাসে শ্যাম নবরসে
ঠেকিল রাজার ঝি॥

কৃষ্ণ-আশীবিষের জ্বালায় রাধা জ্বলে-পুড়ে মরছেন, তদুপরি আছে শাশুড়ী ননদীর বাক্যবাণ। রাধা তাঁর মনের বেদনা কাউকে বলতে পারছেন না। "ঘন যামিনীর মাঝে' এই না-বলা বাণীই রাধাকে যেন উদ্বেল করে তুলছে। কেউ তাঁর এই ব্যথা বুঝবে না।—

সই এ কথা কহিব কারে।
সাপিনী দংশিল বিষেতে ছাইল
তনু জরজর করে॥
আপনার দুখ আপনা অন্তরে
কেবা পরতীত যায়।
শাশুড়ী ননদী যদি কথা কহে
গরল লাগে হিয়ায়॥
অঙ্গের অঙ্গিনী সঙ্গের সঙ্গিনী
সুখ দুখ সেহি জানে।
চণ্ডীদাস কহে দুখ জ্বালা যত
না যাবে কালিয়া বিনে॥

চণ্ডীদাসের রাধা পূর্বরাগ পর্যায়েই অনুরাগের গহন বনে পথ হারিয়েছেন। কৃষ্ণকথা এবং কৃষ্ণের সুমধুর বংশীধ্বনি সেই সঙ্গে যুক্ত হয়ে রাধার মনকে বিকল করে তুলেছে। চকিত দর্শনই তাঁর চিত্তকে বিমুগ্ধ করেছে। সুতরাং কৃষ্ণের প্রেমের কী মাধুর্য, রাধা অন্তরে ভালোভাবেই অনুভব করতে পারছেন।

দুইটি নয়ান মদনের বাণ
দেখিতে পরাণ হানে।
পশিয়া মরমে ঘুচায়া ধরমে
পরাণ সহিত টানে॥...
যে জন দেখিল সে জন ভুলিল
কি তার কুলবিচার॥

'রসের নাগর বড় কালা'-র প্রেমফাঁদে গোকুল নগরের কোন নারী নয়, শুধু রাধাই আটকে পড়েছেন, রাধার এই বিরক্তি বা বিস্ময়মূলক উক্তির মধ্যে তাঁর মনের গৌরববোধই যে তিনি প্রকাশ করতে চাইছেন, তা কিন্তু অনুক্ত থাকেনি। তাঁর হৃদয়ের এই আর্তির কারণ তো রাধা নিজেই। কারণ বড়াই, সখিগণ—সকলেই তাঁকে নিষেধ করেছেন যমুনা কূলে যেতে, তবু রাধা যাবেন, যান। বড়াই তাঁকে বলেছেন—

সোনার নাতিনী কেন আইস যাও পুনঃ পুনঃ
না বুঝি তোমার অভিপ্রায়।
সদাই কাঁদনা দেখি অঝর ঝরয়ে আঁখি
জাতিকুল সব পাছে যায় ॥......
ঘরে আসি নাহি খণ্ডে সদাই তাহারে চাও
বুঝিলাম তোর মনকথা।

সখিগণও তাঁকে নিষেধ করে বলেছেন—

না যাইও যমুনার জলে তরুয়া কদম্ব তলে
চিকণ কালা করিয়াছে থানা।
নব জলধর রূপ মুনিমন মোহে গো
তেঞি জলে যেতে কার মানা ॥......
নয়নে কটাক্ষ বাণে হিয়ার ভিতরে হানে
আর তাহে মুরলীর তান।
শুনিয়া মুরলীগান ধৈরজ না ধরে প্রাণ
নিরখিলে হারাবি পরাণ ॥

বলাবাহুল্য, এ নিষেধ যেন নিষেধ নয়, এটা রাধাকে আরো কৌতূহলী ও উৎসাহিত করে তুলবার জন্য। রাধা তাই দ্বিগুণ উদ্যমে যমুনা কূলে ধাবিত হয়েছেন।

পূর্বরাগের আত্যন্তিক আবেশেই রাধা আত্মহারা। প্রৌঢ় পূর্বরাগের দশ-দশার বিভিন্ন স্তর পর্যায়ে রাধার দ্রুত উন্নয়ন। সমাজ-সংসার সম্পর্কে তাঁর চেতনা ধীরে ধীরে কমে আসছে। এখন অন্তর-বেদনা-মথিত রাধা ঃ

বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা ॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে
না চলে নয়ান তারা।
বিরতি আহারে রাঙা বাস পরে
যেমতি যোগিনী পারা ॥

হৃদয়-মথিত রাগ-বেদনা রাধাকে আবেশে মুগ্ধ করে তুলেছে। রাধার মনোমন্দিরে চলেছে নিত্য কৃষ্ণারতি। মাঝে মাঝে তারই বহিঃপ্রকাশ দেখা দিচ্ছে রাঙা বাস পরণে, এলায়িত কুন্তলের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপে, মেঘ পানে দু'হাত তুলে আকূতি জ্ঞাপনে, ময়ূর-ময়ূরীর কণ্ঠ নিরীক্ষণে। রাধা এখন ঃ

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব কাননে চায় ॥

রাধা এখানে আত্মহারা। ফলে পরিজন ও গুরুজনের ভয়, নারীর স্বাভাবিক লজ্জাবৃত্তি তাঁর কাছে গৌণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'এখন সদাই চঞ্চল বসন অঞ্চল সম্বরণ নাহি করে।' পূর্বরাগের কবিতাকে যেমন বলা হয় আত্মস্বরূপের আচম্বিত জাগরণ, তেমনি একধাপ অগ্রসর হ'য়ে বলা যায় আত্মস্বরূপের বিলোপ সাধনায় অগ্রসরের সোপানও বটে। সে কারণেই রাধার উক্তি—'কুলের ধরম রাখিতে নারিনু কহিলুঁ সবার আগে।' এখন—'শ্যাম সুনাগর সদাই হিয়ায় জাগে।' শ্যাম নামে অভিষিক্ত হিয়ার মর্মবেদনাটুকুই এখন রাধার সম্বল। রাধার 'বাহিব দুয়ারে কপাট লেগেছে ভিতর দুয়ার খোলা।' আর সেখানে তো অনুভূতির একচ্ছত্র অধিকার, মন-শতদলের এক একটি পাপড়ি উন্মোচিত হচ্ছে, আর চেতনার পরতে পরতে সঞ্চারিত হচ্ছে অনুভূতির রসে নিষিক্ত তারই স্বপ্ন-মধুর সুষমা।

পরিপূর্ণ প্রেমভারে-আনত রাধার মর্মবেদনা প্রকাশের স্থান নেই। কেই বা প্রত্যয় করবে তাঁর কথা! অপর দিকে উদ্বেগ ও ভাবাকুলতাকে কিছুতেই মনের গহনে চেপে রাখতে পারছেন না তিনি। ফলে চমকিত চিত্ত, সদা ছল ছল আঁখি নিয়ে, গুরুজনের সামনে দাঁড়ানোর মত ধৈর্য তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। বিশ্বসংসার তাঁর কাছে শ্যামময়। কিন্তু যথার্থই যখন শ্যামকে স্থূলচক্ষু দিয়ে দেখলেন, তখন 'সে কথা কহিবার নয়।' কেননা তখন তো রাধা দেহমনের প্রতি অণু-পরমাণু দিয়ে উপলব্ধি উপভোগ করছেন, অন্যকে বোঝাবেন কি করে তাঁর অনুভূতি? পূর্বে শ্যামকে বিশ্বময় দেখেছিলেন, এখন হিয়ার পালঙ্কে আসীন—'শ্যাম সুনাগর সদাই হিয়ায় জাগে।' ফলে—'কুলের ধরম রাখিতে নারিলুঁ কহিলুঁ সবার আগে।' এখন রাধার এবং কৃষ্ণেরও মনে হয়—অনাদি কালের হৃদয়-উৎস হ'তে ভেসে চলেছেন তাঁরা যুগল প্রেমের স্রোতে।

সেই মরম কহিলুঁ তোরে।
আড় নয়নে ঈষৎ হাসিয়া
আকুল করিল মোরে॥

কৃষ্ণের পূর্বরাগ বর্ণনামূলক কবিতায় দেহাবেশ একেবারে বিসর্জিত হয় নি। রূপদর্শনে পুরুষের অধিকার। কৃষ্ণ রাধার অনিন্দ্য-সৌন্দর্য-কান্তি দর্শনে একেবারে আত্মহারা।

থির বিজুরি বরণ গোরী
পেখনু ঘাটের কূলে।
কানাড়া ছাঁদে কবরী বাঁধে
নব মল্লিকা ফুলে॥

রূপশেল-বিদ্ধ কৃষ্ণ এখন বিকল। তাঁর অনুভূতি ঃ

জরজর হিয়া রহিল পড়িয়া
চেতন নাহিল মোর॥

রাইকিশোরীর রূপসৌন্দর্য কৃষ্ণের চিত্তে আলোড়ন তুলেছে। তাঁর চকিত চাহনি ঈষৎ ভ্রূভঙ্গি, লীলায়িত গমনভঙ্গি, মেঘের ফাঁকে বিদ্যুৎ-চমকের মত রূপের হিল্লোল কৃষ্ণের হৃদয়কে বিকল, বিবশ, অচেতন করে চলেছে। তাঁর মনে হচ্ছে—"আপন গিয়ানে না

দেখি নয়ানে এমন রূপের কায়।' রাধা যেন স্বর্ণ-পুত্তলি, নীল শাড়ীর আবরণ ভেদ করে তাঁর অনুপম রূপের ছায়া ফুটে উঠেছে যেন বিদ্যুতের এক ঝলক। তাঁর—'অঙ্গের পবন রসের সৌরভে লাখ লাখ অলি ধায়ে।' কৃষ্ণহৃদয়ও এখন ভ্রমর-গুঞ্জনের মত রাধার রূপ সৌরভের জন্য আকুলিত। এই অনুপম সৌন্দর্যের আকর্ষণে কৃষ্ণ উন্মত্তপ্রায় :

নবীন কিশোরী মেঘের বিজুরী
চমকি চলিয়া গেল।
সঙ্গের সঙ্গিনী সকল কামিনী
ততহি উদয় ভেল ॥
সই দেখি নাই হেন নারী।
ভঙ্গিম রঙ্গিম ঘন সে চাহনি
গলে যে মোতিম হারি ॥···
চাহে যাহা পানে বধয়ে পরাণে
দারুণ চাহনি তার।
হিয়ার ভিতরে পাঁজর কাটিয়ে
বিঁধিল বাণ যে মার ॥
জরজর হিয়া রহিল পড়িয়া
চেতন নাহিল মোর।
চণ্ডীদাস কয় ব্যাধি সমাধি নয়
দেখিনু হইনু ভোর ॥

লক্ষ্য করতে হবে যে, রাধার দেহসৌন্দর্যের জগতেই এখন পর্যন্ত কৃষ্ণের দৃষ্টি নিবদ্ধ। রাধার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতিটি সঞ্চালন, বসনের সামান্য স্থানচ্যুতিও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না। রাধা-অঙ্গের স্থূল বর্ণনার চিত্র এখানে দেখি। কিন্তু তার দু' একটি এমন পংক্তি প্রকাশিত হয়েছে, যার দ্বারা কৃষ্ণের মনোবেদনা সূচিহ্নিত। যেমন :

চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিত মোর।
সেই হতে মোর হিয়া নহে থির
মনময় জরে ভোর ॥

এখানে স্নানশেষে রাধা তাঁর পরিধানের নীল বসন নিঙড়াতে নিঙড়াতে চলেছেন, তাতে কৃষ্ণের মনে হচ্ছে—নীল বসন নয়, কৃষ্ণের প্রাণতন্ত্রীকে দলিত করে এগিয়ে চলেছেন রাধা। অনুপম এই দুটি কাব্য পংক্তি!

রাধার কৃষ্ণানুরাগ বৃদ্ধিতে সখীদের ভূমিকাও যথেষ্ট। দূতীরূপে সখী এসে রাধাকে কৃষ্ণের আকুলতার কথা জানিয়ে তাঁর লালসাকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে। এ যেন তপ্ত আগুনে ঘৃতাহুতি। দূতী রাধাকে বলছেন—কৃষ্ণও রাধাপ্রেমে বিগলিত চিত্ত। দূতীর ভাষায়—

সে যে নাগর গুণের ধাম। জপয়ে তোহারি নাম ॥
শুনিতে তোহারি বাত। পুলকে ভরয়ে গাত ॥
অবনত করি শির। লোচনে ঝরয়ে নীর ॥
যদি বা পুছিয়ে বাণী। উলট করএ পাণি ॥
কহিয়ে তাহারি রীতে। আন বা বুঝিবি চিতে ॥
ধৈরজ নাহিক তায়। বডু চণ্ডীদাসে গায় ॥

বলাবাহুল্য, দূতীর এই বর্ণনার কারণ: পূর্বরাগের ভাবে কৃষ্ণ কতদূর আবিষ্ট সেটা দেখানো, অন্যদিকে রাধার গূঢ় ও গাঢ় প্রেমের আকর্ষণকে অধিকতর স্ফুট করে তাঁর মনকে কৃষ্ণ সান্নিধানে উপনীত করা। কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা সম্পাদনে সখীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আমরা পদ সাহিত্যের প্রথম পর্যায় থেকেই লক্ষ্য করি। আর একটি পদে কৃষ্ণের যে 'বিমুগ্ধ' অবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে, তাও রাধার কৃষ্ণপ্রেমের তৃষ্ণাকে আরো ঘনীভূত করে তুলবার জন্য। পদটি এই—

এ ধনি এ ধনি বচন শুন। নিদান দেখিয়া আইলুঁ পুন ॥
দেখিতে দেখিতে বাঢ়ল ব্যাধি। যত তত করি না হয়ে সুধি ॥
না বান্ধে চিকুর না পরে চীর। না খায়ে আহার না পিয়ে নীর ॥
সোনার বরণ হৈল শ্যাম। গোঙরি গোঙরি তাহার নাম ॥
না চিহ্নে মানুষ নিমিখ নাই। কাঠের পুতলী রৈয়াছে চাই ॥

আর একটি পদেও রাধা তাঁর প্রিয়মিলন যাত্রার পথে শতেক বাধা-বিঘ্নের কথা জানাচ্ছেন। সখীর প্রতি তাঁর এ উক্তি, এবং তা কৃষ্ণকে জানানোর জন্য তো বটেই। কিন্তু রাধা হৃদয়ের তীব্র দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয় এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেন নি—এ চিত্রও চণ্ডীদাসের পদে অলক্ষ্য নয়। সখীর প্রতি রাধার আর একটি উক্তিতেও এটা দেখা যায়।—

কহিও তাহার ঠাঁই যেতে অবসর নাই
অফুরাণ হল গৃহ-কাজে।
শাশুড়ী সদাই ডাকে ননদী প্রহরী থাকে
তাহার অধিক দ্বিজরাজে ॥
সজনি কোপ করেন দুরন্ত ॥
গৃহকর্ম করি ছলে বিপিনে যাইবার বেলে
আকাশে প্রকাশ ভেল চন্দ্র ॥
ও কুলে বিচ্ছেদ ভয় এ কুলে নাহিলে নয়
সুসারিতে নিশি গেল আধা।
আসিয়া মদন সখা হেন বেলে দিলে দেখা
কহ দূতি কি করিবে রাধা ॥

লোহার পিঞ্জরে থাকি বাহির হতে চাহে পাখী
তার হৈল আকুল পরাণ।
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয় আর কি বিরহ সয়
ত্বরিতে মিলব বর কান ॥

দেহ সংসার-সীমায় আবদ্ধ, কিন্তু মন চকিত গতিতে কৃষ্ণ-সন্নিধানে উপনীত—দেহ ও মন, লোকভয়, গৃহভয়, কুলনারীসুলভ লজ্জার সঙ্গে প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের যে দ্বন্দ্ব, তার মধ্যেই রাধাপ্রেমের উৎকর্ষ সূচিত হয়েছে চণ্ডীদাসের পদে। আরো লক্ষণীয় যে, এই স্তরেই—

তুলাখানি দিলু' নাসিকা মাঝে। তবে সে বুঝিলু সোয়াস আছে ॥
আছয়ে সোয়াস না রহে জীব। বিলম্ব না সহে আমার দীব ॥
চণ্ডীদাস কহে বিরহ বাধা। কেবল মরমে ঔষধ রাধা ॥

কৃষ্ণের জন্য রাধারও তো একই অবস্থা। এ যেন নদীর দুই পারে দুটি হৃদয় উন্মুখ প্রতীক্ষায় রয়েছে—কখন তাঁদের একটে মিলন ঘটবে। কিন্তু এখনো বাধা—মাঝখানে খরস্রোতা নদী। এখানে রাধার কাছে ঘরের ও পরের বাধাই এখনো রয়েছে। পূর্বরাগ পর্যায়ে রাধা সর্বাংশে দেহাত্ম-বুদ্ধিমুক্ত হতে পারেন নি। তাই কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর বাঞ্ছিত মিলন এ মুহূর্তে সুদূর-পরাহত। রাধা কৃষ্ণগতপ্রাণা, কিন্তু ঘরের বাধা, পরের বাধা এ পর্যায়ে ত্যাগ করতে পারেন নি। তাই সখীকে অনুরোধ করেন, একদিকে তাঁর যন্ত্রণাদিগ্ধ প্রেমের আকূতি, অন্যদিকে তাঁর অসহায়তার কথা কৃষ্ণকে জানাতে—

কহিও বঁধুরে নতি কহি বঁধুরে।
গমন বিরোধ হৈল পাপ শশধরে ॥
গুরুজন সম্ভাষিতে কৈলু' যত ভাতি।
নিজ পতি সম্ভাষিতে গেল আধ রাতি ॥
যদি চাঁদ ক্ষমা করে আজুকার রাতি।
তবে তো পাইব আমি বঁধুর সংহতি ॥
অমাবস্যা প্রতিপদে চাঁদের মরণ।
সেদিনে ব'ধুর সনে হইবে মিলন ॥
চণ্ডীদাস বলে তুমি না ভাবিহ চিতে।
সহজে একথা বটে কেন পাও ভিতে ॥

তবে একথাও ঠিক যে, চণ্ডীদাসের রাধা লৌকিকতার স্তর অনেক ক্ষেত্রেই অতিক্রম করে মহাভাবের স্তরে উপনীত হয়েছেন। কৃষ্ণপ্রেমে ব্যাকুল, পাগলিনী-প্রায় রাধার এই এই চিত্রও চণ্ডীদাস সহজ ভাষায় গভীর ব্যঞ্জনায় আভাসিত করেছেন—

একে কুলবতী ধনী তাহে সে অবলা।
ঠেকিল বিষম প্রেমে কত স'বে জ্বালা ॥
অকথন বেয়াধি এ কহন না যায়।
যে করে কানুর নাম ধরে তার পায় ॥

পায়ে ধরি কাঁদে সে চিকুর গড়ি যায়।
সোনার পুতুলি যেন ভূমেতে লোটায়॥
পুছয়ে কানুর কথা ছলছল আঁখি।
কোথায় দেখিলা শ্যাম কহ দেখি সখি॥
চণ্ডীদাস কহে কাঁদে কিসের লাগিয়া।
সে কালা আছয়ে তার হৃদয়ে জাগিয়া॥

চণ্ডীদাসের পূর্বরাগ-পদের যেমন ভাবগভীরতা, তেমনি তার রূপবৈচিত্র্যও বর্তমান। দর্শন ও শ্রবণের সব অঙ্গ তাঁর রচিত পূর্বরাগ বিষয়ক পদে রয়েছে। বস্তুত চণ্ডীদাস পূর্বরাগ বিষয়ক পদ রচনায় রাধা এবং সেই সঙ্গে কৃষ্ণের মনোগহনের বিচিত্র আলো-আঁধারি রহস্যকে সন্ধানী আলোর দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত করেছেন।

॥ ৪ ॥

'বাসকসজ্জা' স্তরে চণ্ডীদাসের রাধা একান্তভাবেই মিলনোৎসুকা প্রেমিকা রমণী। প্রিয়ের সঙ্গে মিলনের জন্য তিনি নিজে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছেন। কিন্তু কান্ত আসেন কই? উৎকণ্ঠিত চিত্তে রাধা পথের পানে তাকিয়ে আছেন। কিন্তু কানুর দেখা নেই। রাধার অন্তরাত্মা ক্রন্দন করে, হাহাকার করে ওঠে এভাবে—

বন্ধুর লাগিয়া শেজ বিছাইলুঁ
গাথিলুঁ ফুলের মালা।
তাম্বুল সাজালুঁ দীপ উজারলুঁ
মন্দির হইল আলা॥
সই পাছে – এসব হইবে আন।
সে হেন নাগর গুণের সাগর
কাহে না মিলল কান॥
শাশুড়ী ননদে বঞ্চনা করিয়া
আইল গহন বনে।
বড় সাধ মনে এ রূপ যৌবনে
মিলব বঁধুর সনে॥
পথ পানে চাহিব কতনা রহিব
কত প্রবোধিব মনে।
রস শিরোমণি আসিবে এখনি
বড়ু চণ্ডীদাস ভণে॥

এখানে গৃহবাধা, পথবাধা, সংকোচ—সব কিছু দূরে রেখে শ্রীমতীর পিয়ামিলন আশে সজ্জিত হয়ে পরম কান্তের জন্য অপেক্ষা করার মধ্যে একদিকে তাঁর প্রেমের গভীরতা, অন্যদিকে কৃষ্ণ না আসার কারণে তাঁর অন্তরের সুতীব্র বেদনা ও হাহাকার প্রকাশিত হচ্ছে।

বড় আশা নিয়ে তিনি বন্ধুর সঙ্গে মিলনের জন্য এসেছিলেন। কিন্তু তাঁর ভাগ্যে জুটল হতাশার দিগন্তবিস্তারী যন্ত্রণা। বন্ধুর জন্য পথপানে তাকিয়ে তিনি আর কত অপেক্ষা করবেন? তাঁর সকল প্রস্তুতি বিফলে গেল। এখন হতাশায় মনে হচ্ছে, কেন এই দুঃখব্রত সাধন তিনি করতে গিয়েছিলেন? রাধা ডুকরে কেঁদে ওঠেন—

নিশি প্রভাত হৈল পিয়া না আইল ভবনে।
মালতীর মালা কেন গাঁথিলাম যতনে॥
অগুরু চন্দন চুয়া দিব কার গায়।
জরজর হৈল তনু নিশি না পোহায়॥

কানু মন্দিরে এলেন না। সারা নিশি জাগরণে কেটেছে রাধার। তাঁর মনে হচ্ছে— 'সকল বিফল হৈল।' বস্তুত বাসকসজ্জিকা রাধার এই অন্তর্লীন বেদনাই খণ্ডিতা পর্যায়ে কৃষ্ণের প্রতি রোষ ও অভিমান বহ্নিতে পরিণত হয়ে শ্লেষ বাক্য উচ্চারণে প্রবৃত্ত করেছে মানিনী রাধাকে। বস্তুত কৃষ্ণের প্রতি সুগভীর প্রেম ও আত্যন্তিক আকর্ষণের কারণেই তাঁকে না পাওয়ায় শ্রীরাধার ক্ষোভ ও বেদনার উদ্ভব। চণ্ডীদাসের রাধার অন্তর্জ্বালা কামনার ধনকে না পাওয়ার কারণে। এ পর্যায়ে তাঁর শ্লেষ ও ব্যঙ্গের বাণ কৃষ্ণের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়েছে। কিন্তু রাধার বেদনাবিধূর ও যন্ত্রণা-কাতর মানসচিত্রটিও এখানে অলক্ষ্য থাকেনি। আর এটাও স্বীকার্য যে, চণ্ডীদাস মিলন নয়, বিরহের কবি। তাই বিরহ-বেদনামূলক পদের মত মিলনের পদে তাঁর সোৎসাহ স্বতঃস্ফূর্ততা দেখা যায় না।

(চণ্ডীদাসের পদে একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেছে যে, দুঃখের কথা, বেদনার কথা প্রকাশে চণ্ডীদাস মুখর। সুখের কথায় যেন তাঁর অধিকার নেই। বেদনা সমুদ্রের তুফানে হাবুডুবু খেয়ে চণ্ডীদাসের রাধা বেদনার মহনীয়তাকে যেন আরো বহু উচ্চগ্রামে তুলে দিয়েছেন। 'খণ্ডিতা'-শীর্ষক পদগুলি খণ্ডিতা নায়িকার আর্তস্বর ও বঞ্চিত জীবনের হাহাকারে সমুজ্জ্বল। 'খণ্ডিতায় ব্যঙ্গের সূচিকা, রোষের জ্বালা, ঘৃণার আতিশয্য, তিক্ততার চরম'। চণ্ডীদাসের খণ্ডিতার পদে এই বৈশিষ্ট্যগুলি চরম অভিব্যক্তি পেয়েছে। প্রসঙ্গত, বলা চলে—একজন সমালোচক খণ্ডিতার পদগুলি "আমাদের নিষ্কলুষ চণ্ডীদাস বোধের কাছে অবাঞ্ছিত" বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু এ মন্তব্য অহেতুক বলে আমাদের মনে হয়। কারণ ভালবাসার চেয়ে বড় কিছু রাধার জীবনে নেই। সেই ভালবাসার অনাদর সহ্য করা কি রাধার পক্ষে সম্ভব? খণ্ডিতা নায়িকা রাধার ক্ষোভের উৎস শ্রীকৃষ্ণ; আবার শ্রীকৃষ্ণ সমীপেই তাঁর বেদন-বিষের জ্বালার উদ্‌গীরণ:

ছুঁওনা ছুঁওনা বঁধু ঐখানে থাক।
মুকুর লইয়া চাঁদমুখখানি দেখ॥
নয়ানের কাজর বয়ানে লেগেছে।
কালর উপরে কাল।
প্রভাতে উঠিয়া ও মুখ দেখিলুঁ
দিন যাবে আজি ভাল॥

খণ্ডিতা পর্যায়ে ব্যঙ্গের জ্বালা, বঞ্চিতের বেদনা আছে। উপরি কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগের গভীরতম স্তরের রহস্যও উন্মোচিত হয়েছে। বস্তুত, অভিমান হয় তখনই যখন দেখা যায় যে, যাকে সবচেয়ে প্রিয় বলে জানি তিনিই অন্য নারীর সাহচর্যে রজনী অতিবাহিত করেন। প্রাতঃকালে সেই চিহ্ন অঙ্গে ধারণ করে কৃষ্ণ যখন রাধা সান্নিধানে উপনীত হন, তখন প্রেমের অপমানে রাধার কণ্ঠে যে বিদ্রূপ ও ধিক্কার বাণী উচ্চারিত হয়, তার মধ্যে রাধার চাপা মর্মবেদনাও অনুভব করা যায়। সেই সঙ্গে অনুভব করা যায় বঞ্চিতা রমণীর মর্মভেদী হাহাকার। যেমন—

ভাল হৈল আরে বঁধু আসিলা সকালে।
প্রভাতে দেখিলাম মুখ দিন যাবে ভালে॥
বঁধু তোমার বলিহারি যাই।
ফিরিয়া দাঁড়াও তোমার চাঁদমুখ চাই॥
আই আই পড়েছে মুখে কাজরের শোভা।
ভালে সে সিন্দুরে বিন্দু মুনি মনোলোভা॥
এখন কহ মনের কথা আইলা কোন কাজে॥

এই ধিক্কার ও শ্লেষ বাক্য মর্মঘাতী সন্দেহ নেই। এই শ্লেষ কৃষ্ণকে যেমন বিদ্ধ করে, তেমনি এই কটু বাক্য রাধা উচ্চারণ করেন বঞ্চনাজনিত ক্ষোভের কারণে। কেননা, যে নারী সর্বমনপ্রাণ দিয়ে দয়িতকে ভালোবেসেছে, তার প্রেমের অনাদরে মনস্তাত্ত্বিক কারণেই এরূপ কঠোর শ্লেষবাক্য উচ্চারিত হয়। প্রেমের অভাব থাকলে চণ্ডীদাসের রাধার মুখে কখনই এমত বাণী উক্ত হোত না—

হেদে হে নিলাজ বঁধু লাজ নাহি বাস।
বিহানে পরের বাড়ী কোন লাজে আস॥
বুক মাঝে দেখি তোমার কঙ্কণের দাগ।
কোন্ কলাবতী আজি পেয়েছিল লাগ॥
পদনখ বিরাজিত রুধিরে ভূষিত।
আহা মরি কিবা শোভায় হয়েছ ভূষিত॥
কপালে সিন্দুর রেখা অধরে কাজল।
সে ধনী বিহনে তোমার আঁখি ছল ছল॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে শুন বিনোদিনী।
না ছুঁইও আমি ইহার সব রঙ্গ জানি॥

অতি দুঃখেই রাধা কৃষ্ণকে বলেন—'সাধিলে মনের সাধ যে ছিল তোমারি। দূরে রহুঁ দূরে রহু প্রণাম হামারি।' এ বেদনা ও ক্ষোভ একান্তভাবে রাধার নিজেরই। খল ও ছলনাময় কৃষ্ণের উক্তি—('তোমা বিনু দিবা নিশি কিছু না জানিয়ে') রাধাকে আরো বিরক্ত ও উত্তেজিত করে তোলে। কিন্তু একজন সখী তাঁর উক্তিতে রাধার কোপের অন্তর্নিহিত

রহস্য উদ্ঘাটন করে দেন। বস্তুত, রাধাপ্রেমের অপার রহস্যময়তা ও প্রেমের বক্রতার পরিচয়ও এতে পাওয়া যায়—

শুনহ রাজার ঝি। লোকে না বলিবে কি ॥
মিছাই করিলি মান। তো বিনু আকুল কান ॥
অনন্ত সঙ্কেত করি। তাহা জাগাইলি হরি ॥
উলটি করসি মান। বড়ু চণ্ডীদাস গান ॥

অন্য নারীতে আসক্ত কৃষ্ণকে চরম আঘাত দিচ্ছেন রাধিকা প্রেমেরই কারণে। কৃষ্ণকে ভালবেসেই তাঁর সুখ, আবার সেই ভালোবাসার জন্য তাঁর দুঃখেরও অবধি নেই। সেই দুঃখ-দহনের বিষ-জ্বালা উদ্‌গীরিত হয়েছে খণ্ডিতার পদগুলিতে। আর বিষবাণ নিক্ষেপই রাধা চরিত্রের শেষ কথা নয়।

॥ ৫ ॥

চণ্ডীদাস রূপের নয়, স্বরূপ সন্ধানের কবি। তাছাড়া আধ্যাত্মিক ভাবসমাচ্ছন্ন ছিল তাঁর কবি-আত্মা। তাই রঙ্গলীলার স্থূল ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দানে তাঁর কবিমন সঙ্কোচ অনুভব করেছে। ফলে চণ্ডীদাসের রাধাকৃষ্ণ-মিলন বিষয়ক পদের সংখ্যা খুব সীমিত। আর যেটুকুও তিনি বর্ণনা করেছেন, তা অন্তর-উপলব্ধির ব্যঞ্জনাময় সুরভিমিশ্রিত পদমাত্র। রাধার সুগভীর প্রেমানুভূতির অন্তর-সম্পদে সমৃদ্ধ চণ্ডীদাসের রাধাকৃষ্ণ মিলন ও রসোদ্গারের পদগুলি। কানুপ্রেমের বশবর্তী হয়ে শ্রীরাধা নিজের স্বাতন্ত্র্যই যেন হারিয়ে ফেলেছেন— 'যে হয় তাহার চিতে স্বতন্তরী নই।' কারণ—

তাহার গলার ফুলের মালা
আমার গলায় দিল।
তাহাব মত মোরে করি
সে মোর মত হইল ॥
তুমি সে আমার প্রাণের অধিক
তেঁঞি সে তোমারে কহি।
এ যে কাজ কহিতে লাজ
আপন মনেই রহি ॥
তাহার প্রেমের বশ হৈয়া
যে কহে তাহাই করি।
চণ্ডীদাস কহায় ভাব
বালাই লইয়া মরি ॥

লক্ষণীয়, মিলন লীলার যে স্মৃতি রাধা এখানে চিত্রণ করছেন, তাতে আলঙ্কারিক মণ্ডনকলার বর্ণাঢ্য ঐশ্বর্য নেই। কিন্তু এই সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর বর্ণনার মধ্যে দুটি হৃদয়ের গভীরতম অনুভূতির চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। এই মিলন দুইটি হৃদয়-স্রোতের

কল্পধারা যেন, যাঁকি দর্শনে যার সন্ধান পাওয়া যায় না, যা একান্তভাবেই অনুভববেদ্য ও রসনির্ভরশী। চণ্ডীদাসের রাধাকৃষ্ণ-মিলন ও রসোদ্গার পর্যায়ের পদগুলিও 'সরল তরল রসাল প্রাঞ্জল প্রসাদগুণেতে ভরা', অথচ নিভৃততম প্রদেশের গূঢ়তম ভাবের বাণীবহ। যেমন—

এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি।
নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দূর মানি ॥
মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাঁপে গাও।
সম্মুখে রাখিয়া করে বসনের বাও ॥
এক তনু হইয়া মোরা রজনী গোঙাই।
সুখের সাগরে ডুবি অবধি না পাই ॥
রজনী প্রভাত হৈলে কাতর হিয়ায়।
দেহ ছাড়ি যেন মোর প্রাণ চলি যায় ॥
সে কথা কহিতে সই বিদরে পরাণ।
চণ্ডীদাস কহে রাই সব পরমাণ ॥

প্রেমের এই গভীরতা ও আত্যন্তিক আকর্ষণের কারণে এই পদে আমরা প্রেমবৈচিত্ত্যের সুরও যেন শুনতে পাই। সহজ ভাষায় রসের-ব্যঞ্জনা স্ফুরণ দ্বারা পদটি অপরূপ শিল্প-সুষমায় মণ্ডিত হয়েছে।

॥ ৬ ॥

বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে অনুরাগ চার প্রকার—উল্লাস, আক্ষেপ, রূপ ও অভিসার। আক্ষেপানুরাগ আবার নানা প্রকার। রামগোপাল দাসের 'রসকল্পবল্লী'তে বলা হয়েছে—

আক্ষেপ অনুরাগ উক্তি নানাবিধ হয়ে।
দিগ্‌দরশন লাগি কিঞ্চিৎ কহিয়ে ॥
কৃষ্ণকে আক্ষেপ করে আর মুরলীকে।
দূতীকে আক্ষেপ কভু করয়ে সখীকে ॥
গুরুজনে আক্ষেপ কভু কুলশীল জাতি।
আপনাকে নিয়ে কভু দৈন্য ভাবগতি ॥
কন্দর্পকে মন্দ বলি করয়ে ভৎর্সনা।
বিপক্ষাদি ব্যাপিয়া কভু করয়ে রচনা ॥
বিধাতাকে মন্দ বলে কভু দৈব দোষে।

নন্দকিশোর দাস তাঁর 'রসকলিকায়' এই বক্তব্যই অন্যভাবে বলেছেন। যেমন—

আক্ষেপ অনুরাগ নানাবিধ হয়।
সংক্ষেপার্থ তাহা কিছু কহিয়ে নির্ণয় ॥
কৃষ্ণকে, মুরলীকে আক্ষেপ, দূতীকে করয়।
কভু যে আক্ষেপ উক্তি গুরুজনে হয় ॥

কুলে শীলে আক্ষেপ কখনও বিধাতাকে।
জাতিকে আক্ষেপ কভু, কভু আপনাকে ॥
কন্দর্পকে নিন্দা, কভু আক্ষেপ সখীরে।

বস্তুত আক্ষেপানুরাগ পর্যায়ে পরমা প্রেমবতী শ্রীরাধা কৃষ্ণপ্রেম পরিপূর্ণ ভাবে পাচ্ছেন না, এমনতর নৈরাশ্যবোধজনিত কারণে আক্ষেপের আকারে তাঁর হৃদয়ের বেদনাকে বাঙ্‌ময় আলেখ্যে রূপ দিয়েছেন। রাধার আর্তি তাঁর আত্যন্তিক প্রেমের প্রতিদান না পাওয়ায়। কৃষ্ণকে ভালোবেসে তাঁর সুখ-দুঃখ—দুইই। সমাজ, সংসার, সংস্কার, পথের বাধা—সব কিছু তুচ্ছ করে রাধিকা কৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন হয়েছেন, সচ্চিদানন্দ-রসঘন বিগ্রহকে ভালোবাসার আবেগে রাই কমলিনী উদ্ভাসিতা ; তাঁর হৃদয় শতদলের পাপড়িতে পাপড়িতে উল্লাসের কিরণছটা, অন্যদিকে পরম বাঞ্ছিতকে পরিপূর্ণভাবে না পাওয়ার বেদনায় দিগন্ত-বিস্তারী হাহাকারে তাঁর হৃদয় আকীর্ণ। প্রেম যেখানে অতি গাঢ় ও গূঢ়, প্রাপ্তির আশা যেখানে সীমাহীন, সেখানে পেলেও মনে হয় সম্পূর্ণ করে বুঝি পাওয়া হোল না। এই বিরহ-বেদনাই চণ্ডীদাসের রাধাকে সমাচ্ছন্ন করে রেখেছে। বিরহের অন্তর্লীন নৈরাশ্যজনিত বেদনায় রাধা ডুকরে কেঁদে ওঠেন, দোষ দেন নিজের ভাগ্যকে, সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে, এমন কি ভালোবাসার ধন কৃষ্ণকেও। বলা বাহুল্য, এই আক্ষেপ একান্তভাবে রাধার মনেরই সৃষ্টি। আর অনুরাগজনিত কারণেই আক্ষেপের সুর তাঁর মনে জাগে। কৃষ্ণকে হারানোর ভয়, তাঁকে না পাওয়ার বেদনা রাধার বিলাপ-সংগীতের রাগিণীতে মূর্ছিত হয়ে পড়েছে শতধারায়। বহির্দ্বন্দ্ব ও অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত শ্রীরাধিকা দেহ ও মন-দেউলে প্রেমের যে দীপটি জ্বালিয়ে রেখেছেন, তাঁর আকুল আর্তির মধ্য দিয়ে তার ভাস্বরতাই প্রকাশ পেয়েছে। রাধার আক্ষেপ শুধু বেদনার কারণেই নয়, আত্মনিবেদনের সুরে তা অনুরণিত।

(আক্ষেপানুরাগের পদে চণ্ডীদাসের কবি-প্রতিভা শ্রেষ্ঠত্বের সীমালগ্ন। আক্ষেপানুরাগে রাধাকৃষ্ণের অনাদরে বিস্রস্ত, বিক্ষিপ্ত, বিরহ-হুতাশে কাতর। যে রাগ প্রিয়কে নিত্য নূতন রূপে অনুভব করায়, তা হোল অনুরাগ। এই অনুরাগের বশেই রাধা আক্ষেপ করেন, কৃষ্ণকে পেয়েও যেন তিনি পান নি। তিলমাত্র অদর্শনে তাঁর কাছে বিশ্ব-সংসার অন্ধকার ও শূন্য মনে হয়। রাধার দিক থেকে কৃষ্ণকে ভালোবাসায় তো কোন ফাঁকি নেই। কুল-মর্যাদা, লোকধর্ম, আত্ম-মর্যাদা—সব কিছু বিসর্জন দিয়েছেন রাধা সেই চতুর চূড়ামণির পায়ে। রাধার সব মনপ্রাণ, অনুভূতি কৃষ্ণেই নিবদ্ধ—'সদা সে কালিয়া কানু হয় অনুভব।' যার জন্য রাধার অনুযোগ :)

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন ॥
ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর ॥
রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি।

—এত করেও সেই পরম রহস্যের সন্ধান তিনি পান না—'বুঝিতে নারিলু বন্ধু তোমার পিরীতি।' রাধা নিদারুণ যন্ত্রণায় নিজের অসহায়তার কথা এবং সেই সঙ্গে কৃষ্ণপ্রেম হারালে তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থাও কৃষ্ণকে জানান। বস্তুত, রাধার এই মৃত্যুবাঞ্ছা কৃষ্ণের বঞ্চনার জনাই—

কোন্ বিধি সিরজিল সোতের শেওলি।
এমন ব্যথিত নাই ডাকে রাধা বলি॥
বন্ধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে—দাঁড়াইয়া রও॥

কখনবা রাধা নিঠুর কানুর অনাদর ও উপেক্ষার জন্য সরাসরি অনুযোগ জানান—

যখন পিরীতি কৈলা আনি চাঁদ হাতে দিলা
আপনি করিত্যা মোর বেশ।
আঁখির আড় নাহি কর হিয়ার উপরে ধর
এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ॥
একে হাম পরাধীনী তাহে কুলকামিনী
ঘর হৈতে আঙ্গিনা বিদেশ।
এতে পরমাদে প্রাণ না জানি তবু ত আন
আর কত কহিব বিশেষ॥
ননদী বিষের কাঁটা বিষমাখা দেয় খোটা
তাহে তুমি এত নিদারুণ।
কবি চণ্ডীদাস কয় কিবা তুমি কর ভয়
বঁধু তোর নহে অকরুণ॥

লক্ষণীয়, এখানে কানুর প্রতি রাধার ঐকান্তিক প্রেম এবং তার অনাদরের কারণে যে আর্তি ফুটে উঠেছে, তাতে রাধা-হৃদয়ের বিষাদঘন বেদনার সমুজ্জ্বল প্রকাশ ঘটেছে। রাধা তো কৃষ্ণ বিনা আর কিছু জানেন না। শয়নে স্বপনে কৃষ্ণরূপই তিনি মানস-চক্ষে দর্শন করেন, ভ্রমবশে মাটিতে কৃষ্ণনামই লেখেন, গুরুজন সমক্ষে কৃষ্ণনাম শ্রবণে—'পুলকে পুরয়ে অঙ্গ আঁখি ঝরে জল।' তাহা নিবারিতে, রাধা বিকল হয়ে পড়েন, ফলে 'নিশিদিশি বঁধু তোমায় পাসরিতে নারি।' যাঁর জন্য সমাজ, সংসার সব ভাসিয়ে দিয়ে কূল ছেড়েছেন, সেই কৃষ্ণ কালিয়ার অনাদর কিভাবে রাধা সহ্য করবেন? প্রেমের সার্থকতার স্বর্গসীমায় তাঁর কি প্রবেশাধিকার নেই? কৃষ্ণ কি তাঁর প্রতি এতই অকরুণ? অতি মর্মময়ী ভাষায় রাধা মনোবেদনা ব্যক্ত করেন—

হেদে হে বিনোদ রায়।
ভাল হৈল ঘুচাইলা পিরীতের দায়॥
ভাবিতে গণিতে মোর তনু হৈল ক্ষীণ।
জগ ভরি কলঙ্ক রহিল চিরদিন॥

তোমা সনে প্রেম করি কি কাজ করিলুঁ।
মৈলুঁ লাজে মিছা কাজে দগদগি হইলুঁ॥
না জানি অন্তরে মোর হৈল কিবা ব্যথা।
একে মরি মনোদুঃখে আর নানা কথা॥
শয়নে স্বপনে বন্ধু সদা কার ভয়।
কাহার অধীন যেন তোমার প্রেম নয়॥

'মনচোরার বাঁশীও তথৈবচ। তা সুমধুর স্বর রাধাকে আকুল থেকে আকুলতর করে তোলে। বাঁশীর আকর্ষণে কুলধর্ম কালিন্দীর কালো জলে বিসর্জিত; গৃহকাজে মন নেই; নিশিদিন তুঁষের আগুনের মত ধিকি ধিকি জ্বলতে থাকে মন। তা সত্ত্বেও দশ জনের সামনে হাসি মুখে থাকতে হয়। এর চেয়ে বিড়ম্বনা রাধার জীবনে আর কি আছে? রাধা ভাবেন—বাঁশীই তাঁর কাল—

মন মোর আর নাহি লাগে গৃহকাজে।
নিশিদিন কাঁদি সই হাসি লোকলাজে॥
কালোর লাগিয়া হাম হব বনবাসী।
কালা নিলে জাতি কুল প্রাণ নিল বাঁশী।
হাঁ রে সখি কি দারুণ বাঁশী।
যাচিয়া যৌবন দিয়া হনু শ্যামের দাসী॥
তরল বাঁশের বাঁশী নামে বেড়াজাল।
সবার সুলভ বাঁশী বাহিরে সরল॥
পিবয়ে অধর সুধা উগারে গরল।
যে ঝাড়ের তরল বাঁশী তারি লাগি পাও।
ডালে মূলে উপারিয়া সাগরে ভাসাও॥

রাধার মনে হয়, তাঁর এই দুর্ভাগ্যের মূলে রয়েছে কালার বাঁশির মোহন সুর। এই ডাকাতিয়া বাঁশির সুর তাঁর কর্ণে যদি প্রবেশ না করত, তাহলে তিনি ঘর ছেড়ে পথে বেরোতেন না। আর তাহলে তাঁকে এই নিঃসীম দুঃখ ভোগ করতে হোত না।—"বিষম বাঁশীর কথা কহনে না যায়। ডাক দিয়া কুলবতী বাহির করয়॥ কেশে ধরি লৈয়া যায় শ্যামের নিকটে। পিয়াসে হরিণী যেন পড়য়ে সঙ্কটে॥" এই বাঁশীর ধ্বনিই তাঁর সর্বস্ব অপহরণ করেছে। এখন সংসার ও সমাজ-বিস্মৃতা রাধার কৃষ্ণই একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। এর ফলে রাধা যে জগতে কলঙ্কিনী বলে ঘোষিত হয়েছেন, এই বাঁশীই তার একমাত্র কারণ। তাই বংশীকে রাধা নিদারুণ ধিক্কার দেন—

মরি মরি যাই শ্যাম বাঁশিয়া নগরে।
কুলছাড়া বাঁশীটি কলঙ্ক হৈল মোরে॥
নিতি নিতি ডাকে বাঁশী রহিতে নারি ঘরে।
মরমে সন্ধান দিয়ে হৃদয় বিদরে॥

যদিবা বাজয়ে বাঁশী না হও বিভল।
কুলবতীর কুলব্রত না করিও ভঙ্গ ॥
শাশুড়ী ক্ষুরের ধার ননদীর জ্বালা।
মরমের মরম ব্যথা নাহি জানে কালা ॥
নিরমল কুল ছিল তাহে দিলু' কালি।
হাতে তুলি মাথে নিলু' কলঙ্কের ডালি ॥

লক্ষণীয় যে, এখানে রাধা বাঁশী ও বাঁশরিয়া—দুয়ের প্রতি আক্ষেপ ব্যক্ত করেছেন। কেননা দুইয়ের প্রতিই তাঁর যত না বিকর্ষণ, ততোধিক আকর্ষণ বর্তমান। অই গভীর প্রেমের উপলব্ধি থেকে রাধা শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে উচ্চারণ করতে পারেন যে,—'মুরলী সরল হয়ে, বাঁকার মুখেতে রয়ে / শিখিয়াছে বাঁকার স্বভাব।' কখনো বা সখীকে সাবধান করে দেন যে, কানু অনুরাগে যেন সে কখনো মুগ্ধ না হয়। কালিয়া বরণ যদি ক্ষণমাত্র চোখে পড়ে, তাহলে—'ছাড়িয়া সকল কাজ / জাতি কুল শীল লাজ / মরিবে কালিয়া অনুরাগে।' আর তার ফলে অনুক্ষণ কালা নাম হবে জপমালা। কালার মোহিনী শক্তি নিরন্তর তাকে আকর্ষণ করে। আর তার পরিণাম হবে শ্রীমতীর মতই দুর্বিষহ বেদনা-ভারাক্রান্ত—

নিশি দিশি অনুক্ষণ প্রাণ করে উচাটন
বিরহ অনলে জ্বলে তনু।
ছাড়িলে ছাড়ন নয় পরিণাম কিবা হয়
কি মোহিনী জানে কালা কানু ॥

বলা বাহুল্য, কানুর প্রেমের গভীরতা এবং তাতে রাধার মজে যাওয়ার অভিজ্ঞতার কথাই সখীকে নিষেধ বাণীর মধ্যে দ্যোতিত হচ্ছে। কখনো-বা রাধা সখীকে অনুনয় করেন, কালাকে সে যেন তাঁর মর্মবেদনা বুঝিয়ে বলে। কেননা, এই বিশ্বজগতে রাধার একমাত্র অবলম্বন তো রসিকশেখর, অথচ নিঠুর প্রাণ কালিয়া নাগর। তাঁকে বুঝিয়ে বললে হয়তো তিনি শ্রীরাধার অন্তহীন বিরহ-বেদনার মর্ম উপলব্ধি করতে পারবেন। তাই—

তাহারে বুঝাও সই যাঁও তার লাগি।
ননদী বচনে যেন বুকে লাগে আগি ॥
কাহারে না কহি কথা থাকি দুখ বাসি।
ননদী দ্বিগুণ বাদী এ পোড়া পড়শী ॥
কাহারে কহিব দুখ যাব আমি কোথা।
কার সনে কব আমি কালা কানুর কথা ॥
যত দূরে যায় আঁখি তত দূরে যাব।
পিরীতি পরাণভাগী কোথা গেলে পাব ॥
তাহারে কহিব দুখ বিনয় করিয়া।
চণ্ডীদাস কহে তবে জুড়াইবে হিয়া ॥

শ্যামবন্ধুর পিরীতি শ্রীমতীকে পাগল করেছে। দিবস-রজনী তাঁর চিন্তাতেই শ্রীরাধা মগ্ন। তাঁর বাণী স্তব্ধ, চিত্তের অনল সদা প্রদীপ্ত। বক্র কুটিল প্রেমের কারণে তিনি কুলধর্ম, লোকলজ্জা—সব কিছুকে উপেক্ষা করেছেন। শ্রীমতীর মনে হয়, কানুর অনাদর অপেক্ষা মরণই তাঁর শ্রেয়। তাতে তাঁর দেহমনের জ্বালা নিবারিত হত, কিন্তু—'না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি কহিব।' শ্রীমতী সদা-সশঙ্কিত যে, কানুর প্রেম তিলমাত্র ক্ষণের জন্য হারালে তিনি সর্বস্বহারা হবেন। কারণ, কানুই ত'ার ধন, কানুই ত'ার প্রাণ। তাই কানুর প্রেম হারানোর সম্ভাবনায় বিচলিত হয়ে শ্রীরাধা একদিকে সীমাহীন বেদনায় ভেঙ্গে পড়েন, অন্যদিকে দুর্জয় প্রতিজ্ঞায় মেতে ওঠেন—

এই ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে।
না জানি কানুর প্রেম তিল জানি ছুটে॥
গড়ন ভাঙ্গিতে সই আছে কত খল।
ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে সে বড় বিরল॥
যথা তথা যাই আমি যত দুখ পাই।
চাঁদমুখে হাসি হেরি তিলেক জুড়াই॥
সে হেন ব'ধুরে মোর যেজন ভাঙ্গায়।
হাম নারী অবলার বধ লাগে তায়॥

শ্রীমতী বুঝেছেন, কালার প্রেমে যেমন সুখ, 'তেমনি দুঃখও আছে।' এ যেন—'বিষামৃত একত্র করিয়া।' কৃষ্ণকে ভাল না বেসে ত'ার উপায় নেই, আবার ভালোবাসার কালীদহে ডুব দিয়ে সহ্য করতে হয় অনাদর, উপেক্ষার বিষের জ্বালা। এ জ্বালা ত'াকে পেতে হবেই। আর তিনি যে কলঙ্কিনী বলে জগতে ঘোষিত হয়েছেন, তার জন্য তাঁর দুঃখ নেই, কিন্তু সখীদের সেই কলঙ্কের ভাগিনী তিনি করতে চান না। শ্রীমতীর সঙ্কল্প—

দেখিলে কলঙ্কীর মুখ কলঙ্ক হইবে।
এ জনার মুখ আর দেখিতে না হবে॥
ঘরে ফিরি যাও নিজ ধরম লইয়া।
দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া॥
কালা মানিকের মালা গাঁথি নিব গলে।
কানু-গুণ-যশ কানে পরিব কুণ্ডলে॥
কানু-অনুরাগ রাঙ্গা বসন পরিব।
কানুর কলঙ্ক ছাই অঙ্গেতে লেপিব॥
চণ্ডীদাস কহে কেন হইলা উদাস।
মরণের সাথী যেই সে কি ছাড়ে পাশ॥

আবার কখনও দূতীকে সম্বোধন করে শ্রীরাধা তাঁর মনের আক্ষেপ জ্ঞাপন করেন—

দিবস-রজনী গুণ গণি গণি
কি হৈল অন্তরে ব্যথা।

খলের বচনে পাতিয়া শ্রবণে
খাইনু আপন মাথা ॥
শুন শুন দূতী কি কহ মো প্রতি
বচন না লাগে ভাল।
সে হার পিরীতি ভাবিতে ভাবিতে
সোনার বরণ কাল ॥

যে নিঠুর কালা তাঁকে এত অনাদর ও উপেক্ষা করছে, তার জন্যই শ্রীরাধার মন উচাটন করে, তাঁকেই সদা মনে পড়ে। আর তাঁকে ভালোবেসেই শ্রীরাধার দুঃখের সীমা নেই—

হাম অভাগিনী পরের অধিনী
সকলি পরের বশে।
সদাই এমনি পুড়িছে পরাণী
ঠেকিয়া পিরীতি রসে ॥

শ্রীমতী যে তুষের আগুনের মত ধিকি ধিকি জ্বলে পুড়ে খান হয়ে যাচ্ছেন। এক একবার মনে হচ্ছে—'কেন বা পিরীতি কৈনু কানুর সনে।' 'কালা কানুর পিরীতি' তাঁর জীবনে তো বিষম ব্যাপার হয়ে উঠে। আহার-নিদ্রা ত্যক্ত, গৃহকর্ম বিষবৎ মনে হয়, দুর্জন ননদিনী ও শাশুড়ীর যন্ত্রণা, তবু—'আকাশ জুড়িয়া ফাঁদ যাইতে পথ নাই।' কানুপ্রেম-শেলে বিদ্ধ রাধার এখন গত্যন্তর তো কিছু নেই। রাধার মনে হয়, কালো কালার সঙ্গে তাঁর নবযৌবন, বৃন্দাবন বাস, কদম্বের তল, যমুনার জল, পরিহিত রত্নভূষণ, গিরি গোবর্ধন —সবই তাঁর পক্ষে কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেননা, এরা সকলেই তাঁকে কালার কথা মনে করিয়ে দেয়, কালার প্রতি তাঁর আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলে। শীতল মনে করে পাষাণ কোলে করলে পিরীতির অনল তাপে সে পাষাণও গলে যায়। যমুনা মিলনে বেড়ে যায় দেহমনের জ্বালা। চেষ্টা করেও তিনি কানুকে বিস্মৃত হতে পারছেন না—

যত নিবারিয়ে চিতে নিবার না যায় রে।
আন পথে যাই পদ কানু পথে ধায়রে ॥
এ ছার রসনা মোর হইল কি বাম।
যার নাম না লইব লয় তার নাম ॥
এ ছার নাসিকা মুই যত করি বন্ধ।
তবু তো দারুণ নাসা পায় শ্যাম গন্ধ ॥
তার কথা না শুনিব করি অনুমান।
পরসঙ্গ শুনিতে আপনি যায় কান ॥
ধিক রহু এ ছাড় ইন্দ্রিয় মোর সব।
সদা সে কালিয়া কানু হয় অনুভব ॥

কখনও-বা রাধা মনের দুঃখে পিরীতির প্রতি অভিমান করেন। সেই সঙ্গে তিনি এ-ও উপলব্ধি করেন যে, এর হাত থেকে তিনি নিস্তারও পাবেন না। ত্রিভুবনের সার এই

তিন অক্ষরের 'পিরীতি' শব্দটি ছাড়া রাধার তো আর কোন অবলম্বনই নেই। পিরীতি রসের সাগর, সকল সুখের আধার। অথচ রাধার দুঃখ যে সেই পিরীতিই তাঁর জীবনে নিদারুণ দুঃখ বহন করে এনেছে। তবু রাধা পিরীতির বিষম বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন, তার থেকে আর নিস্তার পাবেন না। তিনি মনে করেন—

পিরীতি নগরে বসতি করিব
পিরীতে বাঁধিব ঘর।
পিরীতি দেখিয়া পড়শী করিব
তা বিনে সকলি পর।

অন্যদিকে, পিরীতির বিষম অনলেও শ্রীরাধিকা নিরন্তর দগ্ধ হচ্ছেন। সেজন্য তাঁর আক্ষেপ বেদনা—

কানুর পিরীতি চন্দনের রীতি
ঘষিতে সৌরভময়।
ঘষিয়া আনিয়া হিয়ায় লইতে
দহন দ্বিগুণ হয়॥

কিন্তু রাধার মনে হয় যে, এর জন্য দায়ী তিনি স্বয়ং। পিরীতির জ্বালার কথা চিন্তা না করে তিনি সর্বস্ব সমর্পণ করে বসে আছেন। সুতরাং তিনি কাকে আর দোষ দেবেন, একমাত্র নিজেকে ছাড়া ?

সকলি আমার দোষ হে বন্ধু
সকলি আমার দোষ।
না জানিয়া যদি করেছি পিরীতি
কাহারে করিব রোষ॥

কিন্তু সুখের আশায়ই তো রাধা এই প্রেম-সরোবরে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। যাকে ভেবেছিলেন সুশীতল শান্তির সাগর, সেখানে মনে পেলেন গরলের প্রচণ্ড জ্বালা। রাধা অপযশের কালিমা পর্যন্ত সর্বাঙ্গে লেপন করতেও দ্বিধা করেন নি যাঁর জন্য, আজ সেই রসিক নাগর তাঁকে উপেক্ষা করে অন্যাসক্ত। শ্রীমতী এতে চরম বেদনায় ভেঙ্গে পড়লেন :

বন্ধুর লাগিয়া সব তেয়াগিনু
লোকে অপযশ কয়।
এ ধন আমার লয় আন জন
ইহা কি পরাণে সয়॥
সই, কত না রাখিব হিয়া।
আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার আঙিনা দিয়া॥
বন্ধুর হিয়া এমন করিল
না জানি সে জন কে।

আমার পরাণ যেমতি করিছে
তেমতি হউক সে ॥

বিশ্বসংসারে রাধা একটি মাত্র অভিশাপ খুঁজে পেলেন—'আমার পরাণ যেমতি করিছে তেমতি হউক সে।' এই উক্তির মধ্যেই রাধার অন্তরের একদিকে সুগভীর বেদনামন্থন ও নৈরাশ্যের নিদারুণ শূন্যতাবোধ, অন্যদিকে দয়িতের প্রতি সুগভীর ও ঐকান্তিক প্রেমের দিগন্তবিস্তারী বিকাশের চিত্রটি প্রকাশ পায়। আর শ্রীমতীর প্রেমের তুল্য অন্য কারো প্রেম হ'তে পারে না। শ্রীরাধার ঃ

কাল জল ঢালিতে সই কালা পড়ে মনে।
নিরবধি দেখি কালা শয়নে স্বপনে ॥
কাল কেশ এলাইয়া বেশ নাহি করি।
কাল অঞ্জন আমি নয়নে না পরি।

এ হেন রাধার দশা যেন স্রোতের শ্যাওলার মত। রাধা নিজেকে দোষারোপ করেন। এমন কোন ব্যথিত নেই, যার স্নেহচ্ছায়ায় রাধা নিরাপদ আশ্রয় যাচ্ঞা করতে পারেন। রাধার মনের দুঃখ বুঝবার কেউ নেই, সান্ত্বনা দেওয়ারও নেই কেউ। মরণেই বুঝি এ জ্বালার উপশম হ'তে পারে। রাধা ব্যথিত চিত্তে আবেদন জানান ঃ

তোমারে বুঝাই বঁধু তোমারে বুঝাই।
ডাকিয়া শুধায় মোরে হেন জন নাই ॥
অনুক্ষণ গৃহে মোরে গঞ্জয়ে সকলে।
নিশ্চয় জানিও মুঞি ভখিমু গরলে ॥
এ ছার পরাণে আর কিবা আছে সুখ।
মোর আগে দাঁড়াও তোমার দেখি চাঁদমুখ ॥
খাইতে সোয়াস্তি নাই নাহি টুটে ভুখ্।
কে মোর ব্যথিত আছে কারে কব দুখ ॥

শেষ পর্যন্ত রাধা সঙ্কল্প করলেন কালাতেই তিনি নিমগ্ন হবেন। কুল ত্যাগ করে অকুলের স্রোতে তিনি গা ভাসিয়েছেন, এখন কালিন্দীর সেই সর্বগ্রাসী কালো জল রাধাকে গ্রাস করে নিতে চায়। তার হাত থেকে অভাগী রাধার পরিত্রাণ নেই, আশ্চর্যের কথা, তিনি পরিত্রাণ চান-ও না। তিনি ঘোষণা করলেন ঃ

কানু সে জীবন জাতি প্রাণ ধন
দুখানি আঁখির তারা।
পরাণ অধিক হিয়ার পুতলি
নিমিখে নিমিখে হারা ॥
তোরা কুলবতী ভজ নিজপতি
যার যেবা মনে লয়।
ভাবিয়া দেখিনু শ্যাম বঁধু বিনে
আর কেহ মোর নয় ॥

শ্যাম-সন্নিকটেও তিনি স্পষ্টভাবে মনের কথা জানালেন। শ্যামহারা হয়ে তিনি কিছুতেই বাঁচতে পারবেন না। শ্যামকে নিয়েই তাঁর সুখ, শ্যামকে নিয়েই তাঁর দুঃখ, শ্যামই তাঁর সর্বস্ব। সেই নয়নপুত্তলিকে তিনি আঁচলে বেঁধে রাখবেন, নয়ন ভ'রে দেখে মানস-বাসনা সফল করবেন, তার চেয়েও বেশী, মনের মণিকুট্টিমে রত্ন-সিংহাসনে চিরদিনের জন্য বসিয়ে রাখবেন:

বন্ধু, আর কি ছাড়িয়া দিব।
হিয়ার মাঝারে যেখানে পরাণ
সেইখানে লঞা থোব ॥

(চণ্ডীদাসের আক্ষেপানুরাগের পদে তাঁর কবিকৃতিত্ব সমধিক প্রকাশিত হয়েছে। এই পর্যায়ের পদে একদিকে ভাবগভীর জীবনসত্য, অন্যদিকে লৌকিক ও সমাজচেতনার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। বস্তুত, চণ্ডীদাস অতি সাধারণ জীবনের সরল ভাষা ও সহজ উপমার সাহায্যে কৃষ্ণপ্রেমে আকণ্ঠ নিমজ্জিতা মহাভাবস্বরূপিণী রাই কমলিনীর অপরূপ সৌন্দর্য-সত্তাকে বর্ণান্বিত করেছেন। ফলে লৌকিক জীবনচেতনা এবং আধ্যাত্মিক ভাবব্যঞ্জন প্রকটিত হয়েছে। চণ্ডীদাসের রাধা প্রথম অবস্থায় গ্রামবাংলার গৃহস্থ ঘরের কুলবধূ, আর কৃষ্ণ, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে পরম পুরুষ হলেও, লৌকিক দৃষ্টিতে তো পরপুরুষ বটেই। চণ্ডীদাসের আক্ষেপানুরাগের পদে এই সমাজসচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। কুলবধূ রাধা কৃষ্ণের প্রেমে মগ্ন হয়েছেন। সংসারে ও সমাজে এজন্য তাঁর কলঙ্কের সীমা নেই। গৃহে অনবরত শাশুড়ী ও ননদীর গঞ্জনা সহ্য করতে হচ্ছে। রাধা যেন তাদের চোখের বালি। রাধার দেহে-মনে যেন ভাদ্রমাসে নষ্টচন্দ্র দেখার জন্য কলঙ্ক জুটেছে কপালে। এই ভাবটি রাধা নিম্ন ভাষায় বর্ণনা করেছেন—)

ভাদরে দেখিনু নট চাঁদে।
সেই হৈতে উঠে মোর কানু পরিবাদে।
কত আছে যুবতী গোকুলে।
কলঙ্ক কেবল লেখা আমার কপালে ॥
সোআমী ছায়াতে মারে বাড়ি।
তার আগে কথা কয় দারুণ শাশুড়ী।
ননদী দেখয়ে চোখের বালি।
শ্যামনাগর তোলাই সদাই পাড়ে গালি ॥
এ দুখে পাঁজর হৈল কাল।
ভাবিয়া দেখিনু এবে মরণ সে ভাল ॥

গৃহবধূ রাধা পল্লীবাংলার অন্য বউদের মতই পরাধীনী। সমাজের রক্ষণশীলতার কারণে ঘরের বাইরে তাঁর গমন দৃষ্টিকটু—'একে হাম পরাধীনী / তাহে কুলকামিনী / ঘর হৈতে আঙ্গিনা বিদেশ।' ফলে বাঁশীর আকর্ষণে তিনি যে পথে বের হয়েছেন, তাতে

আছে কলঙ্ক, আছে তর্জন-গর্জন—'কুল ছাড়া বাঁশীটি কলঙ্ক হৈল মোরে।' 'তোমারে জানিয়া মোর কলঙ্ক সাগর॥ পর্বতসমান কুলশীল তেয়াগিয়া। ঘরের বাহির হইলাম তোমার লাগিয়া॥' 'জগতরি কলঙ্ক রহল চিরদিন।' 'পিরীতি আঠা ননদীকাঁটা পড়শী হইল ফাঁসী॥', 'কুলবতীর কুলব্রত না করিও ভঙ্গ', 'নিরমল কুল ছিল তাহে দিলুঁ কালি। হাতে তুলি মাথে নিলুঁ কলঙ্কের ডালি॥' 'যেখানে সেখানে যাই সকল লোকের ঠাঁই কানাকানি শুনি এই কথা', 'শঙ্খ বণিকের করাত যেমন আসিতে যাইতে কাটে', 'পড়শী দুর্জন বলে কুবচন না যাব সে লোকপাড়া', 'বাহির না হই লোক চরচায় বিষ মিশাইল ঘরে',—এ জাতীয় অসংখ্য পংক্তিতে সমাজ ও সংসারে গৃহবধূ রাধার দুঃসহ অবস্থার চিত্র ধরা পড়েছে। কুলবধূ হয়ে পরপুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হলে কি নিদারুণ সমস্যায় পড়তে হয়, তা শ্রীরাধা বিলক্ষণ জানেন—'ভুলিনু পরের বোলে কুলটা হইলুঁ কুলে', অন্যদিকে সেই প্রেমানল তাঁকে অবিরত জ্বালায়—

কুলবতী হৈয়া কুলে দাঁড়াইয়া
যে ধনী পিরীতি করে।
তুষের অনল যেন সাজাইয়া
এমতি পুড়িয়া মরে॥

কলঙ্কী বলে খ্যাতা রাধার শয়ন ভোজন ত্যক্ত, আবার প্রেমিকের কাছেও যথোচিত সমাদর পাচ্ছেন না, ফলে—'ভাবিতে ভাবিতে ব্যাধি সান্ধাইল অন্তরে॥' আর সেজন্য অন্য গৃহবধূর মতই রাধার মনোভাব—

কোন্ বিধি সিরজিল কুলবতী নারী।
সদা পরাধীন ঘরে রহে একেশ্বরী॥
ধিক্ রহু হেন জন হয়ে প্রেম করে।
বৃথা সে জীবন রাখে তখনি না মরে॥
বড় ডাকে কথাটি কহিতে যে না পারে।
পরপুরুষেতে রতি ঘটে যেন তারে॥
এ ছার জীবনে মুই ঘুচাইনু আশ।

শেষ পর্যন্ত রাধা সমাজ, সংসারের সব বাধা তুচ্ছ করে কৃষ্ণপ্রেম পাশে নিজেকে সঁপে দিতে মনস্থ করেন—

তোরা কুলবতী ভজ নিজপতি
যার মনে যেবা লয়।
ভাবিয়া দেখিলুঁ শ্যামবন্ধু বিনে
আর মোর কেহ নয়॥

সমাজ-সচেতনতা আছে বলেই তা অতিক্রমের প্রশ্ন ওঠে। রাধা সেই শুরঃ অতিক্রম করে কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী হয়েছেন। এখানেই তাঁর প্রেমের অপার মহিমা।

॥ ৭ ॥

'নিবেদন' পর্যায়ে চণ্ডীদাসের রাধা নিজেকে পরিপূর্ণ ভাবে সমর্পিত করেছেন কৃষ্ণের পায়ে। এতদিন রাধার উক্তিতে ছিল কিছু আক্ষেপ, অভিমান, অভিযোগ। এখন অভিমানের রেশ কিছুটা লক্ষ্য করা গেলেও দেহ, মন, কুল, শীল সঁপে দেওয়ার মধ্যে রাধার নিশ্চিত বিশ্বাসই সূচিত হচ্ছে। প্রতি অণুপরমাণু দিয়ে যে কথা অনুভব করেছেন, মুক্তকণ্ঠে সে কথা রাধা আজ নিবেদন করছেন :

বঁধু, তুমি যে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি তোমারে সঁপেছি
কুলশীল জাতি মান ॥

—এই আত্মসমর্পণের মধ্যে কোন ফাঁকি নেই। পিরীতি-রসে জরোজরো তনুমন তিনি কৃষ্ণের পায়ে ঢেলে দিয়েছেন, বিধিবদ্ধ কোন ভজন-পূজন তাতে নেই। কিন্তু সচ্চিদানন্দ-রসঘন বিগ্রহ যেন সেই ঐকান্তিক প্রেমাকূতির প্রতি কৃপা করেন, কৃষ্ণ জন্মজন্মান্তর যেন প্রাণনাথ রূপে বিরাজ করেন।—

বঁধু কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি ॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া এক মন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী ॥

রাধার আজ আর কোন সন্দেহ, কোন দ্বিধা নেই। তিনি বুঝেছেন যে, 'ভাবিয়া দেখিনু প্রাণনাথ বিনে গতি যে নাহিক মোর ॥' ধন, জন, জীবন, যৌবন—রাধার নিজস্ব বলতে আর কিছু নেই, সব কিছু কৃষ্ণ-প্রেম-রসের সাগরে ডুবিয়ে দিয়েছেন। এখন কৃষ্ণই তাঁর গলার হার। রাধার মনেপ্রাণে কৃষ্ণই তাঁর পতি, কৃষ্ণই তাঁর গতি। এর জন্য রাধা বিশ্বসংসারে সতী, কিম্বা অসতী—কি বলে বিদিত হবেন, তা তিনি জানেন না। জানার জন্য তিলমাত্র আগ্রহ-ও তিনি মনে পোষণ করেন না। উচ্চকণ্ঠে রাধা ঘোষণা করেন :

কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।
বঁধু, তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ ॥

রাধা জানেন যে, কানুর পিরীতি চন্দনের রীতির মত, ঘর্ষণের মধ্য দিয়েই তার সৌরভ অধিকতর প্রস্ফুটিত হয়। সেই সৌরভে উন্মত্ত রাধার কাছে 'কানু সে জীবন জাতিপ্রাণধন ও দুটি আঁখির তারা।' সুতরাং সেই পরমপ্রিয় বলে যাঁকে জানেন, তাঁকে কিছু দেওয়ার

জন্য রাধার ঔৎসুক্য হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু কানুকে কিইবা তিনি দিতে পারেন? রাধার শ্রেষ্ঠধন কানু। এখন কানুকেই কানু ধন দান করবেন। এ বড় আশ্চর্যের কথা।

কি দিব কি দিব বঁধু মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি ॥
তুমি আমার প্রাণ বঁধু আমি হে তোমার।
তোমার ধন তোমারে দিতে ক্ষতি কি আমার ॥

ক্ষতি নেই, কিন্তু লাভ আছে। আর তা বহুগুণ বেশী। রাধা-প্রেমের ঐকান্তিকতা ও গভীরতা প্রকাশক এই উক্তি কত সহজ, সরল, অথচ অকৃত্রিম ভাবকল্পনার বাহন। রাধার এই অকৃত্রিম ও গভীরতম প্রেমের আকর্ষণে কৃষ্ণও মুগ্ধ। সেই চতুর-চূড়ামণি অবশেষে রাধার প্রেম-বেদনাকে নিজ অন্তরে অভিষিক্ত করে নেন :

রাই, তুমি যে আমার গতি।
তোমার কারণে রসতত্ত্ব লাগি
গোকুলে আমার স্থিতি ॥

॥ ৮ ॥

'মাথুর' রস পর্যায় নিয়ে চণ্ডীদাস বেশী পদ রচনা করেন নি। চণ্ডীদাসের রাধা পূর্বরাগ স্তর থেকেই তো অন্তহীন বিরহ-যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। মাথুর পর্যায়ে এসে সেই বেদনা-সমুদ্রে আরো কয়েক গণ্ডূষ জল মাত্র মিশেছে। তাই আক্ষেপানুরাগ পর্যায়ের বিরহ-বেদনা মাথুর পালায় প্রসারিত হয়েছে শুধু, তাও ব্যাপকভাবে নয়। বিরহের রেণু রেণু দিয়ে গড়া রাধা-হৃদয় মাথুরের স্তরে এসে যে গান গেয়েছেন, তাতেও রয়েছে আক্ষেপের সুর। রাধা আক্ষেপ করেছেন যে—

পিয়া গেল দূর দেশে হাম অভাগিনী।
শুনিতে না বাহিরায় এ পাপ পরাণ ॥
পরশ সোঙরি মোর সদা মন পুরে।
এমন গুণের নিধি লয়ে গেল পরে ॥

কখনো বা দূতীকে কৃষ্ণের কাছে পাঠিয়েছেন, তাঁর যন্ত্রণার খবর দিতে—

সখি কহিও তাহার পাশে।
যাহারে ছুঁইলে সিনান করিয়ে
সে মোরে দেখিলে হাসে ॥

কদম্বতলে, যমুনা তীরে বিহারস্মৃতি কৃষ্ণকে তিনি স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন। আর এই বিরহদশায় যদি, রাধার মৃত্যু হয়, তাহলে তার পাপ তো কৃষ্ণকেও স্পর্শ করবে—'যাহার লাগিয়ে / যেজন মরয়ে / সে বধ কাহারে লাগে।' কানু-সুখ-সায়র দৈবক্রমে শুকিয়ে গেছে, এটা রাধার দুর্ভাগ্য। এখন তো—'পিয়াসে পরাণ যায়।' আর এই বিরহ-জ্বালা

তিনি আর সহ্য করতে পারছেন না— 'বিরহ আগুন দহে শতগুণ সহন নাহিক যায়।' বস্তুত মাথুর পালায় রাধার বিরহ-বেদনা গভীরতম স্তরে এসে পৌঁছেছে।

॥ ৯ ॥

ভাবসম্মিলনের পর্যায়ে এসেও চণ্ডীদাসের রাধা দুঃখের স্মৃতি ভুলতে পারেন না। সেখানেও তাঁর কণ্ঠস্বর অনুচ্চ, আবেগরুদ্ধ। সামান্য দু'একটি কথা দিয়ে তিনি কৃষ্ণকে অভ্যর্থনা জানান। কৃষ্ণগত প্রাণ রাধা কৃষ্ণকে দেখে নিশ্চয়ই সুখ অনুভব করেছেন। কিন্তু তাঁর নিজের নীরব ব্যথার ক্ষতগুলিও যে রয়েছে, তাও আমাদের নজর এড়ায় না। কৃষ্ণকে হারিয়ে তাঁর অন্তহীন দুঃখ, তাঁকে পেয়েও তিনি উচ্ছ্বসিত নন।—

বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে। দুখিনীর দিন দুখেতে গেল।
দেখা না হইত পরাণ গেলে॥ মথুরা নগরে ছিলে ত ভাল॥
এতেক সহিল অবলা বলে। এ সব দুঃখ কিছু না গণি।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে॥ তোমার কুশলে কুশল মানি।

একটি মাত্র কথার দ্বারা রাধা তাঁর অন্তহীন বিরহ-বেদনার কথা দয়িতকে জানিয়ে দিলেন। তিনি সামান্য নারী। তবু যে দুস্তর বেদনা তিনি সহ্য করেছেন, তা কঠিন পাষাণের পক্ষেও সম্ভব নয়। কৃষ্ণসুখেই তাঁর সুখ। তাই প্রবাসে রাধাকে ছেড়ে কৃষ্ণ সুখে ছিলেন কিনা, এটাই তাঁর জিজ্ঞাস্য। কারণ—'তোমার কুশলে কুশল মানি।' এখন কৃষ্ণকে কাছে পেয়ে তাঁর সব দুঃখ দূর হল। অন্তহীন বিরহের মেঘ কেটে গিয়ে এখন রাধার মনের আকাশে চন্দ্রের উদ্ভাস হয়েছে ঠিকই, তবু আগেকার সেই বিষণ্ণ স্মৃতি রাধার মন থেকে সম্পূর্ণ অপসৃত হয়েছে, এমন নয়। হারানো রত্ন তিনি ফিরে পেয়েছেন। এখন তাঁর সুখবিধানের জন্যই যেন রাধার প্রবল আকাঙ্ক্ষা।

॥ ১০ ॥

চণ্ডীদাসের পদ আস্বাদন কালে পাঠকমনে স্বতঃই এই উপলব্ধি জাগে যে, তাঁর পদে লৌকিক ও আধ্যাত্মিক প্রেমের সংমিশ্রণ ঘটেছে। বস্তুত, বক্তব্যটি আপাত-দৃষ্টিতে স্বতোবিরুদ্ধ ভাবাপন্ন বলে মনে হতে পারে। কারণ লৌকিক ভাবের সীমাবদ্ধ জগতে যিনি আবদ্ধ, তিনি অলৌকিকের স্বর্গ-সুষমার সন্ধান দেবেন কি করে? কার্যত, চণ্ডীদাসের মহতী প্রতিভা এই অসম্ভবকে সম্ভব সীমা ও অসীমের দুই বেণীকে একই বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। চণ্ডীদাসের রাধা একদিকে সমাজভয়-ভীতা, গ্রাম্য কুলবধূ, অন্যদিকে মহাভাবস্বরূপিনী রাই কমলিনী। বৃষভানু নন্দিনী, অভিমন্যু ঘরণী রাধা কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হয়েছেন। কিন্তু পরপুরুষের প্রতি আসক্তিতে আছে লোক ও সমাজভয়, সংস্কারের বাধা। পল্লীবাংলার গৃহবধূ রাধা সেই বাধাবিঘ্নে বিচলিতা। আক্ষেপের সুরে তাঁর সেই হৃদয়-বেদনা শতধারে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে। তিনি আকুল কণ্ঠে আর্তনাদ করে ওঠেন—'এক জ্বালা গুরুজন আর জ্বালা কানু।'

জ্বালাতে জ্বলিল দে সারা হৈল তনু ॥/ কোথায় যাইব সই কি হবে উপায়।/ গরল সমান লাগে বচন হিয়ায় ॥/ কাহারে কহিব কেবা যাবে পরতীত।/ মরণ অধিক হৈল কানুর পিরীত ॥/ জারিলেক তনুমন কি করে ঔষধে।/ জগত ভরিল কাল কানু পরিবাদে ॥/ লোকমাঝে ঠাঁই নাই অপযশে দেশে / বাশুলী আদেশে কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥' এ পদে একদিকে রয়েছে সমাজভয়-ভীতা রমণীর দ্বিধা ও শঙ্কা, অন্যদিকে কানুপ্রেমের অমৃতদহে নিমজ্জিতা রাধার হৃদয়মন্থনজাত উপলব্ধির নিমন্ত্রিত মাধুর্য। শ্যামের পিরীতে মগ্ন রাধা স্বজন ও পরিজনের নিন্দাবিষে তো কম জর্জরিত হচ্ছেন না, অন্যদিকে শ্যামের বাঁশির ডাকের আকর্ষণও তো কম নয়। রাধার তাই অন্তর্জ্বালাঃ "মরি মরি যাই শ্যাম বাঁশিয়া নাগরে। কুল ছাড়া বাঁশীটি কলঙ্ক হৈল মোরে ॥ নিতি নিতি ডাকে বাঁশি রহিতে নারি ঘরে। মরমে সন্ধান দিয়ে হৃদয় বিদরে ॥ যদি বা বাজাবে বাঁশি না হও ত্রিভঙ্গ। কুলবতীর কুলব্রত না করিও ভঙ্গ ॥ শাশুড়ী শ্বশুরের ধার ননদীর জ্বালা। মরমের মরম ব্যথা নাহি জানে কালা ॥ নিরমল কুল ছিল তাহে দিলু কালি। হাথে তুলি মাথে নিলু কলঙ্কের ডালি।" লোকলজ্জা ও গঞ্জনার ভয়ে রাধা কানুপ্রেমে তাঁর হৃদয়ের উদ্বেলতার কথা কাউকে বলতে পারেন না—"ননদী বচনে যেন বুকে লাগে আগি ॥ কাহারে না কহি কথা থাকি দুখ বাসি। ননদী দ্বিগুণ বাদী এ পোড়া পড়শী ॥ কাহারে কহিব দুখ যাব আমি কোথা। কার সনে কব আমি কালা কানুর কথা।" ননদিনীর গঞ্জনা রাধার কপালে নিত্যই জোটে। আর তার কারণ তো রাধা নিজেই। কারণ গৃহবধূ হয়েও তিনি পরপুরুষ ভজনা করেন। গোপন প্রেম ধরা পড়ায় তাঁকেও তাই লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়। রাধা নিজেও জানেন—'একে হাম পরাধীনী তাহে কুল কামিনী ঘর হইতে আঙ্গিনা বিদেশ' তাই কুলবধূ হিসাবে তাঁর ভাগ্যে লাঞ্ছনা তো জুটবেই। সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা তিনি বিলাপের সুরে সখীদের জানান—'একদিন যাইতে সই ননদিনী সনে। শ্যাম বঁধুর কথা পড়ি গেল মনে ॥ ভাবে ভরল মন চলিতে না পারি। অবশ হইল তনু কাঁপে থরথরি ॥ কি করিব সখি সে হইল বড় দায়। ঠেকিনু বিপাকে আর না দেখি উপায় ॥ ননদী বোলয়ে হা লো কি না তোর হইল।' কুলবতী রাধা এর থেকেও আরো লজ্জাজনক পরিস্থিতিতে পড়েছিলেন। সে অভিজ্ঞতার কথাও তিনি শুনিয়েছেন সখীদের— "আজুক শয়নে ননদিনী সনে শুতিয়া আছিলু' সই। যে ছিল করমে বন্ধুর ভরমে মরম তোমারে কই ॥ নিন্দের আলসে বন্ধুর ধাধসে তাহারে করিনু কোরে। ননদী উঠিয়া বুঝিয়া বলিছে বন্ধুয়া পাইলি কারে ॥ এত টিটপনা জানে কোন্ জনা বুঝিনু তোহারি রীতি। কুলবতী হইয়া পরপতি লইয়া এমতি করহ নীতি ॥ যে শুনি শ্রবণে পরের বদনে নয়নে দেখিনু তাই। দাদা ঘরে আইলে করিব গোচরে থেনেক বিরাজ রাই ॥ নিঠুর বচনে কাঁপিছে পরাণে শুতিয়া রহিনু লাজে। ফিরাইয়া আঁখি সে গরবা থাকি সঘনে আমারে তাজে ॥ এক হাতে সখি কচালিয়ে আঁখি নয়নে দেখি যে আর। চণ্ডীদাস কয় কিবা কুলভয় কানুর পিরীতি যার ॥" শুধু গৃহজন, পরিজনের ভয়ই নয়, রাধার নিজের মধ্যেও দেখা দেয়

পল্লীবধূজনোচিত নানা ভয় ও সংস্কারের বাধা। কৃষ্ণের আহ্বানের উত্তরে রাধা সখীর মাধ্যমে খবর পাঠান—"কাহিও তাহার ঠাঁই / যেতে অবসর নাই / অফুরান হল গৃহকাজে। / শাশুড়ী সদাই ডাকে / ননদী প্রহরী থাকে / তাহার অধিক দ্বিজরাজে ॥ / সজনি কোপ করেন দুরন্ত। / গৃহকর্ম করি ছলে / বিপিনে যাইবার বেলে / আকাশে প্রকাশ ভেল চন্দ্র ॥ / ও কুলে বিচ্ছেদ ভয় / এ কুলে নহিলে নয়। সুসারিতে নিশি গেল আধা। / আসিয়া মদন সখা / হেন বেলে দিল দেখা / কহ দূতি কি করিবে রাধা ॥ / লোহার পিঞ্জরে থাকি / বাহির হতে চাহে পাখি / তার হৈল আকুল পরাণ। / দ্বিজ চণ্ডীদাস কয় / আর কি বিরহ সয় / তুরিতে মিলব বর কান ॥" একজন গৃহবধূ পরপুরুষের প্রতি আসক্ত হওয়ার ফলে তার জীবনে যে সঙ্কট দেখা দেয়, সেরূপ লৌকিক চিত্রও আমরা দেখি রাধিকার বয়ানে। 'কেনে কৈনু পিরীতির সাধ। / পিরীতি অঙ্কুর হৈতে / যত দুঃখ পাইনু চিতে / শুনিলে গণিবে পরমাদ। / মুঞি যদি জানিতুঁ এত / তবে কেন হব রত / না করিতুঁ হেন সব কাজ ॥ / ভুলিনু পরের বোলে / কুলটা হইলুঁ কুলে / জগত ভরিয়া রৈল লাজ ॥ / যখন পিরীতি কৈল / আনি চাঁদ হাতে দিল / পুনঃ তারে না পাই দেখিতে। কি করিতে কি না করি / ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি / অবশেষে প্রাণ চাহে নিতে ॥" কৃষ্ণকে দেখে রাধার হৃদয় মদনশরে জরোজরো হয়েছে। কিন্তু তাঁকে পাওয়ার পথে কত বাধা, সেতো একমাত্র রাধাই জানেন—'বেলি অবসানে / সখীর সহিতে / গেলুঁ যমুনার জলে। নয়ন হিলোলে / কিরূপ দেখিলুঁ / পরাণ চঞ্চল কৈলে ॥ সই একথা কহিব কারে। / সাপিনী দংশিল / বিষেতে ছাইল / তনু জরজর করে ॥ আপনার দুখ / আপনার অন্তরে / কেবা পরতীত যায়। শাশুড়ী ননদী / যদি কথা কহে / গরল লাগে হিয়ায় ॥ অঙ্গের আঙ্গিনী / সঙ্গের সাঙ্গিনী / সুখ দুখ সেহি জানে। চণ্ডীদাস কহে / দুখ জ্বালা যত / না যাবে কালিয়া বিনে ॥" এই আক্ষেপ— এ তো একান্তভাবেই লৌকিক প্রেমভাবনায় আচ্ছন্ন রাধা নাম্নী একজন রমণীর। আর সেই অনুষঙ্গেই আমরা রাধিকার প্রতি বড়ায়ির উক্তিকে একজন প্রাজ্ঞ ভাবনাময়ী বৃদ্ধার উপদেশ হিসাবে মেনে নেই।—'সোনার নাতিনী কেন / আইস যাও পুনঃ পুনঃ / না বুঝি তোমার অভিপ্রায়। / সদাই কাঁদনা দেখি / অঝর ঝরয়ে আঁখি / জাতিকুল সব পাছে যায় ॥ / যমুনার জলে যাও / কদমতলাতে চাও / না জানি দেখিলা কোন্ জনে। শ্যামবর্ণ দেবা তনু / উপমা নাহিক জনু / সে জন পৈসল বুঝি মনে ॥ / ঘরে আসি নাহি খাও / সদাই তাহারে চাও / বুঝিলাম তোর মন কথা। / এখনি শুনিলে ঘরে / কি বোল বলিবে তোরে / বাড়িয়া ভাঙ্গিবে তোর মাথা ॥ / একে তুমি কুলনারী / কুল আছে তোর বৈরী / আর তাহে বড়ুয়ার বধূ। / কহে বড়ু চণ্ডীদাসে / কুল শীল সব ভাসে / লাগিল কালিয়া প্রেম মধু ॥" কানু অভিসারে এসে আঙ্গিনার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। ঘন বর্ষণে চারিদিক জল থৈ থৈ। ঘন আঁধিয়ার। গৃহবধূ রাধা কৃষ্ণ সন্নিধানে যেতে না পারার জন্য মর্ম বেদনায় কাতর হয়ে পড়েছেন— "এ ঘোর রজনী / মেঘের ঘটা / কেমনে আইল বাটে। / আঙ্গিনার মাঝে / বঁধুয়া তিতিছে / দেখিয়া পরাণ ফাটে ॥" রাধার অবস্থা যেন পিঞ্জরাবদ্ধা পক্ষিনীর

ন্যায়।—'নিশ্বাস ছাড়িতে না দেয় ঘরের গৃহিণী।/ বাহিরে বাতাসে ফাঁদ পাতে ননদিনী॥"—এতো লৌকিক প্রেমের ক্ষেত্রে বাধা-বিঘ্নেরই চিত্র।

কিন্তু চণ্ডীদাসের পদে নিছক লৌকিক প্রেমেরই নয়, অলৌকিক প্রেমের চিত্রও বর্ণোজ্জ্বল রেখায় বিভূষিত হয়েছে। বস্তুত, লৌকিক থেকে অলৌকিক, সীমা থেকে অসীম, দেহ থেকে দেহোত্তীর্ণ জগতে উত্তরণের মধ্যেই চণ্ডীদাস বর্ণিত প্রেমের পরাকাষ্ঠা সূচিত হয়েছে। নিছক দেহের সীমায় আবদ্ধ যে প্রেম, চণ্ডীদাস তার কবি নন। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর বর্ণিত প্রেম লৌকিকের সীমাকে স্পর্শ করেছে সত্য, কিন্তু সেখানেই আবদ্ধ থাকে নি। বরং দেহোত্তীর্ণ প্রেমের আকৃতি, আধ্যাত্মিক প্রেমের স্বপ্ন-সুষমায় মণ্ডিত এক অলৌকিক জগতে যে কবি আমাদের নিয়ে যান, তার নাম দ্বিজ চণ্ডীদাস। আর সে কারণেই দেখি, পূর্বরাগ পর্যায়েই চণ্ডীদাসের রাধা মহাভাব-স্বরূপিনী, রাই কমলিনীর অলৌকিক তন্ময় অবস্থা, মহাযোগিনীরূপে তিনি কৃষ্ণের ধ্যানে নিমগ্ন। চণ্ডীদাস অনুপম চিত্রে রাধাপ্রেমের এই দুরবগাহ রহস্যের চিত্র অঙ্কিত করেছেন।—'রাধার কি হলো অন্তরে ব্যথা।/ বসিয়া বিরলে/ থাকায় একলে/ না শুনে কাহারো কথা॥/ সদাই ধেয়ানে/ চাহে মেঘ পানে/ না চলে নয়ান তারা।/ বিরতি আহারে/ রাঙ্গা বাস পরে/ যেমতি যোগিনী পারা॥/ এলাইয়া বেণী/ ফুলের গাথনি/ দেখয়ে খসায়ে চুলি।/ হসিত বয়ানে/ চাহে মেঘ পানে/ কি কহে দুহাত তুলি॥/ একদিঠ করি/ ময়ূর-ময়ূরী/ কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।/ চণ্ডীদাস কয়/ নব পরিচয়/ কালিয়া বঁধুর সনে॥' পূর্বরাগ পর্যায়ে আরো একটি পদ উল্লেখ করা যায় যেখানে, রাধা দিব্যোন্মাদ অবস্থায় উপনীত হয়ে একান্তভাবে কানুময় হয়ে পড়েছেন।—"একে কুলবতী ধনী তাহে সে অবলা। ঠেকিল বিষম প্রেমে কত স'বে জ্বালা॥ অকথন বেয়াধি এ কহন ন যায়। যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়॥ পায়ে ধরি কাঁদে সে চিকুর গড়ি যায়। সোনার পুতলি যে ভূমেতে লোটায়॥ পুছয়ে কানুর কথা ছল-ছল আঁখি। কোথায় দেখিলা শ্যাম কহ দেখি সখি॥ চণ্ডীদাস কহে কাঁদ কিসের লাগিয়া। সে কালা আছয়ে তার হৃদয়ে জাগিয়া॥" বস্তুত, চণ্ডীদাসের রাধা যেন মর্ত-পৃথিবীর কেউ নন। কৃষ্ণের ভাষায় 'অমৃত ছানিয়া' রাধা-দেহ নির্মিত, তিনি 'হৃদয়ে আছিল বেকত হইল দেখিতে পাইনু সে।' তাই পূর্বরাগ অবস্থা থেকেই রাধার প্রেম-ভাবনা আধ্যাত্মিক সুরের লক্ষ্যে নির্দেশিত। তাই কৃষ্ণনাম শ্রবণেই তিনি বিবশ, বিহ্বল, সচ্চিদানন্দ রসঘনবিগ্রহ পরমপুরুষ কৃষ্ণপ্রেমে তিনি তন্ময়। —"সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম। কানের ভিতর দিয়া/ মরমে পশিল গো/ আকুল করিল মোর প্রাণ॥/ না জানি কতেক মধু/ শ্যাম নামে আছে গো/ বদন ছাড়িতে নাহি পারে।/ জপিতে জপিতে নাম/ অবশ করিল গো/ কেমনে পাইব সই তারে॥/ নাম পরতাপে যার/ ঐছন করিল গো/ অঙ্গের পরশে কিবা হয়।/ যেখানে বসতি তার/ নয়নে দেখিয়া গো/ যুবতী ধরম কৈছে রয়॥/ পাসরিতে করি মনে/ পাসরা না যায় গো/ কি করিব কি হবে উপায়।/ কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে/ কুলবতী কুল নাশে/ আপনার যৌবন যাচায়॥" লৌকিকতার স্তর-অতিক্রান্তজনই শুধু বলতে পারে—'যেজন দেখিল

সে জন ভুলিল কি তার কুলবিচার।' রাধাকৃষ্ণের এই অলৌকিক প্রেমের তুলনা তো জগতে মেলে না। এ তো অনাদি, অনন্ত কালের বিরহকাতরতা জগদীশ্বরের প্রতি। তাঁর আহ্বান বাণী যে শুনতে পায়, সব বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে সে ছুটে চলে সেই পরম বাঞ্ছিতের উদ্দেশে। আর স্বরূপ শক্তি এবং তাঁরই সৃষ্ট হ্লাদিনী শক্তির অংশ শ্রীরাধার এই প্রেম একান্তভাবেই অধ্যাত্ম স্তরের ইংগিত দেয়। কবির কথায়—'এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি। পরাণে পরাণ বাঁধা আপনা আপনি॥ দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া। তিল আধ না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥ জল বিনু মীন জনু কবহু না জীয়ে। মানুষে এমন প্রেম কভু না শুনিয়ে॥" কৃষ্ণপ্রেমের আকর্ষণে রাধার আর গৃহকাজে মন নেই। বস্তুত, রাধার মন এখন কৃষ্ণের জন্য উন্মুখ। 'আর কৃষ্ণনিষ্ঠা তৃষ্ণাত্যাগ' এটাই তো প্রেমের অবস্থা। কৃষ্ণরতি এ অবস্থা থেকেই না না স্তর পার হয়ে মহাভাবের পর্যায়ে উপনীত হয়। রাধারও এই দশা। তাই গৃহভয়, লোকলজ্জা কোন কিছুতেই আর তাঁর ভয় নেই। রাধা এখন কুল ছেড়ে গোকুলের পথে পা দিতে চান— "মন মোর আর নাহি লাগে গৃহকাজে। নিশিদিন কাঁদি সই হাসি লোকলাজে॥ কালার লাগিয়া হাম হব বনবাসী। কালা নিল জাতিকুল প্রাণ নিল বাঁশী॥" এখন রাধার কানুই সর্বস্ব ধন। তাঁর নিরন্তর জপমালা—'ছাড়িলে না ছাড়ে সেহ / এমতি দারুণ নেহ / সদাই হিয়ার মাঝে জাগে॥'

বস্তুত, চণ্ডীদাসের রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা কোন মর্ত পৃথিবীর নয়, আধ্যাত্মিক সুষমামণ্ডিত অলৌকিকতার আস্বাদ পরিবাহী। লৌকিক স্তর এখানে আছে সত্য, কিন্তু আধ্যাত্মিক ইমারত গড়ে উঠেছে তার উপর। সেদিক থেকে দেখতে গেলে চণ্ডীদাসের পদ যথার্থই— "true to the kindred meaning of heaven and home."

॥ ১১ ॥

চণ্ডীদাস মূলত বিরহের কবি। পূর্বরাগ থেকে ভাবসম্মিলন পর্যন্ত বিনাস্ত তাঁর সব পদ বিরহের সুরে গড়া। বলা যায়, তাঁর কাব্যবীণায় একটি মাত্র সুরই বেজেছে—তা বিবহের, বিষাদের করুণ রাগিণী।। চণ্ডীদাসের রাই কমলিনী পূর্বরাগের স্তর থেকেই বিরহ ভাবনায় আকীর্ণ এক বিষাদময়ী প্রতিমা। পূর্বরাগ স্তরেই আমরা তাঁর এই বিষন্ন, মলিন অবস্থা দেখি।—

রাধা কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে না শুনে কাহারো কথা॥

নাম শোনা মাত্রই রাধা কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর। দর্শনে তো কথাই নেই। এখন তাঁর অবস্থা—'সাপিনী দংশিল বিষেতে ছাইল তনু জরজর করে।' শ্যামের দরশন, বংশীধ্বনি কিম্বা রূপগুণের কথা শ্রবণ করে রাধা শ্যামতৃষ্ণায় আকুল। গৃহধর্ম, লোকধর্ম, সমাজধর্ম তাঁর কাছে এখন তুচ্ছ। শ্যাম তাঁর একমাত্র আকর্ষণের বিষয়। শ্যামরূপ-গুণ 'পশিয়া মরমে ঘুচায়া ধরমে পরাণ সহিত টানে।' রাধা এখন অনন্যোপায়। এ যেন 'বিষম বাড়ব

আনল মাঝারে আমারে ডারিয়া দিল।' একদিকে গৃহকর্ম, অন্যদিকে শ্যামের পিরীতি,—'ও কুলে বিচ্ছেদ ভয় একুলে নহিলে নয়'—এমন বিষম অবস্থা। তবু রাধা কুল ছেড়ে গোকুলের অর্থাৎ শ্যামের উদ্দেশেই পথে বের হলেন। শ্যামের সঙ্গে মিলনে তাঁর দেহ-মন সুশীতল করবেন—এই বাসনা। কিন্তু কানুর দেখা নেই। সুতরাং—'পথপানে চাহি কত না রহিব কত প্রবোধিব মনে।' রাধা আকুল আর্তনাদ করে ওঠেন—

সই কেমনে ধরিব হিয়া।
আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার আঙ্গিনা দিয়া॥

এ মুহূর্তে রাধা অন্তহীন দুঃখের সাগরে নিমজ্জিত। গৃহ, পরিজন, সমাজ, পথ—সব বাধা অতিক্রম করে তিনি বাসরসজ্জিকার বেশে অপেক্ষা করে আছেন পরম দয়িতের জন্য। কিন্তু সে নিঠুর কালিয়া বন্ধু তাঁকে উপেক্ষা করে প্রতিনায়িকার কুঞ্জে গমন করেছেন। রাধার জীবনে এর থেকে বড় দুঃখ আর কি আছে? বেদনার কালিয়দহে হাবুডুবু খেতে খেতে রাধা শুধু একটি মাত্র অভিশাপ বাণী উচ্চারণ করতে পারলেন—

সে বঁধু কালিয়া না চায় ফিরিয়া
এমতি করিল কে।
আমার অন্তর যেমন করিছে
তেমনি হউক সে॥

'খণ্ডিতা' পর্যায়ে প্রেমবঞ্চিতা রাধাকে পুনরায় আমরা বিষাদঘন মূর্তিতে দেখি। যাঁর জন্য কলঙ্ক মাথায় নিয়ে ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়েছেন, সেই শ্যামনাগর তাঁকে উপেক্ষা করে অন্য নায়িকার কুঞ্জে নিশি যাপন করে প্রভাতে ভোগপঙ্কচিহ্ন অঙ্গে নিয়ে রাধার অঙ্গনে এসে উপস্থিত। চতুর চূড়ামণির এ হেন আচরণে রাধার হৃদয়ে ব্যথার সিঞ্চন। সেই বেদনা তীব্র শ্লেষাত্মক অভিমানের সুরে কৃষ্ণসমক্ষে উচ্চারণ করেছেন রাধা—

হেদে হে নিলাজ বঁধু লাজ নাহি বাস।
বিহানে পরের বাড়ী কোন লাজে আস॥
বুক মাঝে দেখি তোমার কঙ্কণের দাগ।
কোন্ কলাবতী আজি পেয়েছিল লাগ॥

আবার কৃষ্ণ-মিলন-তিয়াসে তাঁর অঙ্গনে এসে অপেক্ষমান হলেও রাধার দুঃখের সীমা থাকে না। তাঁরই প্রেমের কারণে শ্যাম অঝোর বর্ষণে এসে আঙ্গিনায় অপেক্ষা করে আছেন। রাধা এজন্য একদিকে পরম গৌরব অনুভব করেন, অন্যদিকে বন্ধুর কষ্ট পাওয়ার জন্য তিনি নিজেও নিদারুণ কষ্ট পান।—

এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইল বাটে।
আঙ্গিনার মাঝে বঁধুয়া তিতিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে॥

স্বজন ও সমাজভয়পীড়িতা শ্রীরাধা দয়িতের সঙ্গে নানা বাধা-বিপত্তির কারণে মিলতে না পারায় পরমা দুঃখিনী। এ পর্যায়েও সেই দুঃখের কালিমা শ্রীরাধাকে মলিন করে তুলেছে। আবার মিলন-মুহূর্তেও বিচ্ছেদভয় রাধাকে কাতর করে তোলে। 'রজনী প্রভাত হৈলে কাতর হিয়ায়। দেহ ছাড়ি যেন মোর প্রাণ চলি যায় ॥'

আক্ষেপানুরাগের পর্যায়ে রাধারানী প্রকৃতই বিরহের প্রতিমা। একদিকে শ্যামকে ভালোবাসার কারণে শাশুড়ী-ননদীর তাঁর প্রতি সন্দেহ, প্রতি মুহূর্তে গঞ্জনা লাভ, অন্যদিকে জীবনসর্বস্ব সেই শ্যামের নাগালও তিনি পান না। রাধার একি উভয়-সংকট! রাধা মনোদুঃখে ভেঙ্গে পড়েন। শ্রীমতীর মত নিঃস্ব, রিক্ত মানুষ এ জগতে আর কে আছে? রাধা আক্ষেপে বাঙ্ময় হয়ে ওঠেন। এ আক্ষেপ সখী, বাঁশি, পরিজন, শ্যামসুন্দরের প্রতি, এমন কি নিজের প্রতি। আক্ষেপানুরাগের পর্যায়েই চণ্ডীদাসের রাধার বিরহিনী মূর্তি সমধিক প্রকাশিত। বলা যায়, চণ্ডীদাসের রাধাসুন্দরী যেন আক্ষেপানুরাগের তিল তিল সৌন্দর্য দিয়ে গড়া বিষাদময়ী অথচ অপূর্বসুন্দরী মানসী-প্রতিমা। পরম বেদনায় তিনি শ্যামের চরণে নিবেদনের সুরে আক্ষেপ জানান—

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন ॥
ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর ॥
রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বন্ধু তোমার পিরীতি ॥
কোন বিধি সিরজিল সোতের শেওলি।
এমন ব্যথিত নাই ডাকে রাধা বলি ॥
বন্ধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও ॥

তবু শ্যামকে তিনি ছাড়তে পারবেন না। শ্যাম-প্রেমে তাঁর সুখ, আবার শ্যামের অনাদরে তিনি দুঃখে ম্রিয়মান। তবু অতি দুঃখের মধ্যেও রাধার স্পষ্ট উক্তি—

কানু যে জীবন জাতি প্রাণ ধন
ও দুটি আঁখির তারা।
পরাণ অধিক হিয়ার পুতলি
নিমিখে নিমিখে হারা ॥
তোরা কুলবতী ভজ নিজ পতি
যার যেবা মনে লয়।
ভাবিয়া দেখিনু শ্যাম বন্ধু বিনে
আর কেহ মোর নয় ॥

তাই—'শ্যাম অনুরাগে এ তনু বেচিনু তিলে তুলসী দিয়া।' আর এজন্যই তো শ্রীমতীকে নিদারুণ বিরহযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। পরাধীনা নারীর পরপুরুষকে সর্বস্ব মনে করা দুঃখবরণ করা ভিন্ন আর কি? তবু যদি দয়িতকে কাছে পেতেন তা হ'লে গৃহের গঞ্জনা, পড়শীর কলঙ্ক-লেপন-জ্বালা রাধা অনেকটা ভুলতে পারতেন। কিন্তু সেখানেও তাঁর মন্দভাগ্য—

হাম অভাগিনী পরের অধিনী
সকলি পরের বশে।
সদাই এমনি পুড়িছে পরাণী
ঠেকিয়া পিরীতি রসে॥

রাধার এই মর্মবেদনার স্বরূপ একমাত্র তিনিই জানেন। শ্যাম-পিরীতিরসে মগ্ন হয়ে তিনি অন্য সবকিছু ভুলে আছেন। অথচ শ্যামকে কাছে না পেয়ে তাঁর বিরহ-সন্তাপ তুষের আগুনের মত ধিকি ধিকি তাঁকে দগ্ধ করছে। শ্রীমতী ঠিক করলেন, এই জ্বালা থেকে নিবৃত্তির উপায় শ্যামকে ভুলে যাওয়া। কিন্তু চাইলেই কি আর ভোলা যায়? যত ভুলতে চান, তত বেশী তাঁর শ্যামের কথা মনে পড়ে যায়। আসল কথা, অনুরাগ গাঢ় ও গভীর হলে এমনটা হয়। ফলে এ যন্ত্রণার হাত থেকে শ্রীমতীর অব্যাহতি নেই।—

যত নিবারিয়ে চাই নিবার না যায় রে।
আন পথে যাই পদ কানু পথে ধায় রে॥
এ ছাড় রসনা মোর হইল কি বাম।
যার নাম না লইব লয় তার নাম॥
এ ছার নাসিকা মুই যত করি বন্ধ।
তবু তো দারুণ নাসা পায় শ্যাম গন্ধ॥
তার কথা না শুনিব করি অনুমান।
পরসঙ্গ শুনিতে আপনি যায় কান॥
ধিক্ রহু এ ছাড় ইন্দ্রিয় মোর সব।
সদা সে কালিয়া কানু হয় অনুভব॥

কখনও আবার পিরীতি করেছেন বলে শ্রীমতীর মনে অনুশোচনা জাগে—

কোন্ বিধি সিরজিল কুলবতী নারী।
সদা পরাধীন ঘরে রহে একেশ্বরী॥
ধিক্ রহু হেন জন হয়ে প্রেম করে।
বৃথা সে জীবন রাখে তখনি না মরে॥

কিন্তু এমন বিপর্যয় যে জীবনে আসতে পারে, শ্রীমতী তো তা জানতেন না। সেই সে চিকন কালিয়ার এমন নিঠুর ব্যবহার, তা তিনি জানবেন কেমন করে? শ্রীমতীর মনে হচ্ছে, পিরীতিরসে মগ্ন না হলেই বুঝি ভালো করতেন। শ্রীমতী বিরহ-বেদনায় ডুকরে কেঁদে ওঠেন—

সুখের লাগিয়া পিরীতি করিনু
শ্যাম বঁধুয়ার সনে।
পরিণামে এত দুখ হবে বলি
কোন্ অভাগিনী জানে॥

'মাথুর' পর্যায়ে এসে সেই বেদনা আরো উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। কঠিন কর্তব্যের আহ্বানে শ্যাম বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরায় গেছেন। শ্রীমতী চিরকালের মত তাঁকে হারালেন। ঐশ্বর্যের মথুরাভূমি থেকে মাধুর্যের বনভূমিতে কৃষ্ণ আর কোনদিন ফিরে আসেন নি, ফিরে আসা সম্ভবও নয়। অভাগিনী রাধার এখন—'সোঙরি কারণে মোর সদা মন ঝুরে।'

'ভাবসম্মিলন' পর্যায়ে এসে রাধাকৃষ্ণের মানস মিলন ঘটেছে। কিন্তু সেখানেও দেখি রাধার হৃদয়ে অন্তহীন বিষাদের সুর। মিলনের পরম মুহূর্তেও চণ্ডীদাসের রাধার মনে পড়ছে গত বিরহের মর্মান্তিক উপলব্ধি—'এতেক সহিল অবলা বলে। ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে॥' মিলন মুহূর্তে বিষাদের আবেগ মিলনের আনন্দঘনতাকে নিঃসন্দেহে তরল করে দেয়।

বস্তুত, চণ্ডীদাসের সমগ্র জগৎ ছেয়ে আছে রাধাবিরহের সুতীব্র যন্ত্রণার নিদারুণ প্রতিচ্ছবি। বিরহের কবি চণ্ডীদাসের কবি-চৈতন্যের এটাই স্বরূপ।

বিদ্যাপতি

॥ ১ ॥

বাংলাদেশে বিদ্যাপতির প্রধান পরিচয় রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদকর্তা হিসাবে। কিন্তু বিদ্যাপতির আরো একটি পরিচয় আছে, সে পরিচয় যদিও কোন অংশে গৌণ নয়, তা হ'ল বিদ্যাপতির পাণ্ডিত্যের ব্যাপক ও নিরঙ্কুশ পরিচয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র দিকে ছিল তাঁর সদাজাগ্রত কৌতূহল। কীর্তিলতা, ভূ-পরিক্রমা, লিখনাবলী, দান বাক্যাবলী, দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী—ইত্যাদি গ্রন্থ তাঁর বিচিত্রমুখীন্ প্রতিভার উল্লেখযোগ্য পরিচয়।

॥ ২ ॥

কিন্তু প্রশ্ন ওঠে: বাঙালী নন এবং বাঙলা ভাষায়ও সাহিত্য রচনা করেন নি, এমন কবিকে আমরা বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে সাদরে অত উঁচু আসন দিয়েছি কেন? কবি সার্বভৌম ও মহাজন বলেই বা তাঁকে আমরা নিত্য শ্রদ্ধা জানাই কেন? উত্তরে বলা যায় যে, বিদ্যাপতির বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অন্তর্ভুক্তির কারণ অনেক। প্রথমত, তৎকালীন মিথিলা ও বাংলার মধ্যে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ভাবাতাত্ত্বিক ঐক্য বর্তমান ছিল; দ্বিতীয়ত, তৎকালীন মিথিলা ও বাংলা—উভয়েই ছিল সংস্কৃতচর্চার পীঠস্থান। সে কারণে মিথিলার ছাত্র বাংলায় এবং বাংলার ছাত্র মিথিলায় গমনাগমন করতেন। ফলে উভয়

দেশের মধ্যে একটি আত্মিক যোগ গড়ে ওঠে। তৃতীয়ত, শ্রীচৈতন্যদেব বিদ্যাপতির পদাবলী আস্বাদন করে পরম আনন্দলাভ করতেন; চতুর্থত, মহাপ্রভুর প্রদর্শিত পথে পরচৈতন্য যুগে বৈষ্ণব সাধক ও রসজ্ঞগণ কর্তৃক বিদ্যাপতি পদাবলীর আস্বাদন; পঞ্চমত, বাঙালী কবি, বিশেষ করে গোবিন্দদাস, বিদ্যাপতিকে অনুসরণ ও অনুকরণ করে পদ রচনা করেন। এ কারণে গোবিন্দ 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' নামে অভিহিত হয়ে থাকেন। বস্তুত, বাংলাদেশে বিদ্যাপতি-পদাবলীর নবজন্ম হয়েছে। বিদ্যাপতির পদাবলী যে বাঙালীর আন্তর-নৈকট্য লাভ করেছিল, তার একটি কারণ: বিদ্যাপতির পদাবলী ছিল মধুর রসের; আর বাঙালী রসিকচিত্তের প্রবণতা এই মধুর রসের প্রতিই। লক্ষ্য করতে হবে যে, বিদ্যাপতির বাংলাদেশে আদর তাঁর রচিত রাধাকৃষ্ণ পদাবলীর জন্য, আর তাঁর জন্মভূমি মিথিলায় তিনি নন্দিত তাঁর হরগৌরীবিষয়ক পদ ও অন্যান্য গ্রন্থাবলীর জন্য। বাংলাদেশে যেখানে বৈষ্ণবধর্মে 'কান্তাপ্রেম সর্বসাধ্যসার' এবং 'রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি', সেখানে মধুর রসের বাণ্ময় আলেখ্যকার বিদ্যাপতি যে কেন বন্দিত হবেন, তা সহজেই অনুমেয়।

॥ ৩ ॥

বিদ্যাপতির ধর্মমত নিয়ে পণ্ডিত মহলে বিতর্কের অন্ত নেই। একদল পণ্ডিত বলেন, তিনি পঞ্চোপাসক হিন্দু ছিলেন। গণেশ, সূর্য, শিব, বিষ্ণু, দুর্গা—এই পঞ্চদেবতার উপাসনা করতেন তিনি। তাছাড়া তিনি ছিলেন স্মার্ত। স্মার্ত-পণ্ডিত বিদ্যাপতি হঠাৎ রাধাকৃষ্ণের পদ লিখতে গেলেন কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে এঁদের যুক্তি: বিদ্যাপতির অন্তরের শিল্পচেতনা তাঁকে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বনে রসকাব্য রচনায় প্রবৃত্ত করেছিল। কোন ধর্মচেতনার দ্বারা আবিষ্ট হ'য়ে নয়, লৌকিক প্রেমচেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ বিদ্যাপতি রাধাকৃষ্ণলীলারসাত্মক পদ রচনা ক'রে তাঁর কবি-প্রতিভারই বিজয় বৈজয়ন্তী উড়িয়েছেন। আর এই প্রেমকাব্য রচনার পটভূমি হিসাবে তিনি পেয়েছিলেন রাজসভা-পরিপুষ্ট এক নাগরসভ্যতার পক্ষপুটে আশ্রয়—উগ্র বিলাসকলাকুতূহল উচ্ছলতায় পূর্ণ জীবনের বৈদগ্ধসমাকীর্ণ মদিরতার নিবিড় স্পর্শ। তাকে আশ্রয় করেই বিদ্যাপতি রচনা করেছেন রাধাকৃষ্ণ পদাবলী—নামান্তরে মর্তপ্রেমের আকর্ষণে যৌবন-বিহ্বলা এক নারীর দেহ-দেউলে প্রেম-আরতির বাণ্ময় রসমন্দির আলেখ্য।

অন্যমতে, "তাঁহার স্বহস্তলিখিত ভাগবতখানি তাঁহার বৈষ্ণব ধর্মে প্রীতির সাক্ষী,—তাঁহার রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় পদাবলী ভক্তির সরস উৎস।......তিনি বাহিরে যাহাই থাকুন, তাঁহার হৃদয়টি বৈষ্ণব ধর্মের অনুকূলে ছিল, একথা বোধ হয় দ্বিধাশূন্য হইয়া বলা যাইতে পারে।" (দীনেশচন্দ্র সেন)

স-যুক্তি বিচারে দ্বিতীয় মতটিকে একেবারে অস্বীকার করা চলে না। 'ভাগবত' মহাগ্রন্থখানি কবি তাঁর অমূল্য সময় নষ্ট করে স্বহস্তে শুধু শ্রদ্ধাবশেই লিখেছিলেন, এ অনুমান আমরা অবশ্যই করতে পারি। আর রাধাকৃষ্ণপদাবলী তিনি রচনা করেছিলেন, ভক্তির বশে নয়, নিছক কবিপ্রেরণার বশে, এ যুক্তিও যথেষ্ট গ্রহণসহ কিনা, পণ্ডিতমহল তা

বিচার করবেন। 'আমাদের বিশ্বাস, বৈষ্ণবচেতনা কবির মনে বর্তমান ছিল। নিছক কবিপ্রেরণা হ'লে একই বিষয়ে কবি এত পদ রচনা করতেন কিনা সন্দেহ। কেন না, এটি ধ্রুব সত্য যে, কবিরা সর্বদাই বিষয়ান্তরের অভিলাষী। একই বিষয়ে কবিতা রচনা করে তাঁরা পরিতৃপ্ত থাকতে পারেন না, অন্তত, বিদ্যাপতির মতো শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভা তো নয়ই। রাধাকৃষ্ণলীলাতত্ত্ব এর আগেই প্রচলিত ছিল সাধারণের মধ্যে। প্রাক্-চৈতন্যযুগেও বঙ্গদেশ এবং মিথিলা, ওড়িষ্যা ও আসাম সহ সমগ্র পূর্ব ভারতে বৈষ্ণবধর্ম ও সাধনার বিশেষ প্রচলন ছিল, তা জানা যায়।' ভাগবতের লীলাতত্ত্ব কবির জানা ছিল। জয়দেবের গীতগোবিন্দ বিষয়েও পণ্ডিত-কবি অবহিত ছিলেন বলে মনে হয়। এছাড়া কবির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক রাজা ভৈরব সিংহ বৈষ্ণব ছিলেন। তাই পরম বৈষ্ণব-রাজা ভৈরব সিংহের আশ্রিত বিদ্যাপতির উপর তাঁর প্রভাব পড়াই স্বাভাবিক। সুতরাং নিছক ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিতে প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার কামলীলা-চিত্র কবি অঙ্কিত করেছেন, এ ধরনের মতবাদ কবির প্রতি নিরপেক্ষ বিচার-প্রসূত নয় বলে মনে হয়। বিদ্যাপতি প্রায় আটশত পদ রচনা করেছেন বলে গবেষক মহলের ধারণা। এই আটশতের মধ্যে পাঁচশত পদ রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক বলে স্পষ্ট উল্লিখিত। দুইশত পদে রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ না থাকলেও সেই চেতনা উপলব্ধি করা যায়। আর বাকি একশত কবিতা অন্যান্য বিষয়ক। সুতরাং, স্পষ্টই অনুমান করা যায় যে, বৈষ্ণবীয় ভক্তিচেতনা বিদ্যাপতির মানসলোকে বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল ; আর সেই চেতনা বশেই কবি রাধাকৃষ্ণের পদ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কবি রাধাকৃষ্ণের রূপকে প্রাকৃত কামলীলার চিত্র এঁকেছেন, প্রতিবাদীর এ-যুক্তির উত্তরে বলা যায় যে, তাহলে রসপর্যায়ের ক্ষেত্রে পরিপাট্য বজায় থাকত বলে মনে হয় না। সত্য বটে, রাধাকৃষ্ণলীলার রসতাত্ত্বিক পর্যায়ের বিন্যাস গৌড়ীয় বৈষ্ণবরসাদর্শ বিশেষ ভাবে ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বল নীলমণির অনুসরণে গড়ে উঠেছে, প্রাক্চৈতন্য যুগে এ ধরনের সুনির্দিষ্ট মাপকাঠি তেমন ছিল না। কিন্তু রাধা ও কৃষ্ণের মিলন-বিরহের, প্রেমের আকর্ষণ-বিকর্ষণের মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিচিত্র বর্ণবৈভবের উজ্জ্বল উদাহরণ যে বৈষ্ণব পদাবলী, তার মধ্যে রসবিন্যাসে পারম্পর্য তো অনুপস্থিত ছিল না, শুধু গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসাদর্শে সেগুলি ক্রমান্বিত করা হয়েছে মাত্র। বিভিন্ন ভাব ও রসাশ্রিত পদ পরবর্তীকালে যেমন রচিত হয়েছে, তেমনি চৈতন্য পূর্ববর্তীকালের পদগুলি বিন্যস্ত করা হয়েছে মাত্র। আর রাধাকৃষ্ণের লীলা-বৈচিত্র্যের বিভিন্ন রসপর্যায়ের অনুসরণে বিদ্যাপতি প্রাকৃত কামলীলার চিত্র এঁকেছেন, এমন কষ্ট কল্পনা না করলেই বোধ হয় বিদ্যাপতির প্রতি সুবিচার করা হবে।

এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলা আবশ্যক। বৈষ্ণব ধর্মের কথা উঠলেই আমাদের মনে পড়ে পরচৈতন্য যুগের বৈষ্ণব ধর্মের কথা। সেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মাপকাঠিতে আমরা বিদ্যাপতির কবিতার রসমূল্য বিচার করতে বসি। কিন্তু এ প্রচেষ্টাও ভ্রমাত্মক। চৈতন্যোত্তর যুগের মত প্রাক্-চৈতন্য যুগে বাংলার বৈষ্ণবধর্মে কোন সুস্পষ্ট সম্প্রদায়গত ভাবনা ছিল বলে জানা যায় না। এ যুগে বৈষ্ণবধর্ম-ভাবনা ছিল অনেকটা স্ব স্ব 'অনুভূতির লালিত জগতে।৮

চৈতন্য সংস্কৃতির কূলপ্লাবনী বন্যার দ্বারা অদৌ প্লাবিত না হয়েও রাধাকৃষ্ণের লীলামাধুর্যকে বাঙ্ময়রূপ দিয়েছেন যাঁরা, মহাকবি বিদ্যাপতি তাঁদের অন্যতম। অন্য দু'জন — বড়ু চণ্ডীদাস ও জয়দেব। সুতরাং গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের মানদণ্ডে বিদ্যাপতির পদের রসবিচারে অনেক অসামঞ্জস্য দেখা দেওয়া সম্ভব। যেমন তাঁর প্রার্থনার পদগুলিতে বৈষ্ণবধর্মবিরোধী আকৃতি। প্রাক্-চৈতন্য যুগে বৈষ্ণবের মুক্তিবাঞ্ছা তো একেবারে অপাংক্তেয় ছিল বলে জানা যায় না। আমাদের বক্তব্য: বিদ্যাপতির মানসে বৈষ্ণবচেতনা ছিল। তবে তা প্রাক্‌চৈতন্য যুগোপযোগী যতটা থাকা সম্ভব, ততটাই। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে বাংলার বৈষ্ণব ভাব ও ভাবনার ক্ষেত্রে এক প্রবল পরিবর্তন সূচিত হল। শ্রীচৈতন্যর প্রেমানুভূতির প্রত্যক্ষ যে দৃষ্টান্ত, তা রাধাকৃষ্ণলীলা বৈচিত্র্যের। এতদিন যা ছিল তথ্য ও তত্ত্বমাত্র, মহাপ্রভুর দিব্যজীবন বিভা তাকে প্রত্যক্ষীভূত করে তুলল। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের গ্রাণাইট পাথরের উপরে গড়ে উঠল বৈষ্ণবরসতত্ত্বের সুদৃশ্য ইমারত। সেই প্রাসাদের কত না সুসজ্জিত কক্ষ, সুদৃশ্য খিলান। কিন্তু এর দ্বারা বৈষ্ণবধর্মের পূর্ববর্তী ইমারতটি তো আর ত্যক্ত হল না। বস্তুত, সেই ইমারতকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠল সংস্কার ও নব-নির্মাণের কাজ। বিদ্যাপতির পদাবলী সেই পূর্বতন অপরূপ ইমারত মাত্র। বস্তুত, বৈষ্ণবলীলা আস্বাদনের জন্য তাঁর সৃষ্ট পদাবলীও এক প্রধান অবলম্বন— একথাও অনস্বীকার্য।

তবে একথা স্বীকার করতে হবে যে, বিদ্যাপতির মনোভঙ্গির উপরিতলে ছাপ পড়েছিল অন্য সংস্কার, অন্য সংস্কৃতির। এই অন্য সংস্কার, অন্য সংস্কৃতির অর্থে রাজসভার আভিজাত শিক্ষাদীক্ষা ও মানস-পরিবেশের কথা বলছি। যে ব্রাহ্মণ বংশে বিদ্যাপতির জন্ম, সে বংশ কয়েক পুরুষ ধরে ছিল মিথিলার রাজবংশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বিদ্যাপতির ঊর্ধ্বতন সাত পুরুষের প্রথম চারি পুরুষ মিথিলার রাজসভার উচ্চপদ অধিকার করেছিলেন। কিন্তু বিদ্যাপতির প্র-পিতামহ বেছে নেন শাস্ত্রচর্চা ও যাজনিক ক্রিয়ার পথ। পরবর্তী পুরুষদের সকলেরই কোন-না-কোন সূত্রে মিথিলার রাজবংশের সঙ্গে যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল। এরই উত্তরাধিকার সূত্রে বিদ্যাপতিও পেয়েছিলেন মিথিলার রাজবংশের সৌহার্দ্য ও আশ্রয়। শৈশব থেকেই তাই বিদ্যাপতি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়েছিলেন রাজসভাপুষ্ট বর্ণোজ্জ্বল নাগরিক জীবন-পরিবেশের সঙ্গে। সেখানকার বিলাস-কলা-কুতূহল জীবনের ফেনিলোচ্ছলতা তাঁর মনেও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। ফলে কবি উৎসাহিত হয়েছিলেন নাগর বৈদগ্ধ্য, মার্জিত নৈপুণ্য এবং প্রভূত পাণ্ডিত্য আয়ত্ত করে নিজের ব্যক্তিত্বকে শাণিত করে তুলতে। ব্যক্তিগত জীবনে কবি আপন প্রতিভার ছটায় আকৃষ্ট ছ'জন রাজা এবং একজন রাণীর অনুগ্রহ পেয়েছিলেন। এই সকল আশ্রয়দাতার আদেশে এবং রসিকজনের মনোরঞ্জনের জন্যও তাঁকে অনেক পদ রচনা করতে হয়েছিল, যেমন হয়েছিল, অন্যান্য গ্রন্থসমূহ রচনা করতে। ফলে বিদগ্ধ নাগর মনের উপযোগী করে যে পদ রচিত, তাতে উজ্জ্বলতা থাকা স্বাভাবিক—সে দেহের উজ্জ্বলতা, মনের উজ্জ্বলতা। কারণ বিদ্যাপতি তো নিছক কবি-ই ছিলেন না, বিরাট পণ্ডিতও ছিলেন। বিবিধ বিষয়ে

তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থাদিই তার বড় প্রমাণ। তাছাড়া তিনি ছিলেন রাজসভার কবি। রাজসভার কবিদেরও নাগর বৈদগ্ধ্য, বাক্ ও বুদ্ধির চতুরালি অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্য একান্ত প্রয়োজন। পরন্তু যাঁদের জন্য কাব্য-কবিতা রচিত, তাঁদের ক্ষেত্রেও হৃদয়ের সুরের অভাব। সেখানে দরকার বৈদগ্ধ্য, বোধ ও বুদ্ধির ঝিলিক। বিদ্যাপতির পক্ষে তাই হৃদয়ের সুরে কথা বলা সম্ভব ছিল না—বৈদগ্ধ্যের আতশবাজি দিয়েই তাঁকে প্রাথমিক ক্ষেত্রে পাঠকের চোখ ধাঁধিয়ে দিতে হয়েছিল। আলঙ্কারিক মণ্ডনকলাই বিদ্যাপতিকে সেজন্য অবলম্বন করতে হয়েছিল। এখানেই চণ্ডীদাসের সঙ্গে তাঁর দুস্তর পার্থক্য। কিন্তু বিদ্যাপতির কৃতিত্ব এখানেই যে, আদিরসের দুস্তর পঙ্কিল-পঙ্কে রাধাহৃদয় যে কমলদল মেলেছিল, তার নিরুপম সৌন্দর্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তাঁর কাব্যকলায়। এটা সম্ভব হয়েছিল, একদিকে বিদ্যাপতির চেতনমনে বৈষ্ণবতা বজায় ছিল, অন্যদিকে কবির দায়িত্ব তিনি বিস্মৃত হননি বলে। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে ভারতচন্দ্রের কথা। ভারতচন্দ্রও ছিলেন রাজসভার কবি। তদানীন্তন ক্ষয়িষ্ণু, বিক্ষিপ্ত ও বিকৃত রুচিময় কৃষ্ণনগর রাজসভার তিনি ছিলেন প্রাণপুরুষ। তিনি আশ্রয়দাতার নির্দেশে এবং যুগরুচির তাগিদে বাক্ ও বুদ্ধির চতুরালির দ্বারা বিদ্যাসুন্দরের গোপন প্রণয়ের ঝরোকা উন্মোচিত করেছেন। নাগর-বৈদগ্ধ্য সেখানেও উপস্থিত। ভারতচন্দ্র তাঁর বৈদগ্ধ্যের আতশবাজিতে পাঠকের চোখ ধাঁধিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। ভাব-নিবিড়তা অপেক্ষা বিন্যস্ত চাতুরির জৌলুস ভারতচন্দ্রের কবিজীবনকে প্রায় সর্বাংশে প্রভাবিত করেছিল। বাগবৈদগ্ধ্য ও ছন্দোকুশলতার বুদ্ধিগম্য পথেই তাঁর কাব্যলক্ষ্মীর আনাগোনা। এছাড়া চিত্রধর্ম ভারতচন্দ্রের কাব্যের অন্যতম গুণ। ধ্বনির দ্বারা চিত্র রচনার প্রতিভা ভারতচন্দ্রের কবি-কুশলতার পরিচায়ক। অন্যদিকে বিদ্যাপতির কাব্যেরও অন্যতম গুণ চিত্রধর্মিতা। তবে তাঁর কাব্যের চিত্রধর্ম অনেক অংশেই চিত্তধর্মে পরিণতি লাভ করেছে। বিদ্যাপতির মনোভঙ্গি ও লিপিকুশলতা ভারতচন্দ্র যেন উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন।

বিদ্যাপতির পদে দেহধর্মের প্রতি যে আকর্ষণ, তা এই রাজসভা-পরিবেশ-সঞ্জাত। বিশেষ কোন সম্প্রদায়গত প্রভাব তাঁর উপর পড়লে ফলাফল কি হত বলা যায় না। সে সম্ভাব্য ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করে লাভও নেই। বিদ্যাপতির কৃষ্ণভক্তি ছিল নিছক ব্যক্তিক। তদুপরি ছিল রাজসভা-সম্পৃক্ত অভিজাত পরিবেশ। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই, পরোক্ষ অপেক্ষা প্রত্যক্ষভাবে—মানসবৃন্দাবন অপেক্ষা দেহবৃন্দাবনের— আকর্ষণ থেকে কবি দূরে থাকতে পারেন নি। আর নিজের মানস-সুন্দরীকে যদি রাধাসুন্দরীতে রূপায়িত করে থাকেন, তাহলেই বা ক্ষতি কি? দেহধর্মকে কবি অস্বীকার করেন নি— যেহেতু দেহকে অতিক্রম করে যাওয়ার সামর্থ্য তাঁর ছিল বলে। যেহেতু প্রত্যেক কবিরই মানস-প্রতিমা থেকে থাকেন, আমাদের কবিও তার ব্যতিক্রম নন। তাছাড়া বৈষ্ণবধর্ম জীবনকে অস্বীকার করে না। বৈষ্ণবকবি 'কান্তপ্রেম'কে 'রাধাকান্তপ্রেমে' পরিণত করেছেন। লৌকিক প্রেমে রসোত্তীর্ণ হ'য়ে রাধার হৃদয়ের নিগূঢ় রহস্যের আভাস দান করেছে। অতএব, মূলে যে চেতনাই থাক, পরিণতির যে বিশিষ্ট-রূপটি আমাদের সামনে

ধরা পড়েছে, তাই-সে বিচার্য। কোরক নয়, প্রস্ফুটিত ফুলের সৌন্দর্যই আমাদের অধিকতর কাম্য।

আমাদের এতক্ষণের বিস্তারিত আলোচনার কিছু সারসংক্ষেপ করা যাক্। আমরা বলেছি, বিদ্যাপতির পদরচনার মূলে স্বাভাবিক বৈষ্ণবচেতনা বর্তমান। কিন্তু নিছক বৈষ্ণবচেতনার বশবর্তী হ'য়ে কবি পদাবলী রচনা করতে বসেন নি। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর অতুলনীয় কবিপ্রতিভা। আর রাজসভার কবি বিদ্যাপতি দেহকে অস্বীকার করেন নি। দেহরহস্যকে অবলম্বন করে তিনি যে সৌন্দর্যলোকের পরিচয় দিয়েছেন, তা কেবল দেহের সীমায় আবদ্ধ থাকে নি। তা লৌকিকের সীমা পার হ'য়ে আনাগোনা করেছে অলৌকিকের রাজ্যে আধ্যাত্মিকতার সুষমাস্বর্গে।

॥ ৪ ॥

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, বিদ্যাপতির কবিত্বমুকুল বিকশিত হয়েছিল রাজসভাপুষ্ট নাগরসভ্যতাজাত মনোলোকে। এই রাজসভাজাত মনোভঙ্গি তাঁর অন্তরে সাঙ্গীকৃতি লাভ করেছিল। এর ফলে শুধু সৌন্দর্যরসপিপাসাই নয়, বোধের সচেতন প্রকাশও লক্ষ্য করা যায়। বস্তুত, বিদ্যাপতির কবিত্বভঙ্গিতে রয়েছে মানবজীবনতৃষ্ণা, দেহবিষয়ে কৌতূহল, দেহকেন্দ্রিক সৌন্দর্যবোধের অনুধ্যান, তদুপরি দেহোত্তীর্ণ প্রেমের সন্ধানে দূরযাত্রা। দেহের ক্ষুধা কবির বিলক্ষণ ছিল। সেজন্যই তাঁর পদাবলীতে মানবজীবনউত্তাপ অতি সহজেই মেলে। বয়ঃসন্ধির পদগুলিতেই আমাদের কবির এই দৃষ্টিক্ষুধা ও জীবনতৃষ্ণা অধিকতর প্রত্যক্ষ। আধ্যাত্মিকতার পথে অভিনিবিষ্ট পদপাত করতে গেলেও বিদ্যাপতির পক্ষে এই মানবিক-জীবনতৃষ্ণাকে এড়ানো সম্ভব ছিল না। কারণ বিদ্যাপতি ছিলেন 'সম্ভোগাখ্য শৃঙ্গার রসের কবি'। আর শৃঙ্গাররসের বর্ণনায় বিদ্যাপতি জয়দেবকে অনুসরণ করেছেন। জয়দেবের মত তিনিও বিলাসকলা-কুতূহল কবি ; তাই তিনি 'অভিনব জয়দেব।' জয়দেব প্রেমের উচ্ছলতার প্রতিই অধিকতর আকৃষ্ট ; তাঁর কাব্যে ছন্দের নূপুর-নিক্কণে যে সুর উচ্ছ্বসিত, তা অতি গভীর হৃদয়াবেগ প্রসূত নয়, উজ্জ্বল উচ্ছল প্রেমবিলাস। এদিক থেকে বিদ্যাপতি জয়দেবের কিয়ৎ-অনুপন্থী। (অবশ্য বিদ্যাপতির কাব্যে আরো কিছু আছে। বিদ্যাপতি শুরুতেই চণ্ডীদাসের মত আধ্যাত্মিক কবি নন, তাঁর পক্ষে হওয়া সম্ভব ছিল না। তিনি মানবিক পরিবেশজাত দৃষ্টিক্ষুধার বশবর্তী হ'য়ে জীবনরহস্যের অলিতে-গলিতে বিচরণ করেছেন। বিদ্যাপতি রাধাকমলিনীর তিল তিল আহৃত সৌন্দর্য-সুষমা নানা উপমার সাহায্যে ধরে রাখতে চান।) আবার বৈষ্ণব দৃষ্টিতে, বিদ্যাপতি তো নিছক লৌকিক কবি নন, তিনি গোপী-অনুগতও বটে। সুতরাং রাধার রূপ-বর্ণনার দায়িত্ব তাঁর আছে। (বিদ্যাপতি সম্পর্কে একথা বলা অবশ্যই প্রয়োজন যে, কবি দেহ-দেউলের রূপাঙ্কন করেছেন সত্য, কিন্তু, ক্রমে তাকে দেবালয়ের প্রদীপ ও করে তুলেছেন। এটাই কবিধর্মের স্বভাব।)

॥ ৫ ॥

এবার বিদ্যাপতির কাব্যগহনে প্রবেশ করা যাক্‌। (বয়ঃসন্ধি পদে রাধার শৈশব ও যৌবন—দুইয়ের সন্ধিক্ষণ বর্ণনায় বিদ্যাপতির কবিত্বশক্তির অতিবড় পরিচয়। দেহ ও মন—উভয় রাজ্যেই তাঁর কবিপ্রতিভা পদার্পণ করেছে।, একটি উদ্ধৃতির সাহায্য নেওয়া যাক্‌—

শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দুহু দলবলে ধনি দ্বন্দ্ব পড়ি গেল॥
কবহু বাঁধয় কচ কবহু বিথারি।
কবহু ঝাঁপয় অঙ্গ করহু উঘারি॥
অতি থির নয়ন অথির কিছু ভেল।...

শৈশব ও যৌবনের দেখা হল। দুই দলের টানাপোড়েনে (ফলে) ধনী অর্থাৎ রাধিকা দ্বন্দ্বে(সমস্যায়) পড়ে গেলেন। কখনো কেশ বাঁধে কখনো এলিয়ে দেয়। অতিস্থির নয়নদৃষ্টি কিছুটা অস্থির হল।

(শৈশব ও যৌবনের দ্বন্দ্বের মধ্যে এখনো শৈশবের প্রাধান্য। অধিকন্তু, যৌবনের দেহলক্ষণও পরিস্ফুট। আর একটি পদ ঃ

খণে খণে নয়ন কোণ অনুসরই।
খণে খণে বসন ধূলি তনু ভরঈ॥
খণে খণে দশন ছটাছুটি হাস।
খণে খণে অধর আগে করু বাস॥
চউঁকি চলয়ে খণে খণে চলু মন্দ।
মনমথ পাঠে পহিল অনুবন্ধ॥
হিরদয় মুকুল হেরি হেরি থোর।
খণে আঁচর দএ খণে হোয় ভোর॥

ক্ষণে ক্ষণে নয়ন কোণকে অনুসরণ করে অর্থাৎ বাণ হানে। ক্ষণে ক্ষণে বসনধূলিতে দেহ ভরে যায়। আঁচল লুটিয়ে পড়ে, আবার সেই লুটানো আঁচল তুলে শরীর আবৃত করলে তনু সেই ধূলায় আচ্ছাদিত হয়ে যায়। ক্ষণে ক্ষণে দাঁতের ঝিলিক দেখা যায়; ক্ষণে ক্ষণে হাসি শুধু অধরের আগে বাস করে অর্থাৎ শৈশবের চাপল্য বশত কখন কখন রাধার উচ্ছল হাসি, আবার কখনো, যৌবনবতী নারীসুলভ ও লজ্জাসূচক চাপা হাসি। ক্ষণে চমকিত হয়ে চলে, ক্ষণে ধীরে যায়। মন্মথ পাঠের প্রথম অনুবন্ধ হৃদয় মুকুলকে ক্ষণে অল্প অল্প দেখে ক্ষণে আঁচলে ঢাকা দেয়।

এখানে রাধিকার শৈশব ও যৌবন—দুইয়েরই দেহে অধিষ্ঠান লক্ষণীয়। শৈশবসুলভ চপলতা দেহে বর্তমান, কিন্তু যৌবন উষার আবির্ভাবটিও চাপা পড়েনি। 'হিরদয় মুকুল হেরি হেরি থোর'—কথায় তার ব্যঞ্জনা। আর একটি পদে যৌবন সমাগমের অরুণ-আভাস ব্যঞ্জিত হ'য়ে রাধার মনের পরিবর্তনকে সূচিত করছে। নবোদ্ভিন্নযৌবনা রাধা এখন রসকথা শুনতে বিশেষ উদ্‌গ্রীব ঃ

শুনইতে রসকথা থাপয় চিত।
জইসে কুরঙ্গিনী শুনয়ে সঙ্গীত ॥

নবযৌবন সমাগমে রাধার এই যে নবচেতনা, তা একদিকে মনস্তত্ত্বসম্পন্ন, অন্যদিকে অলঙ্কারমণ্ডিত ও কাব্যরসান্বিত।) রবীন্দ্রনাথ রাধার এই বয়ঃসন্ধিক্ষণের বিশ্লেষণ করেছেন বিশ্বকবির উপযুক্ত ভাষায়ঃ "বিদ্যাপতির রাধা অল্পে অল্পে মুকুলিত, বিকশিত হইয়া উঠিতেছে।...... আপনাকে আধখানা প্রকাশ, আধখানা গোপন,...... বিদ্যাপতির রাধা নবীনা, লীলাময়ী, নিকটে কম্পিত, শঙ্কিত, বিহ্বল। কেবল চম্পক অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া অতি সাবধানে অপরিচিত প্রেমকে একটু মাত্র স্পর্শ করিয়া অমনি পলায়নপর হইতেছে।)..... যৌবন, সে-ও সবে আরম্ভ হইতেছে,—এখন সকলই রহস্য পরিপূর্ণ। সদ্যবিকচ হৃদয় সহসা আপনার সৌরভ আপনি অনুভব করিতেছে; তাই লজ্জায় ভয়ে আনন্দে সংশয়ে আপনাকে গোপন করিবে কি প্রকাশ করিবে ভাবিয়া পাইতেছে না... ।" (বয়ঃসন্ধির পদে বিদ্যাপতির কথার ছবি এঁকেছেন। শৈশব অপসৃয়মান, যৌবন সমাগত—এই বিচিত্র পরিবেশে সৃষ্টি হ'লে দুইয়ের বৈপরীত্য—'দুহু' দল বলে দ্বন্দ্ব পড়ি গেল'। এমন অবস্থায়—"খেলত ন খেলত লোক দেখি লাজ। হেরত ন হেরত সহচরী মাঝ॥" কারণ—'দিনে দিনে বাঢ়য় পাঢ়য় অনঙ্গ।' বয়ঃসন্ধির এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে ক্রমেই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে যৌবনের অপরূপ সৌন্দর্যচ্ছটা। এখন শ্রীরাধার ঃ

লোচন জনু থির ভৃঙ্গ আকার।
মধু মাতল কিয়ে উড়এ ন পার ॥

বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধির মধ্যে একদিকে সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিন্যাস, অন্যদিকে সুগভীর কাব্যানুভূতির বর্ণ-বিলসন লক্ষ্য করা যায়। বস্তুত কবির তীক্ষ্ণ, সুনিপুণ পর্যবেক্ষণশক্তি-আহৃত ভাবনা অপরূপ সৃজন নৈপুণ্যে রসসিক্ত বাণীরূপ লাভ করেছে। যেমন ঃ

শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দুহু দলবলে দ্বন্দ্ব পড়ি গেল ॥
কবহু বাঁধয় কচ কবহু বিথারি।
কবহু ঝাঁপয় অঙ্গ কবহু উঘারি ॥
থির নয়ন অথির কছু ভেল।
উরজ উদয়-থল লালিম দেল ॥
চঞ্চল চরণ, চিত চঞ্চল ভাণ।
জাগল মনসিজ মুদিত নয়ান।

শৈশব ও যৌবনের মুখোমুখি দেখা। দুইয়ের দলবলে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে রাধা স্থির করতে পারছেন না যে, তিনি কোন্ পক্ষে। বস্তুত, এখানে শৈশব রয়েছে, কিন্তু যৌবনেরও উদ্‌গম হয়েছে—কেউ কাউকে যেন পথ ছেড়ে দিতে চাইছে না। কেশ বাঁধা ও না-বাঁধা, অঙ্গ আবৃত ও অনাবৃত করা, স্থির নয়ন দৃষ্টিতে কিছুটা অস্থিরতার লক্ষণ, চরণ চঞ্চল, চিত্তও এখন চঞ্চল হয়ে উঠল। প্রথম অবস্থাগুলি শৈশবের, দ্বিতীয় অবস্থাগুলিতে যৌবন-

লক্ষণের প্রকাশ। বস্তুত, এখানে রাধার মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের পরিচয় অবশ্যই লভ্য। আবার—

খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ।
হেরত না হেরত সহচরী মাঝ॥
শুন শুন মাধব তোহারি দোহাই।
বড় অপরূপ আজু পেখলি রাই॥
লোচন জনু থির ভৃঙ্গ আকার।
মধু মাতল কিএ উড়ই না পার॥

শৈশব দেহে অধিষ্ঠান করছে, অন্যদিকে যৌবনের ইশারাও উঁকি দিচ্ছে—এ দুইয়েব সম্মিলিত অবস্থা এখন পরিস্ফুট। তাই সখীদের সঙ্গে খেলতে খেলতে থেমে যাওয়া, সহচরীদের সঙ্গে হৈ-চৈ করতে করতে কখন নির্জনে একাকী হওয়া, মুখ-সৌন্দর্যের অপরূপতা—কমলের লাবণ্য ও দৃপ্ততার সমাবেশ' মধুমত্ত ভৃঙ্গ যেমন উড়তে পারে না, লোচন দুটিও তেমনি স্থির হয়ে আছে। আবার 'সুনইতে রসকথা থাপয় চীত। / জইসে কুরঙ্গিনী সুনএ সঙ্গীত' —যেমন মৃগী সঙ্গীত শোনে তন্ময় হয়ে, সে-ও তেমনি বসকথা মনস্থির করে শোনে। এখানে মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম ও রসের ব্যঞ্জনা—দুই-ই লক্ষ্য করা যায়। কিংবা—

চঞ্চল লোচন বঙ্কনিহারএ অঞ্জন শোভা পাএ।
জনু ইন্দীবর পবনে পেলল, অলিভরে উলটায়॥

চঞ্চল লোচন বঙ্কিম, বিভঙ্গ দৃষ্টিপাত করেছে কাজল শোভা পায়। দেখে মনে হয়, যেন পবনে আন্দোলিত পদ্ম অলিভরে উল্টে গেছে।

এখানে শৈশব ও যৌবনের আলোছায়ার লুকোচুরি খেলা অসামান্য কাব্যসুবভিতে মণ্ডিত হয়েছে।

বয়ঃসন্ধির পদে রাধার রূপ ও যৌবনের যে চিত্র বিদ্যাপতি এঁকেছেন, তার মধ্য দিয়ে রাধা-কমলিনীর বিচিত্র হৃদয়-স্বরূপটিও উদঘাটিত হয়েছে। অনঙ্গের আবির্ভাবে হৃদয়ের জাগরণ সূচিত হয়েছে, রূপচেতনার সুখোল্লাসে বিভোর রাধা প্রবেশ করলেন পূর্বরাগেব—প্রথম প্রেমোপলব্ধির—জগতে। এখান থেকে শুরু হোল রাধার জীবনের নতুন অধ্যায়।)

॥ ৬ ॥

(বয়ঃসন্ধির পদে লক্ষ্য করা গেছে—বাহ্য সৌন্দর্যের প্রতি কবির আকর্ষণ যথেষ্ট। পূর্বরাগ পর্যায়ে এসে এই বাহ্য সৌন্দর্যের রূপাঙ্কণ সোৎসাহ সমর্থন পেয়েছে। রূপমুগ্ধতা ও সৌন্দর্যতৃষ্ণা বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছে। এই পূর্বরাগ পর্যায়েই বিদ্যাপতির সঙ্গে চণ্ডীদাসের পার্থক্য অতি সহজে দৃষ্ট। যেখানে দেহরূপবর্ণনার প্রশ্ন, সেখানে বিদ্যাপতি 'প্রভতহস্ত', কবিজনোচিত উল্লাসে 'আটখানা'। কিন্তু যেখানে রূপ নয়, স্বরূপ বর্ণনার প্রশ্ন, সেখানে বিদ্যাপতি ঈষৎ ম্রিয়মান।) স্বরূপ বর্ণনার কবি বিদ্যাপতি নন, সে কবি চণ্ডীদাস।

নিজস্ব ক্ষেত্রে বর্ণন শক্তির উৎকর্ষ প্রমাণের জন্য বিদ্যাপতি উপজীব্য করেছেন শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগকে ; কারণ পুরুষের দৃষ্টিতে নারীরূপ অঙ্কনেই আমাদের কবির কৃতিত্ব সমধিক প্রকাশমান। এই বিষয়ক পদের বর্ণনায় বিদ্যাপতি রূপচিত্রণ দক্ষতা, রসসৃষ্টি, হৃদয়চেতনার উন্মোচন, সম্ভোগেচ্ছা ও ঈষৎ প্রগল্‌ভতার পরিচয় দিয়েছেন।

অনেক পদে স্থূলত্ব প্রকাশ পেলেও রসসিদ্ধিও যে অনেক পদে ঘটেছে, তা অস্বীকার করা যায় না। ভালো ও মন্দ—দুই জাতের বর্ণনাতেই বিদ্যাপতির অধিকার। আমাদের বিচারের সময় মন্দ পদের জন্য শুধু বিদ্যাপতিকে 'দুয়ো' দিলে চলবে না, অনেক উৎকৃষ্ট পদের জন্য তাঁকে 'বাহবা'ও দিতে হয়। একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক :

জব গোধূলি সময় বেলি
ধনি মন্দির বাহর ভেলি।
নব জলধর বিজুরি রেহা
দ্বন্দ্ব পসারি গেলি ॥

গোধূলিবেলায় শ্রীরাধা মন্দির (গৃহ) থেকে বেরিয়ে এলেন। দেখে মনে হ'ল, যেন নবীন মেঘ ও বিদ্যুৎ দ্বন্দ্ব বিস্তার করে গেল। এখানে আলো ও অন্ধকার, মেঘ ও বিদ্যুতের দ্বন্দ্বমূলক চিত্রকল্পের সাহায্যে শ্রীরাধিকার যে রূপসৌন্দর্য বিদ্যাপতি আঁকলেন, তা কবিপ্রতিভার বিশেষ পরিচয় বহন করে। আর একটি চিত্র : 'মেঘমাল সঙ্গে তড়িত-লতা জনু হৃদয়ে শেল দেই গেল।' শ্রীরাধা নয়—বিদ্যুল্লতা, তাকে এক কণা দর্শনজাত অনুভূতি কৃষ্ণের হৃদয়ে শেলসম বিদ্ধ হোল। কৃষ্ণ যেন মরণাহত হ'য়ে পড়লেন—মৃত্যুবাণে নয়, রূপবাণে। কিন্তু হৃদয় বুঝি পরিপূর্ণ বিদ্ধ হয়নি, কারণ তখনও তো 'হেরি হেরি ন পূরল আশা', তখনও রাধারূপ নিরীক্ষণ করেছেন তিনি :

আধ আঁচর খসি আধ বদন হাসি
আধহি নয়ান তরঙ্গ।
আধ উরজ হেরি আধ আঁচর ভরি
তদবধি দগধে অনঙ্গ ॥

রাধার রূপসাগরে মনপবনের নৌকা ভাসিয়েছেন কৃষ্ণ। এ সময় তাঁর রূপ-দর্শন স্পৃহার মধ্যে ছিল দেহকামনার স্থূল অবলেপ ; দেহের 'প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ' ; কামনার বসন্ত বাতাসে উদ্দীপিত হয়েছে কৃষ্ণের যৌবন-জ্বালা। কিন্তু দেহকামনাই সব নয়, অসীম সৌন্দর্যাকৃতিও তাঁর হৃদয়ে নিবদ্ধ, তার প্রমাণ আছে :

যঁহা যঁহা পদযুগ ধরই।
তঁহি তঁহি সরোরুহ ভরই ॥
যঁহা যঁহা ঝলকত অঙ্গ।
তঁহি তঁহি বিজুরি তরঙ্গ ॥..
যঁহা যঁহা নয়ন বিকাশ।
তঁহি তঁহি কমল পরকাশ ॥

এখানে যে সৌন্দর্য-ছবি প্রকাশিত, তাতে দেহকে অতিক্রম ক'রে অনঙ্গের সূক্ষ্ম রসদ্যোতন চিত্র প্রতিফলিত।

এরপর শ্রীরাধার পূর্বরাগ। এই জাতীয় পদে বিদ্যাপতি বিশেষ উৎকর্ষ দেখাতে পারেন নি। এর কারণস্বরূপ বলা যায়—প্রেমের প্রথম অবস্থায় নারীমনের অনুভূতির তত প্রখর প্রকাশ থাকে না। কারণ নারীর 'বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না'। তবুও মহাকবির উক্ত অনুভূতির সামান্য প্রকাশও অসামান্য তাৎপর্যমণ্ডিত হ'য়ে ওঠে। এ ধরনের একটি পদের উল্লেখ করা যাক :

অবনত আননে কএ হম রহলিহু
বারল লোচন চোর।
পিয়া মুখরুচি পিবএ ধাওল
জনি সে চাঁদ চকোর॥
ততহু সঞে হঠে হটি মোঞে আনল
ধএল চরণ পর রাখি।
মধুপ মাতল উড়এ ন পারএ
তইঅও পসারএ পাখী॥

মাধবের সঙ্গে দেখা হলে আমি অবনত মুখে রইলাম। লোচনচোরকে শরণ করলাম। কিন্তু চকোর যেমন চাঁদের পানে ধায়, আমার নয়নও তেমনি প্রিয়ের মুখরুচি পানের জন্য ধাবিত হল। সেখান থেকে আমার দৃষ্টিকে জোর করে ধরে এনে চরণের প্রতি নিবদ্ধ রাখলাম। মধুমত্ত মধুপ যেমন উড়তে পারে না, তবু পাখা বিস্তার করে, আমার মনও তেমনি পক্ষবিধূননের জন্য চঞ্চল, অস্থির হল।

ভীরু লজ্জাবনত অথচ প্রেমবিদ্ধ শ্রীরাধার অতি স্বাভাবিক ও সুন্দর চিত্র এটি। প্রথম প্রেমের লজ্জারুণ ভাবের আভাস ও তার পরবর্তী ক্রিয়াকলাপের দ্বারা রাধা-হৃদয়-শতদল-পদ্মের পাপড়ি একটি একটি করে উন্মোচিত হচ্ছে। যৌবনদেবতা অকস্মাৎ সাড়া জাগিয়েছে রাধার দেহে ও মনে। তারই ইঙ্গিত স্বরূপ :

তনু পসেবে পসাহনি ভাসলি
তইসন পুলক জাগু।
চুণি চুণি ভয়ে কাঁচুঅ ফাটলি
বাহু বলয়া ভাগু॥

যৌবনমদে অধীর দেহ পুলকে অস্থির হয়ে উঠেছে। ফলে কাঁচুলি ফেটে গেল, বাহুর বলয় ভেঙ্গে গেল। বস্তুত, অনঙ্গের উন্মাদনা রাধার দেহমনে তুফান তুলেছে। এই অনঙ্গ দেবতাই রাধাকে চতুরা করে তুলেছে। তাই বুদ্ধিবলে যে-কোন উপায়েই হোক, তিনি কৃষ্ণদর্শন-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে নেন। প্রেমের বিঘ্নসঙ্কুল বিচিত্রপথে রাধা এখন অনেকটা অগ্রসর :

নহাই উঠল তীরে রাই কমলমুখী
সমুখে হেরল বর কান।
গুরুজন সঙ্গে লাজে ধনী নতমুখী
কৈসনে হেরব বয়ান॥
সখি হে, অপরূব চাতুরী গোরি।
সবজন তেজি অগুসরি সঞ্চরি
আড় বদন তঁহি ফেরি॥
তঁহি পুন মোতি হার টুটি ফেকল
কহত হার টুটি গেল।
সব জন এক এক চুণি চুণি সঞ্চরু
শ্যাম দরশ ধনী লেল॥

গুরুজনের সঙ্গে রাধা নদীর ঘাটে স্নান করতে এসেছেন। স্নান সেরেই তীরে উঠে রাধা কামধন কানুকে দেখতে পেলেন। কিন্তু গুরুজন সঙ্গে থাকায় লজ্জানত রাধা কৃষ্ণের দিকে তাকাতে পাচ্ছেন না। অথচ কৃষ্ণকে দেখবার জন্য তিনি আকুল হয়ে পড়েছেন। সেজন্য তিনি এক অপরূপ চাতুরীর আশ্রয় নিলেন। স্বজন ছেড়ে তিনি এগিয়ে গিয়ে পিছন দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে লাগলেন, যেন সঙ্গিনীদের দেখছেন। তাছাড়া কৌশলে মোতির হার ছিঁড়ে ফেলে বললেন, হারটা ছিঁড়ে গেল। তারপর মাথা নীচু করে এক এক করে চুণিগুলি কুড়িয়ে নিতে নিতে কৃষ্ণকে সেই সুযোগে দেখে নিলেন। বস্তুত, এই বর্ণনার মধ্য দিয়ে এক অসামান্য চিত্রকলা সৃজিত হয়েছে। হৃদয়ের আবেগ বুদ্ধির চাতুর্যের সঙ্গে মিশে রাধাকে প্রেমের ক্ষেত্রে অনেক দুঃসাহসিনী ও কৌশলী করে তুলেছে। সেই সঙ্গে তাঁর কৃষ্ণপ্রেম যে এই পর্যায়েও রাধার হৃদয়কে ব্যাপকভাবে অধিকার করেছে, তাও স্পষ্ট। আর একটি পদেও রাধার হৃদয়ের আকূতি নিখুঁতভাবে অভিব্যক্ত। পদটি—

হাথক দরপণ মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল॥
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার।
দেহক সরবস গেহক সার॥
পাখীক পাখ মীনক পানি।
জীবক জীবন হাম ঐছে জানি॥
তুহুঁ কৈছে মাধব কহ তুহুঁ মোয়।
বিদ্যাপতি কহ দুহুঁ দোহা হোয়॥

হে প্রিয়, তুমি আমার হাতের দর্পণ, মাথার ফুল, নয়নের অঞ্জন, মুখের তাম্বুল, হৃদয়ের মৃগনাভী কস্তুরী, গলার হার, দেহের সর্বস্ব, গৃহের সার, পাখীর পাখা, মাছের কাছে যেমন জল, জীবের জীবন। হে মাধব, তুমি আমার কে, তা তুমিই বল। বিদ্যাপতি বলেন, তোমরা দুজনেই দুজনের। এখানে রাধার, সেই সঙ্গে কৃষ্ণেরও, অনুরাগ চূড়ান্ত অবস্থায়

পৌঁছেছে। তাই আন্তরিক আবেগের মধ্যেও আসে নানা প্রশ্ন, সংশয়, জিজ্ঞাসা ঃ তবে এ জিজ্ঞাসা সন্দেহের বশে নয়, বরং প্রেমিককে অনেক কাছে পাওয়ার পরেও তাঁকে আরো বেশী করে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায়।)

॥ ৭ ॥

(শ্রীরাধা এখন যৌবনবতী, প্রেমবিষয়ে বেশ সজাগ। নির্ঝরের স্বপ্ন-ভঙ্গ হয়েছে ঃ দেহ-ভূধর কামনায় থরো থরো, ফুলে ফুলে উঠছে আবেগ-তরঙ্গ, আকুল-পাগল-পারা হৃদয় প্রেমসিন্ধুর দুর্বার স্রোতে ভেসে যেতে যায়।) রাধার সাধ্য কি, স্থির থাকে ? যে দয়িতের উদ্দেশে দেহমনপ্রাণ সমর্পণ করা যায়, তাকে না পাওয়া পর্যন্ত শান্তি কোথায় ? আর সেই অসীমের, সেই পরমের উদ্দেশে যাত্রার পথও তো দুর্গম।' শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, বসন্ত—কোন ভেদ নেই, দূর-দুর্গম পথে বাঞ্ছিতের উদ্দেশে গমনের মধ্য দিয়ে সূচিত হয় একদিকে প্রেমের গভীরত্ব, অন্যদিকে প্রেমিকের প্রতি আকর্ষণের অতি গাঢ়তর আস্বাদ্যমানত্ব। রাধা নিজে যখন অভিসার করেন, তখন বুঝা যায় দয়িতের জন্য তাঁর হৃদয়ের আকুলতা কত অধিক। সে কারণেই তিনি পরকীয়া হয়েও সমাজ সংসার সংস্কারের সব বাধা অতিক্রম করে দূর-দুর্গম পথে বেরিয়ে পড়েছেন সঙ্কেত-কুঞ্জ অভিমুখে উপনীত হওয়ার জন্য। অভিসারে গমনের জন্য রাধাকে যথোচিত প্রস্তুতিও করতে হচ্ছে। এই যে নায়িকা নিজেই অভিসার করছেন, তাকেই 'বিপরীত অভিসার' বলা হচ্ছে। —'বিপরিত অভিসার অমিয় বরিস ধার অঙ্কুস কএল অলকে ॥' —বিপরীত অভিসার অমিয় ধারা বর্ষণ করে। আর রাধা মদনকে দমনের জন্য অঙ্কুশ রূপ মাধবকে লক্ষ্যস্থানে আসতে বললেন। কিন্তু এ পথও সামান্য নয়। সামান্য, সরল পথে সেই পরমকে পাওয়া যায় না—'ক্ষুরস্য ধারা নিশিত দুরত্যয়া দুর্গম পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি'। তবু নব অনুরাগে যার হৃদয় উন্মত্ত, কোন বাধাকেই আর সে বাধা মনে করে না।—

নব অনুরাগিণী রাধা।
কিছু নাহি মানএ বাধা ॥
একলি কএল পয়াণ।
পথ বিপথ নাহি মান ॥

রাধার অভিসারের কষ্ট কি একটি ? পথের কষ্ট তো আছেই। তারো আগে আছে—প্রিয়ের অদর্শনজনিত কষ্ট, সমাজ-সংসারের বাধাজনিত কষ্ট। কিন্তু রাধা কোন বাধাকেই আজ আমল দেন না। হৃদয়ের গহনে যাঁর প্রেমের আগুন জ্বলছে, সমাজের বাধা, গুরুজনের বাধার খড়কুটো তাঁর কি করবে ?—

সখি হে আজ যাওব মোহী।
ঘর গুরুজন ভয় না মানব
বচন চুকব নহী ॥

এখন শ্রীরাধা—'কুলবতী ধরম করম ভয় অব সব গুরু-মন্দির চলু রাখি।' ভয় তিরোহিত, লোকলজ্জা অন্তর্হিত। এখন রাধার অন্য চিন্তা, অন্য ভাবনা। এখন তাঁর—

'অতি ভয় লাজে সঘন তনু কাঁপই কাঁপই নীল নিচোল।' অনাস্বাদিত মধুর মিলন-পুলকের কল্পনায় কম্পমান রাধার তনু লজ্জারুণ। প্রেমের দুরন্ত আকর্ষণে রাধার দুর্গম পথে অভিসার :

বরিস পয়োধর ধরণী বারি ভর
রয়নি মহাভয় ভীমা।
তইও চললি ধনি তুঅ গুণ মনে গণি
তসু সাহস নাহি সীমা ॥

'শ্রীরাধার প্রেমাবেগের চূড়ান্ত পরিচয় অভিসারের পদে। আর বিদ্যাপতি এই অভিসার বর্ণনায় অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য—অভিসারের শ্রেষ্ঠ পদকর্তা গোবিন্দদাস। বিদ্যাপতি এ শ্রেণীর পদ রচনায় 'দ্বিতীয় গোবিন্দদাস'। তবে এ তুলনা—গুরু ও শিষ্যের মধ্যে। নচেৎ অভিসার বর্ণনায় বলতে গেলে—অন্যান্যদের তুলনায় এই দুজনেরই কৃতিত্ব

॥ ৮ ॥

কিন্তু বিরহের পদে বিদ্যাপতি কবিপ্রতিভার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়িয়েছেন। (বিরহের বর্ণনাতে বিদ্যাপতি অতুলনীয় কবিকল্পনার রাজসিক ঐশ্বর্যে মহীয়ান্ করে তুলেছেন পদগুলিকে। শ্রীরাধার বিরহ বিদ্যাপতির পদে ব্যক্তিক অনুভূতির ক্ষেত্রে সীমায়িত হয়ে থাকেনি, পরম বেদনার শিল্প-সমুন্নত প্রকাশে বিশ্বজগৎকে সোচ্চারে ঘোষণা করেছে। বিদ্যাপতির মিলনে সুখ, বিরহে দুঃখ—দু'টিই চরম পর্যায়ের। অপর দিকে চণ্ডীদাসের পক্ষে—'সুখ দুখ দুটি ভাই। সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি দুখ যায় তার ঠাই॥' কিন্তু বিদ্যাপতির পদে সুখ দুঃখের বিপরীত কোটিতে অবস্থান করে। (বিদ্যাপতির রাধা দুঃখের বেদনায় অস্থির হয়ে পড়েন, আবার সুখের অভ্যাগমে তাঁর শতধা উল্লাস ছলকে উঠে ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বপটভূমিকায়। বিদ্যাপতির শ্রীরাধার বিরহবেদনাকে "সৃষ্টির আগুন জ্বলা-বিরহ" নামে যে গ্রন্থের সমালোচক আখ্যাত করেছেন, তাঁর সূক্ষ্ম রসদৃষ্টির বিশেষ উল্লেখ করতে হয়। বিরহে বিদ্যাপাত অদ্বিতীয়।) বিরহের অনুভূতিতে এত ব্যাপ্তি, এত গভীরতা আর কোন্ বৈষ্ণব কবির পদে আছে? জানি, খড়্গ-হস্ত পাঠক হয়ত সঙ্গে সঙ্গে চণ্ডীদাসের নাম করবেন। কিন্তু চণ্ডীদাসের নাম স্মরণে রেখেও আমরা বলি, (বিরহের পদে বিদ্যাপতি অদ্বিতীয়। চণ্ডীদাস মিলনকেও যেমন অনুল্লাসের দৃষ্টিতে অবলোকন করেছেন, বিরহের বেদনাও তাঁর কাছে তত উচ্চকিত হয়ে ওঠেনি। কিন্তু বিদ্যাপতির পদে বিরহের বিশ্বব্যাপ্ত বেদনার তরঙ্গে দোলায়িত রাধার মর্মযাতনা অতি গভীর, অতি তীক্ষ্ণ, অতি করুণ।—

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
ই ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূণ্য মন্দির মোর॥

কিন্তু এই তীব্র বেদনার মুহূর্তেও বিদ্যাপতির রাধার আত্ম-সচেতনতা একেবারে লোপ পায়নি, যেমন পেয়েছে চণ্ডীদাসের রাধার। 'কান্ত পাহুন কাম দারুণ সঘনে খরশর হানিয়া। আমার দুঃখ!—এই আত্মসচেতনতার অনন্যসুলভ গৌরবেই বিদ্যাপতির রাধা মহিমময়ী।

অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে।
এ নব যৌবন বিরহে গমাওব
কি করব সো পিয়া লেহে॥

তপনের তাপে যদি অঙ্কুর শুকিয়ে যায়, তারপর বৃষ্টিপাতে কি লাভ? আমার নব-যৌবনকাল যদি বিরহে কাটাতে হয়, তাহলে প্রিয়-র প্রেম দিয়ে পরে আমি কি করব'—রাধার এই যে আক্ষেপোক্তি, তাতে বিরহের আত্যন্তিক বেদনা নির্ধারিত হয়েছে।

বিদ্যাপতির রাধার অন্তহীন বিরহের বুঝি অবসান নেই। দিন-মাস-বছর—এক এক করে কেমন ব্যর্থ, বিষম হয়ে কেটে যাচ্ছে— পরদেশী প্রিয় আর ঘরদেশী হলেন না। এর চেয়ে বড়ো দুঃখ রাধার জীবনে আর কি আছে? রাধার জীবনাকাঙ্ক্ষা তাই বুঝি অন্তর্হিত—

এখন তখন করি দিবস গোয়াইলু'
দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি বরস গোয়াইলু'
ছোড়লু' জীবনক আশা॥

আসলে কানুই রাধার জীবন সদৃশ। সুতরাং সেই কানুর অনুপস্থিতিতে রাধার বাঁচা তো মৃত্যুরই সমান।

বস্তুত, মাথুর বিরহে রাধার হৃদয়বেদনা বিদ্যাপতির লেখনীতে যত নিবিড় ও গভীর-ভাবে প্রকাশিত হয়েছে, তাতে একদিকে ভাব-গভীরতা, অন্যদিকে শিল্প-সুষমার অনবদ্য প্রকাশ ঘটেছে। অথচ কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের সুখকে পূর্ণ করে তুলতে রাধার প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের আশ্লেষে সামান্যতম ব্যবধানও অসহ্য রাধার। মিলনের নিবিড়ত্বের কারণেই রাধা অঙ্গে বস্ত্র, হার, এমন কি চন্দন পর্যন্ত পরেন নি। তবু প্রিয় আজ নদী-গিরির ব্যবধানে দূরতর দেশে:

চির চন্দন উরে হার ন দেলা।
সো অব নদী গিরি আঁতর ভেলা॥

প্রিয়তমের ভালোবাসার গরবে গরবিনী রাই একদিন 'কাহুক ন গণলা।' কিন্তু আজ বুঝি তার প্রতিফলস্বরূপই যেন বক্ষে প্রিয়-বিরহ-বেদনা শেলসম বিদ্ধ হচ্ছে। 'আন অনুরাগে পিয়া আন দেশে গেলা। পিয়া বিনে পাঁজর ঝাঁঝর ভেলা॥' প্রিয় তাঁর জন্য সামান্যতম ভালোবাসাও যেন রেখে যায় নি। 'সো পিয়া বিনা মোহে কে কি না কহলা।' রাইকমলিনীর এই মর্মবেদনার মূল্য আজ কে দেবে? অন্যদিকে আবার যৌবন-মধুর-দিনগুলি একে একে অতিবাহিত হচ্ছে প্রিয়বিহনে। যৌবনের দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে গুচ্ছ গুচ্ছ

ফল ধরেছে, বসন্তের মদির বাতাসে ভূতলে নুয়ে পড়ার অপেক্ষা; কিন্তু আহরণে সার্থক করে তুলবার মত কেউ নেই। এমন অবস্থায় যৌবন আর রবে কতদিন? প্রিয় বিহনে সে যৌবনের মূল্যই বা কি যেমন—

সরসিজ বিনু সর সর বিনু সরসিজ
কি সরসিজ বিনু সূরে।
যৌবন বিনু তন তন বিনু যৌবন
কি যৌবন পিয় দূরে॥

এই কারণে রাধা পরিধেয় অলঙ্কার ইত্যাদি সব ত্যাগ করতে চান। কেন না, প্রিয় সমাগমে যৌবন ধন্য না হ'লে সাজসজ্জার মূল্যই বা কি? তাই প্রিয় যখন কাছে নেই, এখন

শঙ্খ কর চুর বসন কর দূর
তোড়হ গজমোতি হার রে।
পিয়া যদি তেজল কি কাজ সিঙ্গারে
যমুনা সলিলে সব ডার রে।

কিন্তু বসনভূষণ সব ত্যাগ করেও তো রাধা বিরহবেদনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পান না। প্রিয় শ্রীমতীকে ফেলে মধুপুর চলে গেছেন। এখন রাধার অবস্থা পথভ্রষ্ট, গলভ্রষ্ট মালতি-মালার মত। সব সুখ কানুর সঙ্গে চলে গেছে, দুঃখই এখন রাধার চিরসাথী। কিভাবে রাধার দিবস-রজনী কাটবে, তা রাধা ভেবে পান না।—

পিয়া গেল মধুপুর হম কুলবালা।
বিপথ পরল জৈছে মালতিমালা॥
কি কহসি কি পুছসি সুন প্রিয় সজনি।
কৈসনে বঞ্চব ইহ দিন রজনী॥
নয়নক নিন্দ গেও বয়ানক হাস।
সুখ গেও পিআ সঙ্গ দুখ হাম পাস॥

মাথুরে বিরহজনিত বেদনা রাধাকে সহ্য করতে হচ্ছে, কারণ তাঁরই কপাল দোষ। মাধব অনুপস্থিত, কিন্তু রাধার মন জুড়ে রয়েছেন তিনি। বিরহের তাপে খিন্ন রাধা তাঁরই ধ্যানে অনুখণ নিমগ্ন। কৃষ্ণপ্রীতির কথা স্মরণ করে দেহ খিন, জীবনের সাধ অন্তর্হিত।—

কতদিন মাধব রহব মথুরাপুর
কবে ঘুচব বিহি বাম।
দিবস লিখি লিখি নখর খোয়ালু
বিছুরল গোকুল নাম॥
হরি হরি কাহে কহব এ সম্বাদ।
সোঙরি সোঙরি নেহ খিন ভেল মঝু দেহ
জীবনে আছয়ে কিবা সাধ॥

মাথুরে বিরহে সমগ্র ব্রজভূমি সমাচ্ছন্ন। গোকুলমাণিক অপহৃত হয়েছে। সুতরাং গোকুলে প্রাণস্পন্দন অনুপস্থিত। একটা শূন্যতার বেদনায় যেন দিক-দিগন্তর পরিপ্লাবিত হয়ে যাচ্ছে। রাধার অন্তহীন বেদনার তো ভাষাই নেই।—

অব মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকুল মাণিক কো হরি লেল॥
গোকুলে উছলল করুণাক রোল।
নয়নক জলে দেখ বহএ হিল্লোল॥
সুন ভেল মন্দির সুন ভেল নগরী।
সুন ভেল দস দিস সুন ভেল সগরী॥

সখিগণের হৃদয়ও কৃষ্ণবিরহে দীর্ণ। কিন্তু রাধার হৃদয়-বেদনা তার থেকে অনেক গুণে বেশী। শ্রীমতীকে তাঁরা প্রবোধ দিয়েও সামলে রাখতে পারছেন না। তাঁর মুখে শুধু হা-হরি রব, যেন এখনই জীবন শেষ করে দেবে। ধনী অতি কষ্টে মাটি ধরে বসে—পুনরায় উঠার যেন ক্ষমতা নেই তাঁর। সহজেই বিরহিনী রাধা জগতে মহা-তাপিনী, মদনের শর ধারায় বৈরী (বিদ্ধ)। এখনই বুঝি তার প্রাণ শেষ হবে।—

মাধব কত পরবোধব রাধা।
হা হরি হা হরি কহতহি বেরি বেরি
অব জিউ করব সমাধা॥
ধরণী ধরিয়া ধনি জতনহি বৈঘত
পুনহি উঠই নাহি পারা।
সহজহি বিরহিনী জগ মাহাতাপিনী
বৈরি মদন সরধারা॥
অরুণ নয়নলোরে তীতল কলেবর বিলুলিত দীঘল কেসা।
মন্দির বাহির করইতে সংশয় সহচরি গণতহি সেসা॥

কৃষ্ণই তাঁর জপ, কৃষ্ণই তাঁর তপ। অনুক্ষণ কৃষ্ণচিন্তা করতে করতে কখন যেন রাধা নিজেই কৃষ্ণভাবে ভাবিত হ'য়ে গেছেন এবং রাধার জন্য বেদনা অনুভব করছেন:

অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে
সুন্দরী ভেলি মধাঈ।
ও নিজ ভাব স্বভাব হি বিসরল
আপন গুণ লুবুধাঈ॥

পরবর্তীকালে পরমকরুণাঘন শ্রীচৈতন্যদেবের দিব্যজীবনে রাধার এই ভাবটি মূর্তরূপ পরিগ্রহ করেছিল।

॥ ৯ ॥

ভাবসম্মেলনের পদেও বিদ্যাপতি অতুলনীয় কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। বিদ্যাপতি সচেতন শিল্পী। ভাবদেহকে রঙে, রসে, অলঙ্কারে যথাযথ রূপে মণ্ডিত করে পরম রমণীয়

করে তুলতে তিনি সুদক্ষ।) এর পরিচয় আমরা আগেই পেয়েছি। (ভাবসম্মেলনের পদে বিদ্যাপতির কবিকৃতি নতুনতর প্রতিষ্ঠা পেল। ভাবোল্লাসের নিবিড় আনন্দস্বাদ পরিপূর্ণ রসরূপ নিয়ে তাঁর পদে উপস্থিত। বিরহের পদ আলোচনাকালে আমরা বিদ্যাপতির রাধার মিলনে অপরিসীম উল্লাসের কথা উল্লেখ করেছি। বিরহে রাই ডুকরে কেঁদে উঠেছিল—'এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।' ভাবসম্মিলনে সে দুঃখ রাধার মন থেকে একেবারে মুছে গেছে। এখন রাধার কথা :

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥

আসলে সুখ কিম্বা দুঃখ—যে অবস্থার কথা বিদ্যাপতির রাধা বর্ণনা করতে যান না কেন, তার ব্যাপ্তি বা গভীরতা অনেক অনেক বেশী। এক কথায় বলা যায়, বিদ্যাপতি যেন চরমপন্থী কবি।) আমরা ভাবের অতিশায়িতার কথা বোঝাতে চরমপন্থী কথাটা ব্যবহার করেছি। (বিদ্যাপতির রাধা আনন্দ বা বেদনা—যে ভাবই প্রকাশ করুন না কেন, তা শতধারায় উৎসারণ করেন।) দুঃখের মুহূর্তে তিনি সুখের কথা বা সুখের মুহূর্তে দুঃখের কথা মনেও রাখেন না।) ভাবসম্মিলন পর্যায়ে এসে রাধা তাঁর মাথুর বিরহের পর্যায়ের অন্তহীন বেদনার কথা নিমেষেই ভুলে গেছেন। বরং প্রিয়মিলনের পরম আনন্দের কথা তাঁর হৃদয়ে দু-কূল ছাপিয়ে গেছে। বস্তুত, তাঁর মনে এখন এই অনুভূতি—

দারুণ বসন্ত যত দুখ দেল।
হরি মুখ হেরইতে সব দূর গেল॥

মাধবের সঙ্গে মিলনের আনন্দ জগৎ সমক্ষে ঘোষণা না করা পর্যন্ত রাধার শান্তি নেই। বিশ্বজগৎ শুনুক ও জানুক যে, রাধার আনন্দের সীমা নেই। রাইকমলিনীর মিলনোল্লাসে বিশ্বজগৎ প্লাবিত হয়ে গেছে :

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু
পেখলু' পিয়ামুখচন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানলু'
দশ দিশ ভেল নিরদন্দা॥)

কোন দিক দিয়েই রাধার মনে দুঃখের লেশমাত্র নেই। আকাশে-বাতাসে এ কার অশ্রুত ললিত কলগুঞ্জন? রাধাহৃদয়ের আনন্দমণির পরশে সমস্ত বিশ্বজগৎ তাহ'লে জেগে উঠেছে! রাধার এত সুখ, এত আনন্দ! 'ধনি ধনি তুয়া নব নেহা।'—

সোহি কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচ বাণ অব লাখ বাণ হউ
মলয় পবন বহু মন্দা॥

হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে স্বতোৎসারিত এই বাণীর অনুভূতির ঢেউ রঙে ও রসে হৃদয়কে অতি সহজেই দোলা দিয়ে যায়। লাখ-লাখের সমাবেশে যে অতিশয়োক্তির উল্লেখ, তার

দ্বারাই বিদ্যাপতির কবিকৃতির যথার্থ লক্ষণটি আর একবার আমরা চিনে নিতে পারি। প্রকৃতপক্ষে, বিদ্যাপতির রাধার মনে এবম্বিধ দুঃখলেশহীন আনন্দানুভূতির দ্বিবিধ কারণও রয়েছে—তা মনস্তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক। যাঁকে না পাওয়ার জন্য এত দুঃখ, এত হাহাকার, তাঁকে পেয়ে গেলে আর তো আকাঙ্ক্ষা থাকে না। চরম প্রাপ্তিতো ঘটেই গেল। সুতরাং এতদিনের জ্বালা, যন্ত্রণা নিমেষেই লোপ পায়। প্রাপ্তির চরম আনন্দে দেহমন পুলকিত হয়ে ওঠে। আর আলোর রাজ্যে যে পৌঁছে গেছে, অন্ধকারের প্রতি আর তার দৃষ্টি থাকবে কেন? ভাবসম্মিলনের পর্যায়ে বিদ্যাপতির রাধা তাই আনন্দে আত্মহারা। বিদ্যাপতি রূপের কবি, রসের কবি, বিদ্যাপতি মনস্তত্ত্ব ও আধ্যাত্মিক গভীরতার কবি— ভাবোল্লাসের পদে সেই অসামান্য কবিকৃতির আর একবার অগ্নিপরীক্ষা হয়েছে। বলাবাহুল্য, বিদ্যাপতি কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন। ভাবসম্মিলনের পদে বিদ্যাপতি অতুলনীয়।)

॥ ১০

এর পর প্রার্থনার পদ। (বাংলাদেশে বিদ্যাপতির প্রার্থনা বিষয়ক তিনটি পদ সবিশেষ পরিচিত। এই তিনটি পদ প্রাক্‌চৈতন্য যুগের বৈষ্ণবের মুক্তি-বাঞ্ছারূপে দ্যোতিত হয়ে থাকে, ফলে এর কাব্যমূল্য হয়েছে উপেক্ষিত। কিন্তু কাব্যমূল্যের দিক থেকে, একে আমরা একেবারে নস্যাৎ করতে পারি না। ব্যক্তিজীবনের নৈরাশ্য ও বেদনার প্রতিফলনে সমুজ্জ্বল এই পদগুলি। নাগরিক পরিবেশের বিলাসোচ্ছল প্রমত্ততায় বিদ্যাপতির ভোগ-জীবন কেটেছে। জীবনের অপরাহ্ন বেলায় এসে তিনি অনুশোচনার তুষানলে জ্বলছেন— 'নিধুবনে রমণী রসরঙ্গে মাতলু' তোহে ভজব কোন বেলা।' মেঘে মেঘে বয়সের বেলা অনেক বেড়েছে, এখন পরকালের হিসাব-নিকাশের সময় এসেছে। তাই মাধবের কাছে কবির একান্ত মিনতি :

দেই তুলসী তিল এ দেহ সমর্পলু'
দয়া জনু ছোড়বি মোয়।

এতদিন কবি 'অমৃত তেজি কিএ হলাহল পিয়লু'।' এখন শেষ সমনের ভয়ে বিদ্যাপতি মাধবেরই পদপ্রান্তে আশ্রয় যাচ্ঞা করেন :

ভনই বিদ্যাপতি শেষ সমন ভয়
তুঅ বিনু গতি নাহি আরা।
আদি অনাদিক নাথ কহায়সি
অব তারণ ভার তোহারা॥

মাধবে একান্ত বিশ্বস্ততা ও পরম প্রশান্তির সুরে মেদুর এই পদগুলি রসমধুরও বটে। একদিকে আত্মবেদনার প্রকাশ, অন্যদিকে ভক্তহৃদয়ের পরম ঐকান্তিকতা সমুজ্জ্বল রূপ লাভ করেছে। হৃদয়ের আক্ষেপের, অন্তর্দাহের, নৈরাশ্যের রসাশ্রিত বাণীরূপ দানে বিদ্যাপতি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।)

॥ ১১ ॥

বিদ্যাপতি কুশলী শিল্পী। তাঁর পদে একদিকে ভাবের গভীরতা, অন্যদিকে আলঙ্কারিক শৃঙ্খলায় আবদ্ধ এক অনুপম সৃজন-কর্মের নিদর্শন। রাজসভার কবি বিদ্যাপতির রচনাকর্মের মূলে ভাবের আবেগের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল নাগরিক মানসজাত মণ্ডনকলার আধিক্য। সুচয়িত শব্দ-সম্পদের ব্যবহার তাঁর সৃষ্ট পদগুলিকে অসামান্য ব্যঞ্জনাগর্ভ করেছে। যেমন—

সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচ বাণ অব লাখ বাণ হোউ মলয় পবন বহু মন্দা॥

এখানে 'লাখ' শব্দটির বহুবার প্রয়োগে অনুপ্রাসের যে ধ্বনিস্পন্দন সৃষ্ট হয়েছে, তা হৃদয়ের আবেগবাহুল্যকে যেন স্বতোৎসারিত করে তুলেছে। অন্যদিকে লঘু ধ্বনিমূলক অক্ষরের প্রয়োগে (liquid sound) হৃদয়ের কামনা থরোথর বেপথুমানতার নিবিড় স্পর্শ পাওয়া যায়। এই পথ বেয়েই রাধা-হৃদয়ের আবেগের ঢেউ যেন সমগ্র বিশ্ব-প্রকৃতিতে ছড়িয়ে পড়েছে।

রাজসভার কবি বিদ্যাপতি নাগরিক চেতনার প্রয়োজনেই বহু 'বৈদগ্ধ্যপূর্ণ ভণিতা' উচ্চারণ করেছেন। অজস্র অলঙ্কারের সুষ্ঠু প্রয়োগ তিনি করেছেন। যেমন—

শীতের ওঢ়নী পিয়া গিরীষের বা।
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না॥ (রূপক)

ঘন ঘন আঁচর কুচগিরি কাঁচর হাসি হাঁসি তঁহি পুন হেরি।
জনু মঝু মন হরি কনয়া কুম্ভ ভরি মুহরি রাখল কত বেরি॥ (উৎপ্রেক্ষা)
ঝম্পি ঘন গরজন্তি সন্ততি ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্তপাহুন কাম দারুণ সঘন খরশর হন্তিয়া॥ (অনুপ্রাস)
চিকুরে গরএ জলধারা।
মুখশশী ভয়ে কিএ কাঁদে আঁধিয়ারা॥ (সন্দেহ)
অঙ্কুর তপন তাপে যব জারব কি করব বারিদ মেহে।
ই নব যৌবন বিফলে গোঁয়ায়ব কি করব সো পিয় নেহে॥ (দৃষ্টান্ত)

জ্ঞানদাস

॥ ১ ॥

কোন বিশিষ্ট তত্ত্বভাবনাকে কাব্যাকারে প্রকাশ করতে গেলে দু' ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। প্রথমে দরকার সেই তত্ত্বটির যথাযথ উপলব্ধি; দ্বিতীয়ত, তত্ত্বকে রসাশ্রিত কবিআকারে প্রকাশের জন্য সৃষ্টির বাদুদণ্ডপ্রতিভা। সত্য বটে, বৈষ্ণবপদাবলী কাব্য বৈষ্ণবতত্ত্বের রসভাষ্য। বৈষ্ণব-সাধক-কবিগণ বৈষ্ণবতত্ত্ব-কথাকে বাণীর রসরূপে ভাস্বর দিয়েছেন পরম বাঞ্ছিতের উদ্দেশে। তবে তত্ত্বকথা সর্বদাই যে তাঁদের পদে সার্থক রসরূপ

লাভ করতে পেরেছে, তা নয়। কারণ তত্ত্বোপলব্ধি ও ভক্তি এক কথা, কবিত্বশক্তি অন্য কথা। কবিত্বশক্তি না থাকলে ভক্তিবশে ছন্দায়িত তত্ত্বকথা শ্রেষ্ঠ কবিতা হয়ে উঠতে পারে না। কিন্তু একথা সত্য যে, বৈষ্ণব সাধকদের মধ্যে এমন কয়েকজন অন্ততঃ ছিলেন, যাঁরা অতুলনীয় সৃষ্টিক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। তাই তাঁদের রচনা শুধু নীরস তত্ত্বকথায় পরিণত হয়নি, শ্রেষ্ঠ কাব্যমূল্যেও তা' হ'তে পেরেছে অভিষিক্ত। জ্ঞানদাস ছিলেন সেই শ্রেষ্ঠ কবিদের একজন—চৈতন্যোত্তর বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।

জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য। আবেগের গভীরতা, অনুরাগের আধিক্য, দুঃখের মধ্যে সুখ, সুখের মধ্যে দুঃখ এবং সুখদুঃখকে এক বেণীবন্ধনে বেঁধে নেওয়ার আকূতি, চণ্ডীদাসের পদে সহজলভ্য। কিন্তু চণ্ডীদাসের পদে প্রকাশভঙ্গী নামে কথাটি একেবারে প্রায় অচল। আত্মসচেতন হয়ে চণ্ডীদাস কোন পদ রচনা করেছেন বলে মনে হয় না। তাছাড়া তিনি ভাবের এমন গভীরে চলে গেছেন, যেখানে অনুভূতিটুকুই তাঁর একমাত্র সম্বল। সেই অনুভূতির অলঙ্কৃত প্রকাশে তিনি মোটেই তৎপর নন। ফলে চণ্ডীদাসের পদাবলী ভাবের অনাবৃত প্রকাশে সমৃদ্ধ। অপর দিকে গোবিন্দদাসের পদে পাওয়া যায় অলঙ্করণ ও মণ্ডনকলার সমারোহ। বক্তব্যকে কেমন করে সাজিত করে নয়ন-মন এক সঙ্গে হরণ করা যায়, এ বিষয়ে গোবিন্দদাস অত্যধিক সচেতন। জ্ঞানদাসের পদে আমরা পাই এ দুয়ের সংমিশ্রণ। ভাবের গভীরতা ও মণ্ডনকলা—দুইই তাঁর পদে লক্ষণীয়। অতি গভীর ভাবের যথাযথ প্রকাশের জন্য যেটুকু অলঙ্করণ প্রয়োজন, জ্ঞানদাস তাতে নারাজ হন নি। কিন্তু অতিরিক্ত অলঙ্করণের পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। অতিরিক্ত অলঙ্কার সাহিত্যের ভারস্বরূপ হয়ে পড়ে। কিন্তু অলঙ্কার সাহিত্যের সামগ্রী হয়ে উঠতে পারে তখনই, যখন ভাব ও ভাষার সমন্বয়ে অলঙ্কার প্রসাধনরূপে কাব্যদেহের লাবণ্য বিচ্ছুরিত করে। জ্ঞান-দাসের কাব্যে আত্যন্তিক অনুভূতি অতি সাদা ও সহজ কথায় কিম্বা সামান্যমাত্র অলঙ্করণের ফলে অপূর্ব শিল্পবস্তু হয়ে উঠতে পেরেছে।

চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব পদকর্তা জ্ঞানদাসের বৈষ্ণবতত্ত্ব সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞান থাকা স্বাভাবিক। নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব হয়ে সে তত্ত্বকে সম্যক্ অনুশীলন তিনি করেছেন জীবনে ও কাব্যে। প্রভুপাদ নিত্যানন্দকে তিনি স্বচক্ষে দর্শনের সৌভাগ্যলাভ করেছিলেন। কিন্তু জ্ঞানদাসের আর একটা পরিচয়, তিনি কবি। তাই কবিমনের বিশেষ প্রবণতা বশে রসপর্যায়ের কয়েকটি দিকেই শুধু তিনি কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছেন। যেমন, পূর্বরাগ, রূপানুরাগ, আক্ষেপানুরাগ প্রভৃতি। "জ্ঞানদাসের বাসকসজ্জা, খণ্ডিতা ও কলহান্তরিতার পদ সংখ্যায় কম হইলেও কাব্য-সুষমায় অন্য কোন কবির রচনা হইতে ন্যূন নহে। জ্ঞান-দাসের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান হইতেছে তাঁহার পূর্বরাগ, আক্ষেপানুরাগ, দান ও নৌকাবিলাসের পদগুলি।" (ড. বিমানবিহারী মজুমদার) কিন্তু অনেকক্ষেত্রে কবিকল্পনা যেখানে সাড়া দেয়নি, ভক্তের কর্তব্য বশে পদ রচনা করেছেন, তা রসমধুর হয় নি। যেমন, গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ। রাধাকৃষ্ণলীলা কবিকল্পনাকে সমধিক উদ্বোধিত করেছিল। জ্ঞানদাস রাধার হৃদয়বেদনার ঘনীভূত নির্যাস দিয়ে যেন তাঁর পদগুলি রচনা করেছেন।

চণ্ডীদাস-ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক জ্ঞানদাস বস্তুবিদ্ধ কবি নন। বস্তুর রূপাঙ্কনে কখনো কখনো অগ্রসর হলেও, কোন্ মায়াবলে তিনি এক মুহূর্তে রূপ থেকে স্বরূপে চলে যান। বহিঃসৌন্দর্যচ্ছবি আঁকা আর হয় না। হৃদয়সৌন্দর্যের ঝরোকাখানি তিনি উন্মোচন করেন। আর রসজ্ঞগণ মর্ম দিয়ে উপলব্ধি করেন তার মাধুর্য। জ্ঞানদাসের রাধা রূপ দেখতে গিয়ে বলে ফেলেন: 'যত রূপ তত বেশ ভাবিতে পাঁজর শেষ।' বলা যায়, কবি জ্ঞানদাস রাধার অন্তঃস্বরূপ-সৌন্দর্য-পাপড়ি উন্মোচনে অধিকতর যত্নবান হয়েছেন, কিন্তু বহিঃসৌন্দর্যের পথ ধরে এটাও সত্য। বস্তুত, দেহ ও মন—দুইয়েরই অধিষ্ঠান কবির পদে রয়েছে। তবে দেহের সীমায় কবি আবদ্ধ থাকেন নি; দেহের পথ ধরে তিনি সীমাহীন মনের অনন্ত আকাশের নীলিমারাজ্যে উপনীত হয়েছেন। সেখানে দেহ-তটিনীর কূল চোখে পড়ে না, তা মনের অনন্ত মহাসমুদ্রে পরিণত। জ্ঞানদাসের পদে দেহ ও মনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অনুপম কাব্যসূত্রে বিধৃত হয়েছে—এটাও অস্বীকার করবার জন্য। সমালোচকের ভাষায়—"দেহের সঙ্গে মনের যে নিবিড় সম্পর্ক তাহা জ্ঞানদাসের পদে যেমন অভিব্যক্ত হইয়াছে, এমনটি আর কোন বৈষ্ণব মহাজনের পদে নহে।"

জ্ঞানদাস বাংলা ও ব্রজবুলি—উভয় ভাষায় পদ রচনা করেছেন। বাংলা ভাষায় রচিত পদগুলি কাব্যাংশে অতি উৎকৃষ্ট। কিন্তু ব্রজবুলিতে রচিত পদগুলিতে কবিকল্পনা তেমন সাড়া দেয় নি। স্পষ্টই বোঝা যায়, তাঁর ভাব ও ভাবনা প্রকাশের উপযুক্ত বাহন বাঙলা ভাষা, কিন্তু যেখানে চাতুর্য ও পারিপাট্যের সমারোহ দেখাতে চেয়েছেন, সেখানে তিনি ব্রজবুলির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। কিন্তু জ্ঞানদাসের কবিমনের পক্ষে ব্রজবুলি উপযুক্ত বাহন নয়। শব্দচিত্র ও অলঙ্কারের সমারোহে ব্রজবুলির মাত্রাবৃত্ত ছন্দে যে রাজকীয় ঐশ্বর্যের আভাস, সেখানে চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের কবিচিত্ত ঠাঁই পাবে কেন? একে প্রতিভার দৈন্য বললে ভুল হবে। বলা যেতে পারে, এটা প্রতিভার বিশেষ অভিব্যক্তি।

চণ্ডীদাস-শিষ্য জ্ঞানদাসের রাধার কণ্ঠ অতি উচ্চ নয়। সুখের মাঝেও দুঃখের আভাস। আবার দুঃখের মুহূর্তেও বিদ্যাপতির রাধার মত জ্ঞানদাসের রাধা বিশ্বসংসারকে তাঁর দুঃখের কাহিনী শোনাতে বসেন না। তুষের আগুনের মত রাধার হৃদয় বেদনা ধিকিধিকি জ্বলতে থাকে, অনুচ্চ বিলাপের মধ্য দিয়ে তার আভাস পাওয়া যায় মাত্র।

জ্ঞানদাসের পদে আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। কবিকল্পনা স্বল্প পরিসর বর্ণনার মধ্যেই সার্থক। দীর্ঘায়িত বর্ণনায় কবিচিত্ত যেন খেই হারিয়ে ফেলে। ফলে দেখা যায় যে, একটি পদেরই প্রথমাংশ অতি উৎকৃষ্ট শিল্পবস্তু হয়ে উঠেছে, কিন্তু অপরাংশ কবিত্ব-বিবর্জিত পদ্য ছাড়া আর কিছুই নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'আলো মুঞি জানোনা। জানিলে যাইতাম না কদম্বের তলে॥'—পদটির উল্লেখ করা যেতে পারে।

তাঁর পদে চিত্তধর্ম প্রাধান্য বিস্তার করলেও চিত্রধর্ম একেবারে অনুপস্থিত থাকে নি। শব্দ-চিত্র ও ধ্বনি-চিত্র—দুইয়েরই রূপায়ণে আমাদের কবি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। যেমন—

রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন
রিম্‌ঝিম্‌ শবদ বরিষে।
পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরষে॥

সমালোচকের ভাষায়, "এমন আশ্চর্য্য শব্দমন্ত্র, রূপচিত্র, রহস্যময় বর্ষার আবেষ্টনী, এমন ভাষা-সুর-ছন্দের অনিবার্য্য মায়াবিস্তার—জারক শক্তি—ইহা নিত্যকালের একটি চিহ্ন হইয়া রহিল।" (শঙ্করীপ্রসাদ বসু)

জ্ঞানদাসের কল্পনা-বিহঙ্গ সুদূর নীলিমাপথে পক্ষবিধূননের জন্য ব্যাকুল। বৈষ্ণব তত্ত্বে মর্ত পৃথিবীতে দাঁড়িয়েও দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে অলৌকিকতার দিকে। তাই বস্তুবিদ্ধ জীবনবেদনা অপেক্ষা আধ্যাত্মিকতার অলৌকিকতার সুষমাস্বর্গ রচনা বৈষ্ণব কবির পক্ষে অনেক কাম্য। আর সেক্ষেত্রে 'An extraordinery development of imaginative sensibility'-র সুযোগ অনেক বেশী। মর্তচারী হয়েও অমর্তের বাসনা স্বভাবতঃই বৈষ্ণবকবিকে অনেক কল্পনা ও স্বপ্নচারিতার অবকাশ দিয়েছে। বৈষ্ণবকবি জ্ঞানদাস সেই সুযোগ পূর্ণমাত্র গ্রহণ করেছেন। এর জন্য তাঁর কবিস্বভাবই দায়ী। আমাদের পরিচিত মর্তপৃথিবীর উপর দাঁড়িয়ে কবিকল্পনা সুদূরে উধাও হতে চেয়েছে, কিন্তু ভক্তির পটভূমিকায় মানবিক প্রেম-প্রীতির আকাঙ্ক্ষার চিত্রটিকে অপূর্ব সমন্বিত করেছেন। মর্তের মাঝে অমর্তচারিতা, অসীম পটে কল্পনাবিহঙ্গের পক্ষবিধূনন, শব্দ-ছন্দের সুরঝঙ্কারে মেঘমেদুর মনের আবেশতরঙ্গ—সব মিলিয়ে জ্ঞানদাসের পদে রোমান্টিকতার আস্বাদ মেলে। যেমন—"রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল। যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥ ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরান। অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি করে প্রাণ॥"—এখানে রাধার হৃদয়ের যে আকুলতা ধরা পড়েছে, তা নিত্যকালের চিত্তপটের এক অসামান্য শিল্পসৌন্দর্যের অপরূপ নিদর্শন। যৌবনের বনে রাধার মন হারানোর বিস্ময়কর বর্ণনা জ্ঞানদাসের কবিকর্মের শ্রেষ্ঠত্বকে চিনিয়ে দিতে ভুল করে না।

প্রস্ফুটিত পদ্মের বিকশিত সৌন্দর্য নিয়ে বৈষ্ণব সাহিত্যের অঙ্গনে জ্ঞানদাসের আবির্ভাব হয়নি। প্রথম জীবনে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি মহাজন কবির অনুকরণ করে তিনি সিদ্ধির মন্ত্র অন্বেষণ করেছিলেন। কিন্তু নিজের মৌলিক বৈশিষ্ট্যটিও খুঁজে নিতে তাঁর খুব বেশী দেরি হয় নি। শেষ পর্যন্ত "তিনি বিদ্যাপতির আলঙ্কারিক রীতি পরিত্যাগ করিয়া চণ্ডীদাসের ও নরহরি সরকারের সহজ সরল মরমী রীতিতে পদ রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। এই পথে তাঁহার সাফল্য হইল অনন্যসাধারণ।" (বিমানবিহারী মজুমদার) তবে আগেই বলেছি, চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য জ্ঞানদাসের নিজস্ব কাব্যবৈশিষ্ট্যও তুল্যরূপে বর্তমান।

॥ ২ ॥

আগেই বলা হয়েছে, গৌরলীলা বিষয়ক পদে জ্ঞানদাসের কবিকৃতি তত উজ্জ্বল নয়। গৌরতত্ত্বের নিগূঢ়রহস্য কবিতায় পরিস্ফুট করেছেন তিনি, কিন্তু তা যে যথোচিত

লাভ করতে পেরেছে, তা বলা যায় না। কিন্তু এসব পদের ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট। জ্ঞানদাসের পদে গৌরাঙ্গ তাঁর পরিপূর্ণ মহিমা নিয়ে ফুটে উঠেছেন। যেমন :

কাঞ্চণ বরণ গৌর তনু মোহন,
প্রেমে আকুল দুই নয়ন ঝরে।
করিকর ললিত, আজানুলম্বিত
ভুজযুগ শোভিত পুলক ভরে ॥…

তত্ত্বের প্রতি অতি নিষ্ঠায় কাব্য এখানে কিঞ্চিৎ আড়ষ্ট। কিন্তু একটি পদে জ্ঞানদাস কবিকৃতির পরিচয় দিয়েছেন :

সহচর অঙ্গে গোরা অঙ্গ হেলাইয়া।
চলিতে না পারে খেণে পড়ে মুরছিয়া ॥
অতি দুর্বল দেহ ধরণে না যায়।
ক্ষিতি তলে পড়ি সহচর মুখ চায় ॥
কোথায় পরাণ-নাথ বলি খেণে কান্দে।
পূরব বিরহ জ্বরে থির নাহি বান্ধে ॥
কেনে হেন হৈল গোরা বুঝিতে না পারি।
জ্ঞানদাস কহে নিছনি লৈয়া মরি ॥

অতি সহজ সরল ভাষায় প্রকাশিত মহাপ্রভুর পূর্বরাগ বেদনার চিত্রটি সুন্দর ফুটেছে।

ভক্তকবি জ্ঞানদাস গৌরলীলাবিষয়ক পদে কবিকৃতির বৈশিষ্ট্য তেমন মহৎ করে দেখান নি সত্য। কিন্তু তিনি যে গৌরময় ছিলেন, তা তাঁর বিভিন্ন পদের নানা ছত্রে প্রকাশিত। বহু গৌরলীলা পদ তিনি সোৎসাহে রচনা করেছেন। কিন্তু তা অধিকাংশই ভক্তের দৃষ্টিতে, যেখানে কবিধর্ম নিশ্চিতভাবেই গৌণ হয়ে পড়েছে। আসলে নিত্যানন্দ-শিষ্য জ্ঞানদাসের হৃদয়ের মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য কিরূপ মণিময় আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তা সহজেই অনুমেয়। স্বরূপ দামোদরের অনুসরণে তিনি বলেছেন—'শচীগর্ভ সিন্ধু মাঝে / গৌরাঙ্গ রতন রাজে / প্রকট হৈলো অবনীতে। / হেরি সে রতন আভা / জগত হইল লোভা / পাপ তম লুকাল তুরিতে।" কিংবা—"কাঞ্চন বরণ গৌরতনু মোহন প্রেমে আকুল দুই নয়ন ঝরে। / করিকর ললিত আজানুলম্বিত ভুজযুগ শোভিত পুলকভরে।" —পদে ভক্তকবির নিছক চৈতন্যরূপ বর্ণনা মাত্র। 'গদগদ ভাব হাস সে রোয়ত অরুণ নয়নে কত চন্দ্রকত লোর'—প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ, অবশ্য জ্ঞানদাস সংগৃহীত। এ ভাবে দেখা যায় করুণাঘন গৌরাঙ্গের রূপ ও করুণা বর্ণনায় জ্ঞানদাস মুখর হয়েছেন। তবে একটি পদে জ্ঞানদাস ব্রজ অনুগত গোপী রূপে গৌররূপী কৃষ্ণকে আরাধনা করেছেন এবং আত্মনিবেদন করেছেন গৌরপদে। প্রচলিত অর্থে এটি গৌরচন্দ্রিকা হয়ত নয়, কিন্তু তারই ভিন্নরূপ, তা অস্বীকার করা যায় না—

গৌরাঙ্গ আমার ধরম করম গৌরাঙ্গ আমার জাতি।
গৌরাঙ্গ আমার কুলশীল মান গৌরাঙ্গ আমার গতি ॥

গৌরাঙ্গ আমার পরাণপুতলী গৌরাঙ্গ আমার স্বামী।
গৌরাঙ্গ আমার সরবস ধন তাহার দাসী যে আমি॥
হরিনাম রবে কুল মজাইল পাগল করিল মোরে।
যখন সে রব করয়ে বন্ধুয়া রহিতে না পারি ঘরে॥
গুরুজন বোল কানে না করিব কুলশীল তেয়াগিব
জ্ঞানদাস কহে বিনিমূলে সেই গৌরপদে বিকাইব॥

অনুরূপ আর একটি পদে প্রেমভক্তের এরূপ চৈতন্য-র প্রতি আসক্তি এবং কুলবধূর মত সর্বস্ব সমর্পণ করে আত্মনিবেদন সুরটির অনাবিল প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। পদটিএই—

(সই) দেখিয়া গৌরাঙ্গ চাঁদে।
হইনু পাগলী আকুলি বিকুলি পড়িনু পিরীতি ফাঁদে॥
(সই) গৌর যদি হৈত পাখী।
করিয়া যতন করিতু পালন হিয়া পিঞ্জরায় রাখি॥...
(সই) গৌর যদি হৈত মধু।
জ্ঞানদাস কহে আস্বাদ করিয়া মজিত কুলের বধূ॥

॥ ৩ ॥

আমাদের কবি রাধাকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করেছেন। রাধার রূপ বর্ণনায় কবি লাবণ্য ঢলঢল কষিত-কাঞ্চনতনু রাধার নবযৌবন-হিল্লোলের চকিত চমকটুকু তুলিকার আঁচড়ে ধরে রাখতে চেয়েছেন। কিন্তু কিছুদূর গিয়েই বলে ফেলেছেন: 'রাই কি বলিব আর কি বলিব আর। ভুবনে কি দিয়ে হেন উপমা তোমার।' তবে ২।১ টি পদে কবি রাধার রূপ সৌন্দর্য অঙ্কনে সিদ্ধিলাভ করেছেন। রাধাকৃষ্ণের এই রূপবর্ণনা বয়ঃসন্ধিতে এবং পূর্বরাগে বিভিন্ন ভাবে অঙ্কিত হয়েছে। বয়ঃসন্ধি পর্যায়ে কৈশোর ছেড়ে যৌবন অবস্থায় উপনীত হতে যাচ্ছে, তাতে দেহের এবং সেই সঙ্গে মনেরও বিচিত্র পরিবর্তন-চিহ্নের পরিচয় থাকে। পূর্বরাগ পর্যায়ে রূপদর্শন জনিত অনুরাগের বিচিত্র অনুভূতির বর্ণনাসূত্রেই রূপের বর্ণনা। জ্ঞানদাস বয়ঃসন্ধি পর্যায়ে ২।৪ টি উল্লেখযোগ্য পদ রচনা করেছেন। একটি পদে কৃষ্ণের রূপমুগ্ধতার আবেশে রাধার রূপবর্ণনা অপেক্ষা স্বরূপের পরিচয়ই বেশি ফুটেছে। কিন্তু জ্ঞানদাস দু-চারটি কথার মধ্য দিয়ে রাধার অনুপম রূপসৌন্দর্যের পরিচয় সুন্দর ভাবে দিয়েছেন, তাও লক্ষণীয়। যেমন—

খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ।
হেরত না হেরত সহচরী মাঝ॥
বোলইতে বচন অলপ অবগাই।
হসত না হসত মুখ মুচুকাই॥

এ সখি এ সখি কি পেখলুঁ নারী।
হেরইতে হরখে হরল যুগ চারি ॥
উলটি উলটি চলু পদ দুই চারি।
কলসে কলসে জনু অমিয়া উথারি ॥

পদটি রাধার বয়ঃসন্ধির এবং সেই সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগেরও। রাধা সখীদের সঙ্গে খেলছেন বালিকাসুলভ আগ্রহ ও চপলতাবশতঃ, আবার লোক দেখে লজ্জাও পাচ্ছেন যৌবন ছোঁয়ার কারণে। অল্পকথা, মুখ টিপে হাসা– এ সবই নব পরিবর্তনের লক্ষণ। এই অপরূপ নারীর রূপসৌন্দর্য নিরীক্ষণ করে কৃষ্ণের হৃদয় যেন শেলবিদ্ধ হয়েছে, চিত্ত স্তব্ধ। রাধার অপরূপ অনন্ত সৌন্দর্যের পরিচয় শেষ দুটি পংক্তিতে। মৃদুমন্দ গমনরত রাধার আন্দোলিত দেহবল্লরী থেকে যেন কলসী কলসী অমৃত উজারিত হচ্ছে। এই একটি পংক্তির মধ্য দিয়েই রাধার দেহসৌন্দর্যের অনুপম চিত্রটি উদ্ঘাটিত। নিখুঁত বর্ণনার মধ্য দিয়ে এই চিত্রাঙ্কন আদৌ সম্ভব হোত কিনা সন্দেহ। বরং কৃষ্ণের রূপ বর্ণনায় জ্ঞানদাস যথেষ্ট সাফল্যলাভ করেছেন :

চূড়াটি বান্ধিয়া উচ্চ কে দিল ময়ূর পুচ্ছ
ভালে সে রমণী মনোলোভা।
আকাশ চাহিতে কিবা ইন্দ্রের ধনুক খানি
নব মেঘে করিয়াছে শোভা ॥

মল্লিকা-মালতীর মালা দিয়ে চূড়াটি ঘিরে দেওয়া হোল—মনে হচ্ছে যেন নীল গিরিশিখর থেকে সুরধুনী নদী বয়ে চলেছে। কালার কপালে চন্দনের টিপ, মধ্যে ফাগুর বিন্দু। মনে হচ্ছে কেউ যেন রূপোর পাত্রে জবা ফুল দিয়ে তা কালিন্দীতে পূজার মানসে ভাসিয়ে দিয়েছে। কৃষ্ণের এই সজ্জিত রূপমাধুরী এক লহমায় দেখার নয়। তাই—

জ্ঞানদাসেতে কয় মোর মনে হেন লয়
শ্যাম রূপ দেখি ধীরে ধীরে ॥

বৈষ্ণব জ্ঞানদাসের লেখনিতে জবার উপমা—একটু আশ্চর্য লাগে বৈকি! তবে এখানে ভক্ত নন, কবিই প্রধান হয়ে উঠেছেন।

॥ ৪ ॥

পূর্বরাগের বর্ণনায় আমাদের কবিকণ্ঠ মুখর। এ তাঁর স্বক্ষেত্র। তুলির অল্প আঁচড়ে অবলীলাক্রমে রাধার হৃদয়াকৃতি জ্ঞানদাস যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, তা একমাত্র চণ্ডীদাস ছাড়া তুলনারহিত। কৃষ্ণের রূপ দর্শনে ও গুণ শ্রবণে রাধার পূর্বরাগের সূচনা। কিন্তু আপন হৃদয়ের আকুলতা তাঁকে এ পর্যায়েই বহুদূরে নিয়ে গেছে, যেখানে রাধার হৃদয়-শতদলের এক একটি পাপড়ির রহস্য উন্মোচিত হচ্ছে তাঁর বিলাপের মধ্যে। কৃষ্ণরূপ দর্শনে রাধার প্রথম অনুভূতি :

চিকণ কালিয়ারূপ, মরমে লাগিয়াছে
ধরণে না যায় মোর হিয়া।
কত চাঁদ নিঙারিয়া মুখখানি মাজিয়াছে
না জানি তায় কত সুধা দিয়া॥

কৃষ্ণের প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আকর্ষণ-সৌন্দর্যে রাধা বিকল—'নবীন মেঘের কোরে, বিজুরী প্রকাশ করে, জাতিকুল মজাইলাম তায়॥' রাধা পরিপূর্ণ আত্মহারা এখনো হন নি—তাই কৃষ্ণরূপ দর্শনের চিত্রটি একান্তমনে আস্বাদন করছেন। রাধা দেখেন, কৃষ্ণের 'লাবণ্য ঝরয়ে মকরন্দ।' আবার কখনো বলেন—

দেইখা আইলাম তারে সই দেইখা আইলাম তারে।
এক অঙ্গে এত রূপ নয়ানে না ধরে॥

রূপ দর্শন হোল। দর্শনের আকাঙ্ক্ষা সেখান থেকে ক্রমে বেড়েই চলল। কারণ 'শ্যামের বিষম নেই' দেখে রাধা—'দেখিয়া শ্যামের রূপ হৈলাম অচেতন।' ফলে গৃহকর্মে ঔদাসিন্য, সমাজ-সংসারের প্রতি বিরক্ত—'আমা হৈতে জাতি কুল নাহি গেলো রাখা।'

'কি রূপ দেখিলাম কালিন্দী কূলে।
অপরূপ রূপ কদম্ব মূলে॥'

কালিন্দীকূলে তরুমূলে সহজ শ্যামতনুর ত্রিভঙ্গিম রূপ। সে রূপে মুগ্ধা রাধা কলসে জল ভরতে ভুলে গেছেন। রাধা ভাবছেন—

যত রূপ তত বেশ, ভাবিতে পাঁজর শেষ
পাপ চিতে নিবারিতে নারি।

কৃষ্ণের সাক্ষাৎ-দর্শনে রাধা একেবারে বিমুগ্ধা। তাঁর চিত্তে অনুক্ষণ কানুর রূপসুন্দর মূর্তিখানি অঙ্কিত রয়েছে।—'তরু অবলম্বন কে। / হৃদয় নিহিত মণি / মাল বিরাজিত / শ্যামল সুন্দর দে॥'—কদম্ব তরুতলে অবস্থানরত কৃষ্ণের শ্যামল সুন্দর মূরতি রাধার হৃদয়কে অধিকার করেছে, তাই – 'ও রূপ অবিরত ভাবিতে যাউ মোর কাল।' এ বর্ণনার প্রথমাংশে রূপের, দ্বিতীয়াংশে স্বরূপের সন্ধানানুভূতি। এখন—নিজের উপরে যেন ধিক্কার এসে গেছে, কেননা রাধার সমস্ত মন-প্রাণ যিনি অধিকার করেছেন, তাঁকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তো সুদূরপরাহত—উপলব্ধির গভীরে শুধু হৃদয়মথনজনিত আকুলতা—

আলো মুঞি জানো না—
জানিলে যাইতাম না কদম্বের তলে।
চিত মোর হরিয়া নিলে ছলিয়া নাগর ছলে॥
রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥
ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরান।

রূপের পাথারে যার আঁখি ডুবে আছে, যৌবনের গহন অরণ্যে যার মন হারিয়ে গেছে, কৃষ্ণ-তিমিরে যাকে গ্রাস করেছে, তার পক্ষে চর্মচক্ষু দিয়ে রূপ-দর্শন আর সম্ভব নয়, মর্মচক্ষু

দিয়ে তাই উপলব্ধি করতে হয় স্বরূপ। এখন 'হৃদয়ে পশিল রূপ পাঁজর কাটিয়া', তবু রূপানুরাগে রূপের কথা এসে পড়লেও স্বরূপের কথাই সেখানে প্রধান :

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বাঁধে॥

এ পর্যায়েও রাধার সমাজ-সংস্কারের বাঁধা বিষয়ে সচেতনতা লক্ষণীয়-

"জাতি কুল শীল সব হেন বুঝি গেল।
ভুবন ভরিয়া মোর ঘোষণা রহিল॥
কুলবতী হইয়া দুকূলে দিলু' দুখ।"

দেহ ও মন, রূপ ও স্বরূপের এমন নিবিড় সম্পর্ক কজন বৈষ্ণব কবি কথার তুলি দিয়ে অঙ্কিত করতে পেরেছেন ? দরশ ও পরশের জন্য গা এলিয়ে পড়ার সরল বর্ণনার মধ্যে গভীরতম আবেগের মহত্তম বাণীর সুর শোনা যায় না কি ?

মনের উপরিতলে একদিন রূপ প্রতিচ্ছবি ফেলেছিল, একথা ঠিক। কিন্তু কোন্ মুহূর্তে মন রূপ হতে অরূপে চলে গেছে—মনের মণিকুট্টিমে চলেছে সেই অরূপের ধ্যান—

গুরুগরবিত মাঝে রহি সখী-সঙ্গে।
পুলকে পূরয়ে তনু শ্যাম-পরসঙ্গে॥
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥

জ্ঞানদাসের স্বপ্নদর্শন-বিষয়ক পূর্বরাগের—ধ্বনি, ব্যঞ্জনা, মাধুর্যে ভরা—একটি পদ অতুলনীয়। পদটি 'মনের মরম কথা '।

মনের মরম কথা তোমারে কহিএ হেথা
শুন শুন পরাণের সই।
স্বপনে দেখিলু' যে শ্যামল বরণ দে
তাহা বিনু আর কারো নই॥
রজনী শাওন ঘন ঘন দেয়া গরজন
রিমিঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে॥
শিখরে শিখণ্ডরোল মত্ত দাদুরী বোল
কোকিল কুহরে কুতূহলে।
ঝিঁ ঝা ঝিনিকি বাজে ডাহুকী সে ধন গাজে
স্বপন দেখিলু' হেন কালে॥

চাক্ষুষ দর্শনে তো কথাই নেই। স্বপ্নে দর্শনের প্রভাবও-যে রাধার চিত্তকে কিভাবে ব্যাকুল করে তুলেছে, তা পদটিতে শিল্পসম্মতভাবে ব্যঞ্জিত হয়েছে। একদিকে রূপ-দর্শনের উন্মাদনা, অন্যদিকে স্বরূপে অনুভবের ভাবগম্ভীর, রসমধুর বেপথুমানতা রাধাকে কিভাবে উতলা করে তুলেছে, আলোচ্য পদটিতে তার সার্থক প্রতিফলন। পদটির রোমান্টিক স্বপ্নচারিতা, অনুভবের গাঢ়তা, শব্দের ধ্বনি-মাধুর্য, ছন্দের নূপুর নিক্কণ—সব মিলিয়ে পদটি এক আশ্চর্যসুন্দর সম্পদ বিশেষ হয়ে উঠেছে, সন্দেহ নেই।

কৃষ্ণের পূর্বরাগ বর্ণনায় জ্ঞানদাসের কৃতিত্ব তেমন নেই। এর কারণ আগেই বলা হয়েছে। এ জাতীয় একটি পদে কৃষ্ণের হৃদয়বার্তা প্রকাশ অপেক্ষা রাধার চিত্রই উদ্ঘাটিত :

খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ।
হেরত না হেরত সহচরী মাঝ॥
বোলাইতে বচন অলপ অবগাই।
হাসত না হাসত মুখ মচুকাই॥
এ সখি এ সখি দেখলুঁ নারী।
হেরল হরখে হরল যুগ চারি॥
উলটি উলটি চলু পদ দুই চারি।
কলসে কলসে যেন অমিয়া উঝারি॥

শেষ দুই পংক্তিতে দেখা যায়, স্বল্পশব্দ ব্যবহারে রাধার সৌন্দর্য ও গমনভঙ্গীর চিত্র উজ্জ্বল হ'য়ে ফুটেছে।

॥ ৫ ॥

অভিসার বর্ণনায় স্বভাবতই জ্ঞানদাস সার্থক নন। তবে অন্ততঃ দুটি পদ আছে, যেখানে কবি অভিসারের উৎকণ্ঠা, আকৃতি, পরিবেশ অতি সুন্দরভাবে অঙ্কিত করেছেন। পদ দুটি বর্ষাভিসারের :

মেঘযামিনী অতি ঘন আন্ধিয়ার।
ঐছে সময়ে ধনী করু অভিসার॥
ঝলকত দামিনী দশ দিশ আপি।
নীল বসনে ধনী সব তনু ঝাঁপি॥
দুই চারি সহচরী সঙ্গহি নেল।
নব অনুরাগ ভরে চলি গেল॥

দুই চারি সহচরী সঙ্গে নিয়ে সংকেতকুঞ্জ অভিমুখে গমনের ফলে অভিসারের তাৎপর্য ও দুঃখ ব্রতের মধ্য দিয়ে বঞ্চিতকে লাভের জন্য একাকিনী দুর্গম পথযাত্রিণী শ্রীরাধিকার তপস্যার নিদারুণতা অনেক হ্রাস পায়, সত্য। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, অভিসার বর্ণনায় জ্ঞানদাসের অবলম্বন 'উজ্জ্বলনীলমণি'—যেখানে সখী সঙ্গে অভিসারের কথাই আছে। আর একথাও ঠিক যে, জ্ঞানদাস রাধার বৃন্দাবনে কৃষ্ণের জন্য অভিসার বর্ণনা করতে গিয়ে বস্তুত শ্রীচৈতন্যদেবের নীলাচলাভিমুখে জগন্নাথদেবের জন্য অভিসারের বর্ণনাই করেছেন।

অন্য পদটিতে অভিসারের চকিত গমনভঙ্গীর সলজ্জ রূপ, আবেগ, উৎকণ্ঠা, অন্ধকার সর্পসঙ্কুল পথের বর্ণনা কবিকল্পনায় রসরূপ পেয়েছে। পদটি এই—

কানু অনুরাগে, হৃদয় ভেল কাতর
রহই না পারই গেহ।
গুরু দুরুজন ভয়ে, কিছু নাহি মানয়ে,
চীর নাহি সম্বরু দেহ॥

কিন্তু জ্ঞানদাস নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব—ফলে একটি পদে তিনি 'শ্যাম অভিসারে চলু বিনোদিনী রাধা'-র চিত্র আঁকতে গিয়ে এঁকেছেন চৈতন্যদেব ও তাঁর পার্ষদদের চিত্র:

আবেশে সখীর অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া।
পদ আধ চলে আর পড়ে মুরছিয়া॥
রবাব খমক বীণা সুমিল করিয়া।
প্রবেশিল বৃন্দাবনে জয় জয় দিয়া॥

বস্তুত অভিসার বর্ণনাকালে ভক্তকবি জ্ঞানদাসের কল্পদৃষ্টিতে অধিষ্ঠিত ছিলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য—যিনি রাধার মতই উন্মত্তভাবে ছুটেছিলেন নীলাচলের পথে এবং ভক্তমাত্রই জানেন যে, মহাপ্রভু জগন্নাথের মন্দির-চূড়া দর্শনমাত্রই শ্রীচৈতন্যের চলার গতিবেগ এতো বেড়ে গিয়েছিল যে, সঙ্গীরা তাঁর নাগাল পাননি। রাধার অভিসার বর্ণনা করতে গিয়ে জ্ঞানদাস শ্রীচৈতন্যের অভিসার বর্ণনা করেছেন। আর তাতে সেই ঐতিহাসিক চিত্রই ফুটে উঠেছে—

সখিগণ সঙ্গ তেজি চলু একসরি
হেরি সহচরীগণ ধায়।
অন্তরে প্রেম— তরঙ্গে তরঙ্গিত
তবহু' সঙ্গ নাহি পায়॥

॥ ৬ ॥

জ্ঞানদাস রসোদ্‌গার বিষয়ক পদ সৃষ্টিতে যথেষ্ট কবিকৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। রসোদ্‌গার-এর বিষয়বস্তু রাধাকৃষ্ণের রভসলীলার পরবর্তী কালে সখীদের কাছে রাধার সেই মিলনলীলার স্মৃতিচারণ। এতে একদিকে রাধা কৃষ্ণপ্রেমের গৌরবপ্রকাশ, অন্যদিকে মিলনজনিত আনন্দানুভূতির প্রকাশের দ্বারা যেন সেই মিলনলীলাকে নতুনভাবে উপভোগ করছেন। এ জাতীয় বর্ণনায় অনেক সময় অক্ষম কবির হাতে কামলীলার স্থূল বিবরণ মাত্র হয়ে ওঠে। কিন্তু কুশলী ভক্তকবি জ্ঞানদাসের শিল্পচাতুর্যে তাঁর সৃষ্ট পদগুলি অপরূপ রসের নির্যাস হয়ে উঠেছে। তবে, একথাও স্মর্তব্য যে, এ বিষয়ে তিনি তাঁর কাব্যগুরু চণ্ডীদাসের যোগ্য উত্তরসূরী। উভয়ের ভাব, ভাষা ও কথায় এত মিল যে, কোনটি কার পদ, তা চিনে নিতে বেশ অসুবিধায় পড়তে হয়। তবে এক্ষেত্রে আমাদের ধারণা, ঋণ যদি কেউ নিয়ে থাকেন, তা নিয়েছেন জ্ঞানদাস। তিনি অনেকক্ষেত্রে চণ্ডীদাসকে তো অনুসরণ

করেছেনই, দেখা যায়, বিদ্যাপতি, রামানন্দ বসু প্রমুখ কবিকেও তিনি অনুসরণ করেছেন। অবশ্য তা—"শিক্ষানবীশির যুগে"। তবে চণ্ডীদাসের সঙ্গে তাঁর কবি-আত্মার মিল অনেক অনেক বেশী—আর এ কারণেই জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসের সার্থক উত্তরসূরী রূপে পরিচিত।

রসোদ্গারের পদে রাধার কৃষ্ণপদে আত্মনিবেদনের পরবর্তী অবস্থা। পরমবাঞ্ছিত গোলকপতি সর্বগুণ ও রসের খনি। রাধার পরম সৌভাগ্য যে তিনি কৃষ্ণ সান্নিধ্যের অপরিসীম সম্পদে গরিয়সী হয়েছেন। কৃষ্ণকে তিনি ভালোবাসেন। কৃষ্ণের সঙ্গে রভস-লীলায় তাঁর যে ক্ষণটুকু কেটেছে, তার স্মৃতি রাধার কাছে বড় মধুর, বড় আনন্দের, বড় গর্বের। পুলকে পূরিত মনপ্রাণ নিয়ে রাধা তাই সেই মিলন স্মৃতিকে নিজে স্মরণ করেন, সখিগণের কাছে তার বিস্তৃত বিবরণ দেন নিজের ও কৃষ্ণের প্রেমের গৌরব ও অনুভবের আনন্দ প্রকাশের জন্য। কেননা কানুপ্রেমের তো অবধি নেই। সেই বর্ণনা-প্রসঙ্গে রাধা বলেন -

যব কানু আওল মন্দির মাঝে।
আঁচরে বদন ঝাঁপায়লুঁ লাজে॥
করে কর বারি ফুয়ল চীর মোর।
পিয়া বড় ঢিঠ কর রাখল আগোর॥
কি করব রে সখি কানুক নেহা।
ও সুখে মুগধী মুগধ মঝু দেহা॥

পরাণপ্রিয়-পিরীতিরসে স্নান করে রাধা কানুময় হয়েছেন। সখীসমাগমে তিনি কানুর সঙ্গে তাঁর মিলনলীলার বিবরণ দিচ্ছেন। প্রিয় যে তাঁর কত আপন, তাঁর সান্নিধ্যে গেলে তিনি রাধাকে কত আদর করেছেন, সব বলার পর রাধার অনুভূতি যে, তবু তিনি কানুর প্রেমসীমার হদিশ পান নি রাধার প্রেমের আর্তিও সেরূপ সীমাহীন।

রাধা কৃষ্ণের রূপগুণে মুগ্ধ, তাঁর সঙ্গে মিলনলীলার আবেগে তিনি বিহ্বল। সেই অনুভূতির কথা তিনি এক মুখে বলে শেষ করতে পারবেন না —'লাখ মুখে কহিতে না পাইয়ে ওর।' কানুও রাধাসঙ্গ পাওয়ার জন্য আকুল হয়েছিলেন। রাধার সঙ্গে মিলনে বাধা সৃষ্টি হবে মনে করে কৃষ্ণ চন্দন পর্যন্ত দেহে লেপন করেন নি, দরিদ্রের রত্নের মত দৃষ্টিছাড়া করেন নি রাধাকে এবং কত প্রকারেই না তাঁকে কৃষ্ণ আদর করেছেন—

সই কিনা সে বন্ধুর প্রেম।
আঁখি পালটিতে নহে পরতীত যেন দরিদ্রের হেম॥
হিয়ায় হিয়ায় লাগিব লাগিয়া চন্দন না মাখে অঙ্গে।
গায়ের ছায়া বায়ের দোসর সদাই ফিরয়ে সঙ্গে॥
তিলে কত বেরি মুখখানি হেরয়ে আঁচরে মোছায়ে ঘাম।
কোরে রাখি কত দূর হেন মানে তোঁঞে সদা লয়ে নাম॥

বন্ধুর রসের কথা শ্রীরাধা বলে শেষ করতে পারেন না। তাছাড়া মনের উল্লাসে তিনি সুখকথা বলতেও পারছেন না।

কানুর প্রেমের অন্ত পান না রাধা—

'এক দুই গণনাতে অন্ত নাহি পাই।
রূপে গুণে রসে প্রেমে আরতি বাঢ়াই ॥'

এভাবে রসোদ্গার পর্যায়ে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার এক অপরূপ বর্ণনাত্মক ও অনুভবাত্মক চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

॥ ৭ ॥

কৃষ্ণ এখন দূরের নন। মিলনের আশ্লেষে ভরে ওঠে দিগ্বিদিক। মণিময় দীপ, কুসুম-সজ্জা, কোকিলের কূজন, ভ্রমরের ঝঙ্কার, সারীশুক ও কপোতের ফুৎকার, সুগন্ধ মলয় পবন—সব জড়িয়ে কালিন্দীতীরের মন্দির সুখময়। তবু অতি অনুরাগে মিলনকেও বুঝি বিচ্ছেদ বলে ভ্রম হয়।

হিয়ার উপর হৈতে শেজে না শোয়ায়।
বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঙায় ॥
নিদের আলসে যদি পাশ মোড়া দিয়ে।
কি ভেল কি ভেল বলি চমকি উঠয়ে ॥

কিন্তু মিলনের মুহূর্তেও বিচ্ছেদবেদনা দূরাভিসারী প্রেমের মূর্ত প্রকাশ—অধরাকে প্রাপ্তির চরম বাসনা যেন নিদারুণ যন্ত্রণায় মাথা কুটে মরে। আর তাইতো আক্ষেপানুরাগের লক্ষণ। এ পাওয়ার বুঝি শেষ নেই। তাই :

তিলে কত বেরি মুখ নেহারয়ে
আঁচরে মোছয়ে ঘাম।
কোরে রাকি কত দূর হেন মানয়ে
তেঁঞি সদা লয় নাম ॥

জ্ঞানদাসের আক্ষেপানুরাগের পদে রাধার আক্ষেপজনিত বেদনা উচ্চকিত হয়ে উঠেছে। শ্রীমতীর আক্ষেপ নিজের প্রতি, প্রেমের প্রতি, বাঁশীর প্রতি, কৃষ্ণের নিঠুরপনাকে স্মরণ করে। বস্তুত, চণ্ডীদাসের রাধার মত জ্ঞানদাসের রাধার সারাজীবনই তো শুধু আক্ষেপ। পূর্বরাগ থেকেই সুরু হয়েছে এ বেদনার অগ্নিদাহন। এ পর্যায়ে এসে তা দাউ দাউ করে উঠেছে। রাধা বলেন—

শুনিয়া দেখিনু দেখিয়া ভুলিনু
ভুলিয়া পিরীতি কৈনু।
পিরীতি বিচ্ছেদে, না রহে পরাণ,
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মৈনু।

সুখের জন্য যে ঘর বাধা হয়েছিল, তা কৃষ্ণের উপেক্ষার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। রাধা অমৃতসাগরে স্নান করে দেহমন শীতল করতে গিয়ে দেখেন তাতে সূর্যকিরণের জ্বালা। এখন শুধু অনুতাপই রাধার একমাত্র সম্বল :

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
আনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল ॥…

রাধা কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে তাঁর দুঃখের কথা জানান। কানুর প্রেমে নিমগ্ন হয়ে তিনি ঘর-সংসার-পরিজন-সমাজ-নিজ সুখ—সব কিছু উপেক্ষা করেছেন। কিন্তু এসব হারিয়েও তাঁর দুঃখ থাকবে না। কারণ পরম প্রিয়তমজনকে তিনি পেয়েছেন। এটাই হবে তাঁর পরম সুখের কারণ। কিন্তু সেই নিঠুর কালা রাই কমলিনীকে এভাবে বঞ্চনা করবেন, এতো তাঁর কল্পনার বাইরে। কানুকে হারিয়ে রাধা জীবনের আসক্তি হারিয়ে ফেলেছেন।—

কান্দিতে না পাই বন্ধু কান্দিতে না পাই।
নিচয়ে মরিব তোমার চাঁদমুখ চাই ॥
শাশুড়ী ননদীর কথা সহিতেও পারি।
তোমাব নিঠুবপনা গোঙরিয়া মরি ॥
চোবের রমণী যেন ফুকারিতে নারে।
এমতি রহিয়ে পাড়াপড়সীর ডরে ॥
তাহে আর তুমি সে হইলা নিদারুণ।
জ্ঞানদাস কহে তবে না রহে জীবন ॥

জীবনের প্রধান অবলম্বন যেখানে হারিয়ে ফেলেছেন রাধা, সেখানে তাঁর বেঁচে থেকে সুখ কোথায়? যাঁর প্রেমের অভিপ্সায় তিনি সব কিছু উপেক্ষা করতে পারেন, সেই কালার নিঠুরতাই রাধাকে নিদারুণ যন্ত্রণা দিচ্ছে। তাই কৃষ্ণের প্রতি তাঁর আক্ষেপ। এই আক্ষেপবশেই তিনি কৃষ্ণকে বলেন—

ওহে বন্ধু আর কি বলিব তোরে।
আপনা খাইয়া পিরীতি করিলুঁ
রহিতে নারিলুঁ ঘরে ॥
কাম সাগরে কামনা করিয়া
সাধিব মনের সাধা।
আপনি হইব নন্দের নন্দন
তোমারে করিব রাধা ॥
পিরীতি করিয়া ছাড়িয়া যাইব
রহিব কদম্বতলে।
ত্রিভঙ্গ হইয়া মুরলী পুরিব
যখন যাইবা জলে ॥

মূরছা হইয়া পড়িয়া রহিবা
সহজে কুলের বালা।
জ্ঞানদাস বলে বুঝিবে তখন
পিরীতি বিষম জ্বালা॥

কৃষ্ণের প্রতি এই অভিশাপ বাণীর মধ্যে রয়েছে তাঁর প্রতি রাধার গাঢ়তর প্রেমের পরাকাষ্ঠা, আবার সেই কারণেই বঞ্চনাজাত অভিমানের নিগূঢ় অনুভূতি। আবার বংশীকে সম্বোধন করেও রাধা আক্ষেপোক্তি করেন—

গুরুজনার জ্বালায প্রাণ করযে বিকলি।
দ্বিগুণ আগুন দেয শ্যামের মুরলী॥
উভ হাতে তোমায মিনতি করি আমি।
মোর নাম লৈয়া আর না বাজিহ তুমি॥
তোর স্বরে গেল মোর জাতিকুলধন।
কত না সহিব পাপ লোকের গঞ্জন॥
তোরে কহি বাঁশিয়া নাশিযা সতীকুল।
তোর স্বরে মুঞি অতি হৈয়াছি আকুল॥
আমার মিনতি শত না বাজিহ আর।
জ্ঞানদাস কহে উহার ওই সে বেভার।

রাধা দেহ-মন কুলশীল, জাতি-মান—এক কথায় সর্বস্ব দিয়ে কৃষ্ণকে ভালোবেসেছেন। সেই প্রেমে বঞ্চনার কারণে তাঁর তাই আক্ষেপের সীমা নেই। সখী তো সব জানে। সে এও জানে যে, প্রাণবন্ধুকে না পেলে রাধার এ জীবনে বেঁচে থেকে কোন লাভ নেই। অথচ সেই বন্ধুই তাঁকে ভুলতে চান। অথচ রাই কমলিনী তো জানেন যে, কৃষ্ণপ্রেম বিনা তাঁর আর গতি নেই। অনেক সময় রাধা স্বগত কথনে কানুপ্রেমের জ্বালা নিজেকেই জানান—'সহজই কুলবতী বালা। সে কি সহই প্রেমজ্বালা॥ তাহে গুরুগঞ্জন বোল। অহর্নিশি অন্তর ডোল॥' পরিজন বচন মন্ত্রাসম উপেক্ষা করে রাধা যে কৃষ্ণপ্রেমে আকণ্ঠ নিমগ্ন থাকছেন, তার পরিণাম যে দুঃখময়, সে তো রাধা প্রতিনিয়ত অনুভব করতে পারছেন—'পরিণামে বড়ই সে দায।' সখী সম্বোধনে শ্রীমতী চরম দুঃখ-বেদনায় ভেঙ্গে পড়েন—

বন্ধুর লাগিয়া সব তেয়াগিলু' লোকে অপযশ কয়।
এ ধন আমার লয় আন জনা ইহা কি পরাণে সয়॥
সই কত না ধরিব হিয়া।
আমার বঁধুয়া আন বাড়ি যায় আমারি আঙ্গিনা দিয়া॥
... ...
বন্ধুর হিয়া এমন করিলে না জানি সে জন কে।
আমার পরাণ করিছে যেমন এমনি হউক সে॥'

বিশ্ব সংসারে রাধা আর অভিশাপ কুড়িয়ে পেলেন না। তাঁর মুখ দিয়ে এই বাণী উচ্চারিত হোল—তাঁর হৃদয় যেমন না পাওয়ার বেদনায় উথাল-পাথাল করছে, সেইরূপ তুষের আগুনের মত তার হৃদয়ও ধিকি ধিকি করে জ্বলুক। বস্তুত, এই অভিশাপ বাণীব মধ্য দিয়েই রাধার হৃদয়ের সুতীব্র বেদনার স্বরূপটিকে চিনে নিতে পারা গেল। যাঁর জন্য তিনি কুলের লাঞ্ছনা করলেন, গৃহসুখ ত্যাগ করলেন, সমগ্র গোকুল নগরে রাধার কলঙ্ক ঘোষিত হল, 'সতীর সমাজে দাঁড়াইতে হৈলুঁ চোর', সেই রসিক কৃষ্ণ—'না জানি কি লাগি এবে সে জনা বিমুখ।' প্রেমপরাভব-দুঃখ কোন যথার্থ প্রেমিকা নারীর পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়, রাধার পক্ষে তো নয়ই।

সখীর কাছে রাধার আরো আক্ষেপ-উক্তি—

কিবা রূপে কিবা গুণে মন মোর বান্ধে।
মুখে না নিঃসরে বাণী দুটি আঁখি কান্দে॥
মনের মরম কথা শুনলো সজনি।
শ্যাম বন্ধু পড়ে মনে দিবস রজনী॥
চিতের আগুন কত চিতে নিবারিব।
না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি বলিব॥
কোন্ বিধি সিরজিল কুলবতী বালা।
কেবা নাহি করে প্রেম কার এত জ্বালা॥
জ্ঞানদাস বলে মুঞি কারে কি বলিব।
কানুর পিরীতি লাগি যমুনা পশিব॥

শ্রীমতীর আক্ষেপের এই অংশে তাঁর অনুযোগের লক্ষ্যস্থল বিধি, কানু, এমন কি নিজেও। কিন্তু এ আক্ষেপ অনুরাগের কারণে। আর সে অনুরাগ তিলে তিলে নূতন হয়।—'সে রস বিরস নহে জাগিতে ঘুমিতে।' আর সেই প্রেমের কারণে মৃত্যুও শ্রীমতীর নিকট অধিক শ্রেয়, যদি তাতে কানুর পিরীতি লাভ করা যায়। আর একটি পদে—

তুমি সব জান কানুর পিরীতি তোমারে বলিব কি।
সব পরিহরি এ জাতি জীবন তাহারে সোঁপিয়াছি॥
সই কি আর কুল বিচারে।
প্রাণবন্ধু বিনে তিলেক না জীব কি মোর সোদর পরে॥
সে রূপসায়রে নয়ন ডুবিল সে গুণে বান্ধিলু হিয়া।
সে সব চরিতে ডুবিল যে মন তুলিব কি আর দিয়া॥
খাইতে খাইয়ে শুইতে শুইয়ে আছিতে আছি এ পুরে।
জ্ঞানদাস কহে ইঙ্গিত পাইলে আনল ভেজাই ঘরে॥

আক্ষেপানুরাগ পর্যায়ে চণ্ডীদাস শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানদাস গুরুর অনুগামী। কিন্তু গভীরতম আবেগের সহজতম প্রকাশে তিনি গুরুর যোগ্য শিষ্য বটেন।

॥ ৮ ॥

শেষ পর্যন্ত রাধা ঠিক করলেন কালাতেই তিনি নিমগ্ন হবেন। কৃষ্ণ ছাড়া তার অন্য গতি নেই। লজ্জা-কুলশীল-মান সব কিছু তিনি কানুতেই নিবেদন করে কানুর পিরীতি-কেই বাধা সর্বস্ব বলে মনে করবেন। রাধার উক্তি :

কানু সে জীবন জাতি প্রাণ ধন,
এ দুটি আঁখির তারা।
পরাণ অধিক হিয়ার পুতলি
নিমিখে নিমিখে হারা॥
তোরা কুলবতী ভজ নিজ পতি
যার যেবা মনে লয়।
ভাবিয়া দেখিনু শ্যাম বঁধু বিনু
আর কেহ মোর নয়॥

কানুর প্রেমে আছে বজ্রের জ্বালা, আর তা মরণের অধিক যাতনাদায়ক। তবু কানুর প্রেম রাধার অন্তরে অন্তরে বাঁধা। অন্যের অনেকজনা আছে, রাধার আছেন শুধু কৃষ্ণ। কৃষ্ণই তাঁর চোখের কাজল, অঙ্গের ভূষণ। রাধা তাঁর মনের কথাটি জানিয়ে দেন কৃষ্ণকে :

বঁধু, তোমার গরবে, গরবিনী আমি
রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে করি ও দুটি চরণ—
সদা লইয়া রাখি বুকে॥

॥ ৯ ॥

নিজেকে নিঃশেষে সঁপে দেওয়ার পরে যদি বিচ্ছেদ হয়, তাহলে তা হয় খুবই মর্মান্তিক। মাথুর-বিরহ-বেদনা তাই রাধার পক্ষে এত সু-দুঃসহ। তখন রাধার অবস্থা :

সোনার বরণ দেহ।
পাণ্ডুর ভৈ গেল সেহ॥
গলয়ে নয়ন লোর।
মূরছে সখীকে কোর॥
দারুণ বিরহ-জ্বরে।
সো ধনী গেয়ান হরে॥
জীবনে নাহিক আশ।
কহয়ে জ্ঞানদাস॥

কান্ত পরদেশে, তাঁর বিরহে রাধা ক্ষীয়মাণা। তিনি কখনো হাসেন, কখনো কাঁদেন,

কখনো একদৃষ্টে পথের পানে তাকিয়ে থাকেন, কখনো মূর্ছিত হয়ে পড়েন। এরূপ দিব্যোন্মাদ অবস্থায় শুধু দিন কাটে। কিন্তু কানুর দেখা নেই :

পন্থ নেহারিতে নয়ন আন্ধাওল,
দিবস লিখিতে নখ গেল।
দিবস দিবস করি, মাস বরিখ গেল,
বরিখে বরিখে কত ভেল॥

কানু দূরদেশে গেছেন। তাঁর বিহনে শ্রীরাধার এখন বিষম অবস্থা। মনে হয় মৃত্যুর বুঝি আর বিলম্ব নেই।—'জীবন সংশয় হৈল পিয়া না দেখিয়া।' আর কানু বিহনে জীবন ধারণ করে লাভই বা কি? রাধা নিজের ভাগ্যকে দোষ দেন। শেষ পর্যন্ত রাধা মথুরায় দূতী প্রেরণ করেন—কৃষ্ণ না এলে এ জীবন আর তিনি রাখবেন না। কারণ—'মরণ অধিক ভেল এ ছার জীবন।' তিনি আরো বলেন—

আজিকালি করি কত গোঙাইব কাল।
কহিয় বন্ধুরে মোর এত পরিহার॥
এক তিল যাহা বিনু যুগশত মানি।
তাহে কি এতহু দিন সহয়ে পরাণি॥
যদি না আইসে বন্ধু নিচয় জানিয।
মরিব আনলে পুড়ি তাহারে কহিয়॥
দিবস গণিতে আর নাহিক শকতি।
জাগিয়া জাগিয়া কত পোহাইব রাতি॥
এ ছার জীবন আর ধরিতে নারিব।
এবার না আইলে পিয়া নিচযে মরিব॥

মাথুর পর্যায়ে শ্রীমতী অন্তহীন বিরহে নিমজ্জিত হয়ে আকুল আর্তনাদে দিক্‌দিগন্তর পরিপ্লাবিত করেছেন। এ বেদনা একান্তভাবেই রাধার নিজের এবং তা আক্ষেপানুরাগের মত কল্পিত নয়। পরম প্রিয়জন তাঁকে ছেড়ে চলেছেন। মিলনের দিন শেষে এখন শুধু বিচ্ছেদের দহন জ্বালায় জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যাওয়া। এটাই বুঝি ভবিতব্য।

শেষ পর্যন্ত শ্রীমতী ঠিক করলেন, তিনি যোগিনী হবেন। কেন না পিয়া যদি না আসে, তাহলে পরশরতন-যৌবন তো কাঁচের সমান। অতএব—

গেরুয়া বসন, অঙ্গেতে পরিব,
শঙ্খের কুণ্ডল পরি।
যোগিনী বেশে, যাব সেই দেশে,
যেখানে নিঠুর হরি॥

॥ ৮০ ॥

ভাবসম্মিলনে এসে পথ পরিক্রমা শেষ হোল। শ্রীমতীর ধারণা—'সখি হে কুদিন সুদিন ভেল। / তুরিতে মাধব, মন্দির আওব, কপালে কহিয়া গেল।' কিন্তু এখানেও আছে বিরহের অনুভূতি—যে বিরহ চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাসের কবিমানসের সহজাত। চরম মিলনক্ষণে বেদনার ধূপছায়াও তাই রাধাকে উতলা করে তুলবে :

অচিরে পূরব আশ।
বঁধুয়া মিলব পাশ ॥...
কিছু গদগদ স্বরে।
এ-দুঃখ কহিব তারে ॥

পরাণ-পিয়াকে উদ্দেশ করে রাধা জানান—'চিরদিন পরে পাইয়াছি লাগ, আর না দিব ছাড়িয়া'। কেন না—

তোমায় আমায় একই পরাণ
ভাল সে জানিয়ে আমি।
হিয়ায় হৈতে বাহির হৈয়া।
কেমনে আছিলে তুমি ॥

ভাবোল্লাস পর্যায়ে শ্রীমতী শ্যামকে পেয়ে আত্মহারা। কিন্তু অতীত বিচ্ছেদ-বেদনা একেবারে ভুলে যান নি। তাই সেই বেদনার অভিজ্ঞতা যাতে আর না পেতে হয়, সেজন্য শ্যামকে তিনি পুনরায় হিয়ায় নিগড়ে বেঁধে রাখতে চান।—

শুন শুন হে পরাণপ্রিয়া।
চিরদিন পরে পাইয়াছি লাগ আর না দিব ছাড়িয়া ॥
তোমায় আমায় একই পরাণ ভাল সে জানিয়ে আমি।
হিয়ায় হৈতে বাহির হইয়া কিরূপে আছিলা তুমি ॥
যে ছিল আমার করমের দুখ সকল করিলুঁ ভোগ।
আর না করিব আঁখি আড় রহিব একই যোগ ॥
খাইতে শুইতে তিলেক পলকে আর না যাইব ঘর।
কলঙ্কিনী করি খেয়াতি হৈয়াছে আর কি কাহাকে ডর ॥
এতহুঁ কহিতে বিভোর হইয়া পড়িল শ্যামের কোরে।
জ্ঞানদাস কহে রসিক নাগর ভাসিল নয়ান লোরে ॥

ভাবসম্মিলন পর্যায়েও জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসের সার্থক উত্তরসূরী। সব দুঃখ বেদনার অবসানের পরেও কালিমার স্মৃতি মন থেকে মুছে যায় না। মিলনের ঔজ্জ্বল্যের পাশে মনে ভাসে বিচ্ছেদের অন্তহীন বেদনার ম্লান ছবি। তাই রাধার এত ভয়, কানুকে চোখের আড়াল না করার এত চেষ্টা।

জ্ঞানদাসের একটি পদে রাধাকৃষ্ণের পরস্পরের উক্তি-প্রত্যুক্তিতে ভাবসম্মিলনের মাধুর্য ব্যক্ত হয়েছে। পদটি নানা কারণেই উল্লেখযোগ্য। পদটি এই—

তুয়া অনুরাগে হাম নিমগন হইলাম।
তুয়া অনুরাগে হাম গোলোক ছাড়িলাম॥
তুয়া অনুরাগে হাম কাননে ধাই।
তুয়া অনুরাগে হাম ধবলী চরাই॥
তুয়া অনুরাগে হাম পরি নীল শাড়ী।
তুয়া অনুরাগে হাম পীতাম্বরধারী॥
তুয়া অনুরাগে হাম হইনু কলঙ্কিনী।
তুয়া অনুরাগে নন্দের বাধা বইনু আমি॥
তুয়া অনুরাগে হাম তুয়াময় দেখি।
তুয়া অনুরাগে মোর বাঁকা হৈল আঁখি॥
তুয়া অনুরাগে হাম কিছু নাহি জান।

এই পদটিতে পারস্পরিক বক্তব্যের মাধ্যমে দুটি অনুরাগরাঙ্গা আকুল মনের অনাবিল চিত্র ফুটে উঠেছে। ভাবসম্মিলনে সাধারণভাবে শ্রীরাধিকার অনুভবের কথাই শুনতে পাওয়া যায়। এখানে রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের গূঢ়তা এবং রাধার প্রতি তাঁর আকর্ষণের অতিশায়িতা প্রকাশের দ্বারা ভাবোল্লাসের মিলন-মাধুর্য অনুভবের মহিমা ব্যাপ্তি লাভ করেছে। পদটি নানা দিক থেকেই তাৎপর্যমণ্ডিত সন্দেহ নেই।

শ্রীরাধা অতি আকুল আগ্রহে কানুর প্রেমমন্দিরে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে পরম প্রশান্তি লাভ করতে চান। সব দ্বিধা, সঙ্কোচ, বাধা অপসারিত হয়ে রাধাকৃষ্ণের মানস মিলনে অদ্বয়ত্বের প্রতিষ্ঠা হয়। আর এখানেই রসতত্ত্বের শেষ কথা :

বঁধু আর কি ছাড়িয়া দিব।
এ বুক চিরিয়া যেখানে পরাণ—
সেখানে তোমারে থোব॥

গোবিন্দদাস

॥ ১ ॥

গোবিন্দদাস চৈতন্যোত্তর যুগের কবি। প্রভুপাদ শ্রীনিবাস আচার্যের অন্যতম শিষ্য গোবিন্দদাস পরম সাধক ও ভক্তরূপেও বৈষ্ণব সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। গুরুর আদেশেই তিনি রাধাকৃষ্ণলীলারসাত্মক পদ রচনায় ব্রতী হন—'স্বচ্ছন্দ বর্ণন কর রাধাকৃষ্ণলীলা'। তাঁর কবিত্ব শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরভদ্র প্রভু খেতুরীর মহোৎসবে গোবিন্দদাসকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন—

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের দুটি করে ধরি।
কহে তুয়া কাব্যের বালাই লৈয়া মরি।

কবিরাজ উপাধিটিও গোবিন্দদাস পেয়েছিলেন গুরু শ্রীনিবাস আচার্যের (মতান্তরে বৃন্দাবনের গোস্বামী প্রভুদের) কাছ থেকে। ৭৬ বৎসরের দীর্ঘজীবী কবি—'এইরূপ 'ভজন' ও 'বর্ণন' করিয়া ছত্রিশ বৎসর কাল কীর্তন গান করেন।' শেষ বয়সে কবি নিজের পদগুলি একত্র সংগ্রহ করেন। ভক্তিরত্নাকরে আছে—

নির্জনে বসিয়া নিজ পদরত্নগণে।
করেন একত্র অতি উল্লাসিত মনে॥

গোবিন্দদাস অজস্র পদ রচনা করেছিলেন। 'পদকল্পতরু'তে তাঁর ৪৬০ টি পদ সংকলিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে বিদ্যাপতির ১৬৩টি, চণ্ডীদাসের ৯০টি এবং জ্ঞানদাসের ১৮৬টি পদ উক্ত গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত 'গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ' গ্রন্থে গোবিন্দদাসের ৭২৮টি পদ উদ্ধৃত হয়েছে। এ ছাড়া তিনি 'সঙ্গীতমাধব' নামে একখানি নাটক ও 'কর্ণামৃত' নামে একখানি কাব্য রচনা করেন। তা ছাড়া বিদ্যাপতির অন্যূন ছয়টি অসম্পূর্ণ পদ তিনি সম্পূর্ণ করেন।

॥ ২ ॥

রসনা রোচন শ্রবণ-বিলাস।
রচই রুচির পদ গোবিন্দদাস॥

গোবিন্দদাস চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব পদাবলীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। গভীরতম আবেগের মহত্তম প্রকাশের দ্বারা তিনি আপন মহৎ কবিপ্রতিভা সুচিহ্নিত করে গেছেন। তিনি রূপদক্ষ শিল্পী। গভীর ভাবের শতধা বিচ্ছুরিত হীরকখণ্ডগুলিকে সংগ্রথিত করে অখণ্ড শিল্পরূপ দিতে তিনি সুদক্ষ। কাব্যের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ উভয় রূপই তাঁর রচনায় যত সৌষ্ঠব লাভ করেছে, তাতে তাঁর সঙ্গে তুলনা মিলে একমাত্র তাঁর সাহিত্যগুরু কবি-সম্রাট বিদ্যাপতির। কোন কবিতাকে শ্রেষ্ঠ শিল্প হয়ে উঠতে গেলে তাতে ভাবের নিবিড়তা ('emotion recollected in tranquility') যেমন থাকতে হবে, তেমনি সেই ভাবের সুষ্ঠু প্রকাশের জন্য মণ্ডনকলার উপযুক্ত উপস্থিতিও একান্ত প্রয়োজন। কারণ "Poetry... is a particular kind of art; that it arises only when the poetic qualities of imagination and feeling are embodied in a certain form of expression. That form is, of course, regularly rhythmical language, or metre. Without this, we may have the spirit of poetry without its externals. With this, we may have the externals of poetry without its spirit. In its fullest and completest sense, poetry presupposes the union of the two." আমাদের কবি 'emotional and imaginative elements'-কে 'the rhythmic creation of beauty'-তে পরিণত

করবার অসামান্য সৃজনশক্তির অধিকারী। ভক্তির আতিশয্য তাঁর কবিতার দুই কূল ছাপিয়ে যায় নি। কারণ সংযমের পারিপাট্য বজায় রাখার রহস্যটি তিনি জানতেন।

সৃজন-শিল্পী হিসাবে গোবিন্দদাস ছিলেন বিদ্যাপতির অনুসারী ও উত্তরসূরী। বিদ্যাপতির রচনাধর্ম তিনি আত্মস্থ করেছিলেন। পদ রচনার ক্ষেত্রে মণ্ডনশিল্পী বিদ্যাপতির রচনার পারিপাট্য, আলঙ্কারিতা, পদ-বিন্যাসের চাতুর্য ও মাধুর্য—পাঠককে বিস্মিত, মুগ্ধ ও সচকিত করে তোলে। গোবিন্দদাস রচনাধর্মে 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি'। অলঙ্কারের এত ঐশ্বর্য, ছন্দের এত কৌশল— এক কথায় কবিতার বহিরঙ্গ সৌষ্ঠব সাধনে তাঁর যত্ন বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয়। ভাব-প্রকাশের যথাযথ কৌশলটি গোবিন্দদাস জানেন। তেমনি তাঁর কাব্যে শব্দ ও অর্থালংকারের এত বৈচিত্র্য ও সমারোহ পাঠকদের চোখকে ধাঁধিয়ে দেয়। গোবিন্দদাসের পদে একদিকে ভাবের দুরবগাহিতা, অন্যদিকে অলংকারাদি প্রয়োগের দ্বারা পদের অবয়ব সংস্থানে কাঠিন্য— তাঁর রচনাকে অনেক ক্ষেত্রে দুর্বোধ্য করে তুলেছে, সন্দেহ নেই। অনুভূত ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে—'যেমন আছ তেমনি এসো, আর কোরো না সাজ'—এ মতের পক্ষপাতী ছিলেন না তিনি। রূপায়ণে ক্ল্যাসিক্যাল পারিপাট্যের ছোঁয়াচে তাঁর পদ যেন অনেকটা গ্রীক ভাস্কর্যের কঠিন-সুন্দর রূপাঙ্কণ। এ কারণেই পাঠকের পক্ষে অনেক ক্ষেত্রেই গোবিন্দদাসের পদাবলী দুর্বোধ্য মনে হয়—তাকে অর্থবহ করে তুলতে তাই প্রয়োজন হয় ব্যাখ্যাকারের। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কীর্তন গানে আঁখরের প্রচলন হয় মূলতঃ গোবিন্দদাসের পদ কীর্তন থেকে। অন্তরঙ্গ দিক থেকে ভাবের ঐশ্বর্য এবং বহিরঙ্গ দিক থেকে ব্রজবুলি ভাষার মাধুর্য ও রহস্যময়তা এবং অনুপ্রাসাদি অলংকারের ঝংকারের জন্য গোবিন্দদাসের পদাবলী ভক্ত, রসিক, গায়ক, শ্রোতা—সকলের কাছেই বহুল পরিমাণে সমাদৃত। 'পদকল্পতরু'র সম্পাদক ৺সতীশচন্দ্র রায় বলেছেন: "...তাঁহার রচনায় ভাবের গূঢ়তা, অলঙ্কার ও ধ্বনির প্রাচুর্য ও সমাস-বাহুল্যের জন্য তাঁহার রচনা সাধারণ পাঠকের ত কথাই নাই,—অধিকাংশ শিক্ষিত ও সৌখীন কাব্য-রসামোদী পাঠকের পক্ষেও দুরধিগম্য হইয়া রহিয়াছে। যাঁহারা ধৈর্য ধরিয়া বিজ্ঞ ও রসজ্ঞ কোনও কীর্তন-গায়কের মুখে গোবিন্দদাসের পদ শুনিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, বৈষ্ণব পদ-কর্তাদিগের পদাবলী সমুদ্রবিশেষ হইলেও গোবিন্দদাসের অন্ততঃ বাছা বাছা দুই চারিটা পদ উত্তমরূপে আঁখর দিয়া গান করিতে না পারিলে কীর্তনের পালাই জমে না।' (৫ম খণ্ড/৬৮ পৃঃ)। গোবিন্দদাসের পদ দুর্বোধ্য, অধিকন্তু তা রসজ্ঞ ও শ্রোতাদের কাছে অপরিহার্য,—এই দুই বিপরীত বৈশিষ্ট্য সমুজ্জ্বল। তাঁর পদের এত সমাদর সম্পর্কে সতীশচন্দ্র আরো বলেছেন—

"কিন্তু রস-বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইলে কেহই অন্ততঃ তাঁহার ভাব-বৈচিত্র্যে মোহিত না হইয়া পারেন না। আমাদের দেশের রসজ্ঞ কীর্তনিয়াগণ আঁখর দিয়া পদের দুরূহ ভাবগুলি শ্রোতাদের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিয়া, সুকৌশলে ও অতি সুমিষ্টভাবে টীকাকারের কার্য সম্পন্ন করেন বলিয়া, রসজ্ঞ কীর্তনিয়াগণের মুখে গোবিন্দদাসের পদ শুনিতে যেমন ভাল লাগে, তেমন বোধ হয় আর কিছু নহে; এজন্যই গোবিন্দদাসের পদে পালা যেমন জমে, অন্য কাহারও পদে সেরূপ জমে না।" (পৃঃ ৬৯)

গোবিন্দদাসের সংস্কৃত ও বাংলায় পদ থাকলেও তাঁর রচনা অধিকাংশই ব্রজবুলি ভাষায়। তাঁর রচিত প্রথম পদ 'ভজহুঁ রে মন' ব্রজবুলি ভাষায় রচিত। বস্তুত, ব্রজবুলিতে তিনি যত পদ রচনা করেছেন, বাংলাদেশে আর কোন কবি এত সংখ্যক পদ রচনা করতে পারেন নি। তারো অধিক কথা, বাংলাদেশে প্রথম ব্রজবুলি পদ রচনা ও ব্যাপক প্রচলনের কৃতিত্ব গোবিন্দদাসের।' অবশ্য ঐতিহাসিক সত্য হিসাবে বাংলাদেশে ব্রজবুলি ভাষায় প্রথম রচনা যশোরাজ খানের 'এক পয়োধর চন্দন লেপিত' পদটি। কিন্তু চৈতন্যপ্রভাবের পূর্ববর্তী কালে রচিত এই পদটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র। এর ঐতিহাসিক ক্রমানুসারিতা নেই। গোবিন্দদাস ব্রজবুলি পদ রচনায় যেমন অপ্রতিদ্বন্দ্বী, তেমনি বাংলা পদ রচনায়ও তাঁর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। 'চিকণ কালা গলায় মালা', 'ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি', 'এইত মাধবী তলে'—প্রভৃতি বাংলাপদেও আমরা কবিরাজ গোবিন্দদাসকেই খুঁজে পাই। গোবিন্দদাসের কবিত্বের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ বন্দিত কবি-সমাজ
কাব্য-রস-অমৃতের খনি।
বাগ্দেবী যাঁহার দ্বারে দাসী ভাবে সদা ফিরে
অলৌকিক কবি শিরোমণি॥
ব্রজের মধুর লীলা যা শুনি দরবে শিলা
গাইলেন কবি বিদ্যাপতি।
তাহা হইতে নহে ন্যূন গোবিন্দের কবিত্বের গুণ
গোবিন্দ দ্বিতীয় বিদ্যাপতি॥

('কবিরাজ-রাজ', 'রস-সায়র' গোবিন্দদাসের পদে প্রেমভক্তির চূড়ান্ত প্রকাশ—তদুপরি 'যাকর গীতে সুধারস বরিখয়ে কবিগণ চমকয়ে চীত।' ষোড়শ শতাব্দীর আর কোনো কবি বৈষ্ণবভক্ত ও রসজ্ঞদের কাছ থেকে এত প্রশংসা পান নি। আবার কালের কষ্টিপাথরেও গোবিন্দদাসের রচনার চিরন্তন মূল্য প্রমাণিত হয়েছে। এখানেই বৈষ্ণবকবি গোবিন্দদাসের গৌরব ও সাফল্য।)

গোবিন্দদাস তাঁর কাব্যগুরু বিদ্যাপতির ভাব ও ভাষা অনুসরণে পদ রচনা করেছেন, একথা সত্য। কিন্তু গোবিন্দদাসের পদে বিদ্যাপতির অপেক্ষাও অতিরিক্ত কিছু আছে, যা একান্তভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবরসতত্ত্বের অঙ্গীভূত ও নিজস্ব। শ্রীরাধার সখী বা মঞ্জরীভাবের অনুগত সাধনা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বৈশিষ্ট্য। গৌড়ীয় সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব কবিগণের পদে এ বৈশিষ্ট্যের অনুসৃতি। গোবিন্দদাসও তাঁদের অন্যতম। এছাড়া "তিনি বাঙ্গলার সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-আচার্য রূপ গোস্বামীর অনেক সংস্কৃত কাব্য হইতে অনেক শ্লোকের শুধু অনুকরণ নহে, তাৎপর্য্যানুবাদ করিয়া গিয়াছেন; ইহা তাঁহার বাঙ্গালীত্ব ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবত্বেরই পরিচায়ক।" দৃষ্টান্তস্বরূপ শ্রীরূপ গোস্বামীর 'বিদগ্ধ মাধব' গ্রন্থের একটি শ্লোক নেওয়া যাক্—

একস্য শ্রুতমেব লুম্পতি মতিং কৃষ্ণেতি নামাক্ষরং
সান্দ্রোন্মাদপরম্পরামুপনয়ত্যন্যস্য বংশীকলঃ।
এষ স্নিগ্ধঘনদ্যুতির্মনসি মে লগ্নঃ পটে বীক্ষণাৎ
কষ্টং ধিক্ পুরুষত্রয়ে রতিরভূন্মন্যে মৃতি শ্রেয়সী॥

গোবিন্দদাস এই শ্লোকের ভাবানুসরণে একটি সুন্দর পদ রচনা করেছেন—

সজনি। মরণ মানিয়ে বহুভাগি।
কুলবতী তিন পুরুষে ভেল আরতি
জীবন পিয় সুখ লাগি॥
পহিলে শুনলুঁ হাম শ্যাম দুই আখর
তৈখন মন চুরি কেল।
না জানিয়ে কোঐছে পটে দরশায়লি
নব জলধর যিনি কাঁতি।
চকিতে হইয়া হাম যাঁহা যাঁহা ধাইয়ে
তাঁহা তাঁহা রোধয়ে মাতি॥
গোবিন্দদাস কহয়ে শুন সুন্দরি
অতএ করহ বিশোয়াস।
যাকর নাম মুরলী রব তাকর
পটে ভেল সো পরকাশ॥

সুতরাং স্পষ্টই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, গোবিন্দদাসের পদাবলী আস্বাদন করতে গেলে একদিকে সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যে, অন্যদিকে বৈষ্ণব রসতত্ত্বে ও কাব্য সাহিত্যে অধিকার থাকা একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় অবিচারের সম্ভাবনা বর্তমান। পুরোনো উপাদান অবলম্বনে গোবিন্দদাস তাঁর কাব্যদেহ নির্মাণ করেছেন, একথা ঠিক। কিন্তু তাঁর সৃজন-নৈপুণ্য এখানেই যে, পুরোনো উপকরণে তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তা সম্পূর্ণরূপে মৌলিকতার স্বাক্ষরসমৃদ্ধ, নতুন বস্তু। গোবিন্দদাস নিছক অনুকারক নন, মৌলিক স্রষ্টাও বটেন। তাঁর একটি নিদর্শন মেলে—'মার্গে পঙ্কিণী তোয়দান্ধতমসে'—এই প্রকীর্ণ কবিতাটির—'কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল'—অনুবাদে। অনুবাদও যে নব সৃজন, গোবিন্দদাসের রচনায় তার অজস্র দৃষ্টান্ত মেলে।

গোবিন্দদাসের রচনা পালাবদ্ধ রসকীর্তনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। তিনি পদাবলীর রসধারাকে কাব্যাকারে রূপায়িত করেছিলেন। বিশেষ করে রাধাকৃষ্ণের "অষ্টকালীয় লীলা" বর্ণনার পরিকল্পনা তিনিই সর্বপ্রথম করেছিলেন। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন: "গোবিন্দদাসের অসাধারণ নির্মিতি কৌশল ও ভক্তিভাবের গাঢ়তাই তাঁহার একমাত্র কারণ হইলেও তাঁহার পদাবলী হইতে রাধাকৃষ্ণলীলার পূর্বাপর সঙ্গতি ও যোগাযোগ-পূর্ণ ধারাবাহিক কাহিনীর বিকাশ ও পরিণতি লক্ষ্য করা যায়।" (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত/২য় খণ্ড/পৃঃ ৫৭৫-৬)।

চিত্র ও সংগীত-ময়তা গোবিন্দদাসের পদাবলীর প্রাণ স্বরূপ। (গোবিন্দদাস সম্পর্কে স্পষ্টই বলা চলে যে,—'he painted with words।' কথার দ্বারা চিত্রকল্প রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত।) শব্দের দ্বারা অঙ্কিত চিত্র যখন অনুভূতির রসে রসায়িত হয়ে ওঠে, তখন তা হয় চিত্রকল্প। কবি বিদ্যাপতির অনুসরণে গোবিন্দদাস এই বিশেষ দিকটির প্রতি আকৃষ্ট হলেও তাঁর নিজস্ব প্রতিভার পরিচয় সেখানে প্রধান হয়ে উঠতে বিলম্ব করে নি। গোবিন্দদাসের কবিতার ভাবদেহ 'কুন্দে যেন নিরমাণ'—কবি চিত্রে ও রঙ্গ-রসে তাকে অপরূপ ও ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ করে তুলেছেন। চৈতন্যদেবের বর্ণনায় গোবিন্দদাস লিখেছেন—

নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাব কদম্ব॥
কি পেখলুঁ নটবর গৌরকিশোর।
অভিনব হেম কলপ-তরু সঞ্চরু
সুরধুনী তীরে উজোর॥

পদটিতে চৈতন্যদেবের করুণাঘন ও দিব্যজীবনচিত্র অনুপম ও রসঘন রূপলাভ করেছে। চৈতন্যদেবের মেঘকালো নয়নে করুণার অশ্রুবর্ষণ। তাঁর সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চরূপ মুকুলের উদ্গম—দেহের সেই স্বেদবিন্দু যেন বিকশিত ভাবকদম্ব। সুরধুনিতীরে স্বর্ণকান্তিদেহবিশিষ্ট গৌরাঙ্গদেব পাদচারণা করছেন—দেখে মনে হচ্ছে যেন হেম-কল্পতরু সঞ্চরমাণ। কল্পতরুর কাছে যা চাওয়া যায়, তাই পাওয়া যায়। চৈতন্যদেব-ও নিখিল ব্রহ্মাণ্ডবাসীর একান্ত কামনা-স্থল। আলোচ্য চিত্রকল্প চিত্ররসে ভরপুর, সন্দেহ নেই।

গোবিন্দদাসের কাব্যের অন্যতম গুণ সংগীতধর্মিতা। অনুপ্রাসাদির ঝংকারবহুলতা তাঁর পদকে সংগীতমধুর করে তুলেছে। শব্দের কারুকার্য ও ঝংকার, বাক্-নির্মিতির বিশেষ অভিব্যক্তি, অলংকারের বহুল উপস্থিতি, চিত্ররচনার বিশেষ ক্ষমতা—সব কিছুর সমবায়ে, অথচ সব কিছুকে অতিক্রম করে, এক আশ্চর্য সংগীতময়তা তাঁর পদসমূহকে বিশিষ্ট করে তুলেছে! "All arts aspire to the condition of music"—এই সূত্র গোবিন্দদাসের কাব্যে আশ্চর্যসুন্দর রূপ লাভ করেছে। যেমন—

নন্দ নন্দন নিচয় নিরখলুঁ
নিঠুর নাগর জাতি।
নারি নীলজ নেহ নিরমিত
নাহ নামে মিলাতি॥

অথবা,

ঝর ঝর জলধর ধার।
ঝঞ্ঝা পবন বিথার॥
ঝলকত দামিনী মালা।
ঝামরি ভৈগেল বালা॥

—ইত্যাদি পদে বাচ্যকে ছেড়ে ব্যঞ্জনা এক অপরূপ সংগীতের রাজ্যে উপস্থিত। গোবিন্দদাসের পদের অর্থ বুঝি না বুঝি, তার সংগীতমাধুর্য ও ধ্বনির ঝংকার পাঠককে এক অপরূপ রহস্যময়তার তোরণ দ্বারে নিয়ে যায়। "তাঁর অনুপ্রাসের মাধুর্য "মনের মধ্যে যে ধ্বনির মাদক রস সৃষ্টি করে, একমাত্র জয়দেব ও বিদ্যাপতিকে ছাড়িয়ে দিলে, ইহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত মধ্যযুগে বড় একটা সুলভ নহে।'

গোবিন্দদাসের পদ গাঢ়বন্ধ, সান্দ্র—বক্তব্যবিষয় সংযত, সংহত, নিটোল স্ফটিকসদৃশ। তাতে ভাবের গূঢ়তা ও গাঢ়তা একদিকে যেমন বর্তমান, তেমনি অন্যদিকে প্রকাশভঙ্গীতে সচেতন শিল্পীসুলভ সংযম বর্তমান। বস্তুর নির্যাস ছেঁকে নিয়ে তাকে গাঢ় রসে পরিণত করতে আমাদের কবি জানেন। যেমন—

আধক আধ— আধ দিঠি অঞ্চলে
যব ধরি পেখলু' কান।

—এই পদটিতে যে গূঢ় ভাব ব্যক্ত হয়েছে, তার অর্থ বোধের জন্য বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজন। তাছাড়া নিটোল রচনার দৃষ্টান্ত হিসাবে আলোচ্য পদটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গোবিন্দদাস রাধার দেহের রূপ অপেক্ষা স্বরূপ—রূপের লাবণ্য—চিত্রণে অধিকতর তৎপর। বস্তুবিদ্ধ রূপাঙ্কণ অপেক্ষা অশরীরী সৌন্দর্যের অবয়ব নির্মাণে আমাদের কবি বিশেষ সচেষ্ট। মূর্তরূপ অপেক্ষা অমূর্ত সৌন্দর্য-ভাবনায় তিনি লীন। গোবিন্দদাসের তুলির স্পর্শে রাধা যেন 'নিরালম্ব সৌন্দর্যের ভাব প্রতিমা'। তাঁর সৌন্দর্য তাই আমাদের স্তম্ভিত করে—মর্তসীমার সঙ্কীর্ণ বন্ধন অতিক্রম করে দূরবগগাহী অসীমের অতীন্দ্রিয় অনুভূতির রাজ্যে আমাদের নিয়ে যায়। এই বিশ্ব-সৌন্দর্যের কেন্দ্রীভূতা শক্তি রাধার—

যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকময় হোতি॥

এতক্ষণ আমরা গোবিন্দদাসের পদের সামান্য পরিচয় উপস্থাপিত করতে চেষ্টা করেছি—যদিও তা সর্বথা সফল হয় নি। তবু সূত্রাকারে বলা যায় যে, সচেতন রূপদক্ষ শিল্পীর ভাবের গূঢ়তা ও গাঢ়তা, আলঙ্কারিকতা, মণ্ডনকলা, চিত্র ও সংগীত ধর্ম, সৌন্দর্যদৃষ্টি, ধ্বনিপ্রাধান্য, ছন্দোনৈপুণ্য, ভক্তিভাব, পাণ্ডিত্য ও বৈদগ্ধ্যের সমাহার—ইত্যাদি তাঁর রচনার অন্যতম গুণ। গোবিন্দদাস চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব পদাবলীর সর্বাপেক্ষা সমাদৃত মহাকবি। গৌরচন্দ্রিকা, পূর্বরাগ, অভিসার, রসোদ্গার, প্রার্থনা প্রভৃতি পদ রচনায় তিনি প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। বিদ্যাপতির মত তিনিও সম্ভোগাখ্য শৃঙ্গার রসের কবি। বস্তুত, মধুররসবৈচিত্র্যমূলক পদ রচনায় তিনি অদ্বিতীয়।

॥ ৩ ॥

গোবিন্দদাসের পদাবলী আস্বাদন করতে গিয়ে প্রথমেই নজরে পড়ে তাঁর গৌরচন্দ্রিকার পদ। তিনি মূলত ব্রজের মধুরলীলা অবলম্বনে পদ রচনা করেছেন। অপর পক্ষে, জ্ঞানদাস বাৎসল্য ও গোষ্ঠ বিষয়ক পদও রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছেন। আলঙ্কারিক বর্ণনার সুযোগ যেখানে বেশী, সেখানেই গোবিন্দদাসের কবিমানস স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেছে। সেক্ষেত্রে মধুর রসের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনায় তাঁর কবিমনের উল্লাস যে শতধা হয়ে উঠবে, সে তো অতি স্বাভাবিক। গৌরচন্দ্রিকার পদেও গোবিন্দদাসের কবিখ্যাতির অতি বড় পরিচয় আছে। চৈতন্যদেবের প্রকট কালে তিনি তাঁর লীলা দর্শনের সুযোগ পান নি—কারণ তাঁর আবির্ভাব গৌরাঙ্গ-পরবর্তী কালে। তাই চৈতন্যদেবের দিব্যলীলার প্রত্যক্ষদৃষ্ট সজীব অভিজ্ঞতার অভাবকে তিনি কল্পনাশক্তির দ্বারা পূরণ করে নিতে চেষ্টা করেছেন—পূর্বসূরীদের প্রদত্ত তথ্যকে গোবিন্দদাস কাব্যিক সত্যে পরিণত করেছেন। তবু মহাপ্রভুর লীলা দর্শনের সুযোগ না পাওয়ায় তাঁর মর্মবেদনার অন্ত ছিল না।—

(১) তাকর চরণে দীনহীন বঞ্চিত
গোবিন্দদাস রহু দূর।

(২) যো রসে ভাসি অবশ মহিমণ্ডল
গোবিন্দদাস তঁহি পরশ না ভেল॥

(৩) প্রেম ধনের ধনী কয়ল অবনী
বঞ্চিত গোবিন্দদাস॥

গোবিন্দদাস চৈতন্যদেব সম্পর্কে অজস্র পদ রচনা করেছেন। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, জ্ঞানদাসের গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদে শুধু রূপ বর্ণনার আধিক্য। কিন্তু গোবিন্দদাস দিব্য রাধাকৃষ্ণলীলার বিচিত্র ভাব ও রসের অনুযায়ী প্রকৃত গৌরচন্দ্রিকার পদ রচনা করেছেন। বলা যায় যে, যথার্থ গৌরচন্দ্রিকা পদ রচনার শ্রেষ্ঠ সম্মান গোবিন্দদাসকেই দিতে হয়। দীক্ষিত হওয়ার পর গৌরাঙ্গ বিষয়ে তাঁর প্রথম পদে অনুগত ভক্তের হৃদয়াকূতি প্রকাশ পেয়েছে।

ভজহুঁ রে মন নন্দ নন্দন
অভয় চরণারবিন্দ রে।
দুলহ মানুষ জনম সতসঙ্গে
তরহ এ-ভবসিন্ধুরে॥...

এটি গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ, কি গৌরচন্দ্রিকার নয়। গোবিন্দদাসের গৌরচন্দ্রিকার পদ কল্পনার ঐশ্বর্যে, ভাবের গাঢ়বদ্ধতায় ও সূক্ষ্ম বৈচিত্র্যে, ছন্দসুষমা ও অলঙ্কারের কারুকার্যে অনুপম। গৌরাঙ্গের দিব্যজীবনের অমৃতসত্তাটুকু আমাদের কবির উপলব্ধিতে আভাসিত হয়েছে।—

নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাব কদম্ব॥
কি পেখলুঁ নটবর গৌরকিশোর।
অভিনব হেম- কল্পতরু সঞ্চরু
সুরধুনি তীরে উজোর॥

মহাপ্রভুর হেম অঙ্গে পুলকের স্বেদবিন্দু, নয়নে অবিরল কারুণ্যের অশ্রুধারা—'কবহুঁ গদগদ ভাব'—অখিল জনগণের তিনি বাঞ্ছাকল্পতরু। এই পদটি গৌরচন্দ্রিকার বলে কেউ কেউ অভিমত প্রকাশ করলেও বস্তুত তা নয়। এখানে শ্রীগৌরাঙ্গের করুণাসজল মূর্তি শুধু অভিনব ভাষার চিত্রে ফুটেছে—রাধা ভাবে ভাবিত গৌরচন্দ্রের রূপ নয়। আর একটি পদে করুণাঘন গৌরাঙ্গের চিত্র অতি সুন্দরভাবে অঙ্কিত হয়েছে—

পতিত হেরিয়া কান্দে থীর নাহি বান্ধে
করুণা নয়নে চায়।
নিরুপম হেম জিনি উজোর গোরা তনু
অবনী ঘন গড়ি যায়।
গৌরাঙ্গের নিছনি লইয়া মরি।
ও রূপ-মাধুরী পিরীতি-চাতুরী
তিল অধ পাসরিতে নারি॥

॥ ৪ ॥

('পূর্বরাগ' পর্যায়ে গোবিন্দদাস বহিরঙ্গ বর্ণনায় রাধার রূপের সৌন্দর্য ও লাবণ্যটুকু তুলে ধরেছেন। কল্পনার অমেয় ঐশ্বর্যে সেই বিমূর্ত সৌন্দর্যসায়র যেন উচ্ছলিত হয়ে উঠেছে; স্থূল বর্ণনা অপেক্ষা সূক্ষ্ম অনুভূতির রসে জারিত হয়ে রাধা হয়ে উঠেছেন অশরীরী সৌন্দর্য প্রতিমা।—

যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু-জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকময় হোতি॥

সখীদের সঙ্গে রাধিকা কালিন্দী নদীতে স্নানে চলেছেন—কাঞ্চন বর্ণের শিরীষ ফুলের মত তাঁর অনুপম দেহকান্তি সূর্যকিরণকে ম্লান করে দিল। তাঁর চঞ্চল দৃষ্টিপাতে কৃষ্ণের হৃদয়ে তরঙ্গ বিক্ষোভ জাগল। অধিকন্তু—

চিত-নয়ন মঝু দুহুঁ সে চোরায়লি
শূন হৃদয় অব মান।)

দূর থেকে রাধার রূপ দেখে কৃষ্ণ মজেছেন—তাঁর শেলবিদ্ধ হৃদয়ে কতই না বাথা। কিন্তু রাধার মনোভাব এখনো তাঁর অজানা—দূর থেকে দৃষ্টি-তীরে-বিদ্ধ কৃষ্ণ শুধু তৃষ্ণায় ছটফট করেন—

কাঞ্চন কমল পবনে উলটায়ল
ঐছন বদন সঞ্চারি।
সরবস নেই পালটি পুন বিহুল
রঙ্গিণী বঙ্ক নেহারি॥
সজনি কো দেই দারুণ বাধা।
নয়নক সাধ আধ নাহি পূরল
পালটি না হেরলু' রাধা॥

ফলে—'বিষম বিশিখ শর অন্তর জর জর সরবস লেয়লি মোরি'। অন্যদিকে রাধা-ও মন্মথ শরে জর জর; কিন্তু এখনো পর্যন্ত তিনি মনোভাব স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করেন নি। কিন্তু হাবে ভাবে রাধার এই ভাবান্তর সখীদের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। রাধা নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে করতে বিকশিত কদম্ব ফুল দেখছেন—আর করতলে বদন ন্যস্ত করছেন ঘন ঘন; 'খেনে তনু মোড়সি করি কত ভঙ্গ। অবিরল পুলক মুকুল ভরু অঙ্গ॥' রাধা ভাব আর চেপে রাখতে পারছেন না। কেন না—'মরমক বেদনা বদন সব কহই॥' তিনি অনেক কষ্টে চোখের জল চেপে রাখছেন—কণ্ঠে গদগদ স্বরে আধো আধো বাণী। এখন রাধা—

আন ছলে অঙ্গন আন ছলে পন্থ।
সঘনে গতাগতি করসি একান্ত।

সাক্ষাৎদর্শন তো পরের কথা। চিত্রপটে কৃষ্ণকে দেখেই রাধা আত্মহারা—শ্যামনাম, মুরলী, পট দর্শন—এ তিনই তো রাধার মন কেড়ে নিয়েছে। এই তিন যে এক—কুলবতী রাধা তা জানেন না। তাই মরণই তার কাছে শ্রেয় মনে হচ্ছে—অথচ কানু-'অবহু'না মিলল।'

ঢল ঢল সজল জলদ তনু শোহন মোহন আভরণ সাজ।
অরুণ নয়ন গতি বিজুরি চমক জিতি দগধল কুলবতি লাজ॥
সজনি যাইতে পেখলু' কান।
তব ধরি জগ ভরি ভরল কুসুম শর নয়নে না হেরিয়ে আন॥
মধু মুখ দরশি বিহসি তনু মোড়ই বিগলিত মোহন বংশ।
না জানিয়ে কোন মনোরথে আকুল কিশলয় দলে করু দংশ॥
অতয়ে সে মধু মন জলতহি অনুখন দোলত চপল পরাণ।
গোবিন্দদাস মিছই আশোয়াসল অবহু' না মীলল কান॥

তারপর দর্শনজনিত অনুভূতি। শ্যামের মরকতদর্পণের মত উজ্জ্বল রূপ দর্শনে রাধা অনঙ্গবাণে বিদ্ধ হলেন। তারপর থেকে রাধার কাছে গৃহ অরণ্য এবং চন্দন অগ্নিতুল্য বলে

বোধ হচ্ছে। দখিণা পবন লাগছে বিষং। আর—'ধৈরজ লাজ গেল দুহু ভাগি।' আর একটি পদে রূপদর্শনজনিত অনুভূতির মধ্য দিয়ে রাধার প্রেমের অতলস্পর্শী গভীরতা প্রকাশ পাচ্ছে। তখনো দর্শনের পর্যায়ে আছে—স্পর্শজনিত অনুভূতি লাভ হয় নি। তাতেই বা কত সূক্ষ্মতা! কৃষ্ণের স্পর্শের জন্য রাধার অন্তরে আগুন জ্বলছে। জীবন থাকবে কি যাবে —রাধা জানেন না—এখন 'জনু তনু দহত পতঙ্গী।'

আধক আধ আধ দিঠি অঞ্চলে যব ধরি পেখলু' কান।
কত শত কোটি কুসুমশরে জর জর রহত কি যাত পরাণ॥
সজনি জানলু' বিহি মোরে বাম।
দুহু' লোচন ভরি যো হরি হেরই তছু পায়ে মঝু পরণাম॥
সুনয়নি কহত কানু ঘনশ্যামর মোহে বিজুরিসম লাগি।
রসবতি তাক পরশরসে ভাসত হামারি হৃদয়ে জলু আগি॥
প্রেমবতি প্রেম লাগি জিউ তেজত চাপল জিবনে মঝু সাধ।
গোবিন্দদাস ভণে শ্রীবল্লভ জানে রসবতি-রস-মরিয়াদ॥

কৃষ্ণকে নিমেষ মাত্র দর্শনেই রাধার এখন-তখন অবস্থা। যিনি কৃষ্ণকে দুই চক্ষু ভরে দেখতে পারেন, সেই রমণী ধন্যা। সখী কৃষ্ণকে ঘনশ্যাম বলে—কিন্তু রাধার মনে হয় বিজলির চমক। রাধার হৃদয় জ্বলছে—তবু তাঁর জীবনে সাধ। রাধার এখন বিষম অবস্থা—পুলকে তনু-মন পরিপূর্ণ, বংশীধ্বনি-শ্রুত-কর্ণে অন্য প্রসঙ্গ আর ভালো লাগে না, গৃহধর্ম ও কূলধর্ম বিলুপ্ত, গৃহজন-পরিজন সম্পর্কে বোধ অন্তর্হিত—

রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি পুলক না তেজই অঙ্গ।
মোহন মুরলী-রবে শ্রুতি পরিপূরিত না শুনে আন পরসঙ্গ॥
সজনি, অব কি করবি উপদেশ।
কানু অনুরাগে তনুমন মাতল না শুনে ধরম-লব-বেশ॥
নাসিকাহো সে অঙ্গের সৌরভে উনমত বদনে না লয় আন নাম।
নব নব গুণ গণে বান্ধল মঝু মনে ধরম রহব কোন ঠাম॥
গৃহপতি তরজনে গুরুজন-গরজনে অন্তরে উপজয়ে হাস।
তহি' এক মনোরথ যদি হয় অনুরত পুছত গোবিন্দদাস॥

—কৃষ্ণের রূপদর্শনে রাধার দৃষ্টি পূর্ণ। তাঁর মধুর স্পর্শের কথা স্মরণ করে অঙ্গের পুলক ছাড়তে চায় না। তাঁর মোহন মুরলী ধ্বনি শ্রবণ করে অন্য প্রসঙ্গ রাধা আর শুনতে চান না। সজনি এখন আমাকে আর কী উপদেশ দেবে? কানু অনুরাগে আমার দেহমন মেতে আছে, সেখানে লেশমাত্র ধর্মকথা শুনতে চায় না। তাঁর অঙ্গের সৌরভে আমার নাসিকা উন্মত্ত, বদনও অন্য নাম নেয় না। নতুন নতুন গুণে আমার মন আবদ্ধ, সেখানে ধর্ম আর কোন ঠাঁই পাবে? গৃহপতির তর্জন, গুরুজনের গর্জন সব কিছুতেই আমার মনে হাসির উদ্রেক করে। গোবিন্দদাস বলেন, সেটাই অনুক্ষণ থাকুক, এটাই একমাত্র মনোরথ।

আলোচ্য পদটিতে আলঙ্কারিক উপায়ে প্রেমের গভীরতা ও অতিশায়িতা বর্ণনা করা হয়েছে। মণ্ডনশিল্পের অপূর্ব নিদর্শনরূপে আলোচ্য পদটি উল্লেখ্য।

গোবিন্দদাসের লেখনীতে কৃষ্ণের পূর্বরাগও অতি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। কৃষ্ণ রাধাসুন্দরী দর্শন করে আকৃষ্ট ও বিমোহিত। রাধার দেহবল্লরী, গমনভঙ্গি, দৃষ্টিক্ষেপ—সব কিছুর মধ্যে সৌন্দর্যের হিল্লোল অবলোকন করেন। যেমন—'যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু-জ্যোতি। তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকময় হোতি॥ যাঁহা যাঁহা অরুণ-চরণ চল চলই। তাঁহা তাঁহা থল-কমল-দল খলই॥ দেখ সখি কো ধনি সহচরী মেলি। আমারি জীবন সঞে করতহি খেলি॥' বস্তুত, পূর্বরাগ পর্যায়েই রাই কানু দুজনেই পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। আর তার ফলেই পরবর্তী পর্যায়ে রাধামাধবের দ্বিধাবিভক্ত প্রেমসত্তার চকিত চঞ্চল গতিতে আঁকাবাঁকা পথে মোহনার উদ্দেশ্যে যাত্রা বর্ণ ও তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে।

॥ ৫ ॥

বৈষ্ণব সাহিত্যে অভিসার-পদ বর্ণনায় গোবিন্দদাস শ্রেষ্ঠ কবিকৃতির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর অভিসারের পদে একদিকে তত্ত্ব, অন্যদিকে কবিত্বশক্তির সমন্বয় ঘটেছে। গ্রীষ্মাভিসার, বাদলাভিসার, হিমাভিসার, কুজ্ঝটিকাভিসার—অসংখ্য বৈচিত্র্যময় অভিসারের সমাবেশে গোবিন্দদাসের এ-জাতীয় পদাবলী মুখর। অভিসার বর্ণনায় ভাবের গভীরতা ও বর্ণনার মনোহারিতার চূড়ান্ত পরিচয় আমাদের কবি দেখিয়েছেন। এ জাতীয় পদে তাঁর তুলনা একমাত্র বিদ্যাপতি। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, জ্ঞানদাসের অধিকাংশ পদ তিমিরাভিসার বিষয়ক। সেক্ষেত্রে গোবিন্দদাস বহু বিচিত্র অভিসারের ঘন নিষেকে ভগবত প্রেম ও মানবীয় প্রেমের উচ্চতার নিবিড় পরিচয় উপস্থাপিত করেছেন।

রাধা অভিসারের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। এখন তাঁর তনু-মন কৃষ্ণময়। কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের আকুল উদ্দেশ্যে রাধা তাই দুশ্চর তপস্যায় মগ্না। আঙিনায় জল ঢেলে পিচ্ছিল করে, কণ্টক পুঁতে—সেই পথে রাধা চলা অভ্যাস করছেন। হাতের কঙ্কণ উপহার দিয়ে তিনি সর্পবশের মন্ত্র শিখছেন। অন্যমনা রাধা পরিজনের বচন 'বধিরসম মানই'—

> কণ্টকগাড়ি কমলসম পদতল মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
> গাগরি বারি ঢারি করি পীছল চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥
> মাধব, তুয়া অভিসারক লাগি।
> দূতর পন্থ-গমন-ধনি সাধয়ে মন্দির যামিনী জাগি॥

তারপর অভিসারের সময় উপস্থিত হলে সঙ্গীরা রাধাকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেন। এত বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে সেই দূরবর্তী স্থানে যাওয়ার কি প্রয়োজন?

> মন্দির-বাহির কঠিন কপাট।
> চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট॥

তঁহি অতি দূরতর বাদর দোল।
বারি কি বারই নীল-নিচোল ॥
সুন্দরি, কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস-সুরধুনী পার ॥

বাধা একটা নয়, বহু। কিন্তু শ্রীমতী অবিচল। কোন বাধাই আর তিনি মানতে রাজী নন। মনের লজ্জা, দ্বিধা, সঙ্কোচ—অন্তরের সব বাধাকে যিনি অপসারিত করতে পেরেছেন বাইরের বাধা তাঁর আর কতটুকু ক্ষতি করতে পারবে?

কুল মরিযাদ-কপাট উদ্‌ঘাটলুঁ তাহে কি কাঠকি বাধা।
নিজ মরিযাদ সিন্ধু সঞে পঙারলুঁ তাহে কি তটিনী অগাধা ॥
সজনি মঝু পরিখন কর দূর।
কৈছে হৃদয় করি পন্থ হেরত হরি সোঙরি সোঙরি মন ঝুর ॥

রাধা সঙ্কেত স্থানে যখন উপস্থিত হলেন, তখন পথের সব কষ্ট দূর হ'ল—কেনন কৃষ্ণের-'পিরীতি-মূরতি অধিদেবা'র—অনুগ্রহ লাভ করলেন তিনি—নতুন ভাব-ব্যঞ্জনায় সঙ্কেতিত হ'ল মিলনের নবতর তাৎপর্য।

যাকর দরশনে সব দুখ মিটল
সোই আপনে করু সেবা ॥

এখানেই বিদ্যাপতির সার্থক উত্তরসূরী কবি গোবিন্দদাস। অভিসারের অসহ্য কষ্টের অবসানের পর মিলনের পরম আনন্দে পথের সব কষ্টের কথা ভুলে গেলেন শ্রীমতী। অভিসারের দৈব-বিপাকের কথা লক্ষ মুখে যিনি বলেন, তিনি যে সেই মুহূর্তে সেই বেদনার উপলব্ধিতে ভরপুর নন, একথা কে না বুঝে? ঘন অন্ধকার রজনী, দূরদুর্গম পথে 'পদযুগে বেঢ়ল ভুজঙ্গ', ঘোর বর্ষার অবিরল জলধারা, তার মাঝে শ্রীমতী অভিসারে চলেছেন – কিন্তু পথের দুঃখ তুচ্ছ করে, বংশীধ্বনি শ্রবণে উতলা শ্রীরাধা গৃহ-সুখ-আশা ত্যাগ করে যখন সঙ্কেত-স্থানে উপস্থিত হয়ে দয়িতের দেখা পেলেন, তখন—

তুয়া দরশন আশে কছু নাহি জানলুঁ
চির দুখ অব দূরে গেল ॥

আগেই বলেছি যে, অভিসারের সকল প্রকার বৈচিত্র্যের পরিচয় গোবিন্দদাসের রচনায় পাওয়া যায়—আর তা শিল্পগুণেও সমৃদ্ধ। কয়েকটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক—

জ্যোৎস্নাভিসার—কুন্দকুসুমে ভরু কবরিক ভার।
হৃদয়ে বিরাজিত মোতিম হার ॥
চন্দন চরচিত রুচির কপূর।
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ ভরিপূর ॥
চান্দনি রজনি উজোরলি গোরি।
হরি অভিসার রভসরসে ভোরি ॥

তিমিরাভিসার—

নীলিম মৃগমদে তনু অনুলেপন নীলিম হার উজোর।
নীল বলয়গণে ভুজযুগ মণ্ডিত পহিরণ নীল নিচোল ॥
সুন্দরি হরি অভিসারক লাগি।
নব অনুরাগে গোরি ভেল শ্যামরি কুহু যামিনী ভয় ভাগি ॥

বর্ষাভিসার—

মেঘ যামিনি চললি কামিনি পহিরি নীল নিচোল রে।
সঙ্গে নায়ক কুসুম শায়ক ছোড়ি মঞ্জীর লোল বে ॥

হিমাভিসার—

পৌখলি রজনি পবন বহ মন্দ।
চৌদিশে হিমকর করু বন্ধ ॥
মন্দিরে রহত সবহু' তনু কাঁপ।
জগজন শয়নে নয়ন রহু' ঝাঁপ ॥
এ সখি হেরি চমক মোহে লাই।
ঐছে সময়ে অভিসারল রাই ॥

দিবাভিসার—

মাথাহি' তপন তপত পথ বালুক আতপ দহন বিথার।
ননিক পুতলি তনু চরণ কমল জনু দিনহি করল অভিসার ॥

উন্মত্তাভিসার—

মণিময় মঞ্জির যতনে আনি ধনি সো পহিরল দুই হাত।
কিঙ্কিণি গীম হার বলি পহিরল হার সাজাওল মাথ ॥
সুন্দরি অপরূপ পেখলু' আজ।
হরি অভিসার ভরম ভরে সুন্দরি বিছুরল সাজ বিসাজ ॥

॥ ৬ ॥

(বিভিন্ন প্রকার নায়িকার বর্ণনায় গোবিন্দদাসের পদে কবিকৃতির সার্থক নিদর্শন পাওয়া যায়। এ সকল পদে ভাব কল্পনার ঐশ্বর্য ও পদ বিন্যাসের চাতুর্য বর্তমান। এসব বর্ণনায় তিনি পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেও সম্পূর্ণ নতুন কিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন।

বাসকসজ্জায় নায়িকা সঙ্কেতকুঞ্জ সাজিয়েছেন। সুবাসিত বারি, কর্পূরিত তাম্বুল, কুসুমিত সজ্জা, উজ্জ্বল দীপ—তদুপরি চারিদিকে নিসর্গ-সৌন্দর্যও শোভা পাচ্ছে। এই উপচারে আজ রাধা 'আজু হরি ভেটব ঐছন মরম হামারি।')

সাজল কুসুম-শেজ পুন সাজই জারই জারল বাতি।
বাসিত খপুরে কপুরে পুন বাসই ভৈগেল মদন ভরাতি ॥
আজু রাই সাজলি বাসকশেজ।

কিন্তু কানুর পথ-আগমন-আশা বৃথাই গেল। রাধা সারানিশি কেঁদে কাল কাটালেন। —'পন্থ নেহারি বারি ঝরু লোচনে অধর নিরস ঘন শ্বাস।' শ্রীকৃষ্ণ এলেন—কিন্তু নিশা অবসানে। তখন রাধার খণ্ডিতা অবস্থা। তির্যক বচনে তিনি বিদ্ধ করেন কৃষ্ণকে। রাধার সম্মুখে অপরাধীর ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান কৃষ্ণ—তাঁর ললাটে সিন্দুর ও অঙ্গে নখচিহ্ন, চন্দন-রেণ ধূসরিত—যেন স্বয়ং শংকর সেখানে উপস্থিত।

আকুল চিকুর চূড়োপরি চন্দ্রক ভালহি সিন্দুরদহনা।
চন্দন চান্দ মাহা মৃগমদ-লাগল তাহে বেকত তিন নয়না ॥
মাধব অব তুহু শঙ্কর দেবা।
জাগর পুণ ফলে প্রাতরে ভেটল; দুরহি দূরে রহু যেবা ॥

তীব্র বাক্যবাণে বিদ্ধ হ'য়ে কৃষ্ণ চলে গেলে অনুশোচনায় দগ্ধ হতে থাকেন রাধা—শুরু হয় কলহান্তরিতার অবস্থা। কানুর মুরলিরবে আকৃষ্ট রাধা কানুরূপ দর্শনে মুগ্ধ হয়ে দেহ-মন-প্রাণ সব দয়িতের উদ্দেশে সমর্পণ করেছিলেন—কিন্তু সে বহুবল্লভ কানু তাঁর প্রেম উপেক্ষা করে অন্য নারীতে আসক্ত। আবার তাঁর সঙ্গে বিবাদ করেও রাধা জ্বলে পুড়ে মরেন —কৃষ্ণকে আঘাত করেও তাঁর দুঃখের অন্ত থাকে না।

আন্ধল প্রেম পহিলে নাহি হেরল;
সো বহুবল্লভ কান।
আদর সাধে বাদ করি তা সঞে
অহনিশি জলত পরাণ ॥

এর আগে মান পর্যায়েও শ্রীমতীর অন্তহীন বিরহদশার বাঙ্ময়চিত্র আমরা গোবিন্দদাসের পদে দেখতে পাই। খণ্ডিতা শ্রীরাধা বাক্যবাণে কৃষ্ণকে জর্জরিত করলে কৃষ্ণ নানা প্রবোধ বাক্যে তাঁকে আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু অভিমানে রাধা বেদনাকাতর কণ্ঠে বিলাপ করেন। সখীরা তাঁকে প্রবোধ দেন; কিন্তু রাধা কিছুতেই আশ্বস্ত হতে পারেন না। কলহান্তরিতা রূপ তারই পরিণতি। মানের আধিক্যে শ্রীরাধা বিলাপ করেন—

কুলবতী কোই নয়নে জনি হেরই হেরত পুন জনি কান।
কানু হেরি জনি প্রেম বাঢ়াওই প্রেমে করয়ে জনি মান ॥...

॥ ৭ ॥

(গোবিন্দদাস সম্ভোগাখ্য শৃঙ্গার রসের কবি। মিলনের উল্লাস তাঁর কাব্যে অপরূপ সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে। বসন্ত, রাস, হোরি—প্রভৃতি লীলা বর্ণনাকালে কবির কল্পনা, সৌন্দর্যবিন্যাস, ছন্দোবৈচিত্র্য আমাদের মুগ্ধ করে। আমাদের কবি তাঁর সৃজন-প্রতিভার দ্বারা প্রকৃতির পটভূমিকায় মানবহৃদয়ের চিরন্তন আকৃতি ও রভসলীলাকে অভিনব

শিল্পবস্তুতে রূপান্তরিত করেছেন। শরৎকালে রসোৎসবের পটভূমিকাটি অতি সুন্দর—

শরদ চন্দ পবন মন্দ বিপিনে ভরল কুসুমগন্ধ
ফুলমল্লিকা মালতিযূথি মত্ত মধুকর ভোরণি।

এ হেন পরিবেশে কুলবতী-চিত্ত-চোর মাধবের মুরলিগানে রাধা ঘর ছেড়ে এসেছেন—তাঁর 'এক নয়নে কাজর রেহ বাহে রঞ্জিত কঙ্কন একু একু কুণ্ডল ডোলনি।' রাধামাধবের মিলন দৃশ্যটি আঁকতেও আমাদের কবি ভোলেন নি—

ও নব জলধর অঙ্গ। ইহ থির বিজুরি তরঙ্গ॥
ও বর মরকত ঠান। ইহ কাঞ্চন দশবাণ॥
রাধামাধব মেলি।

হোরিলীলায় রাধাকৃষ্ণ বিবাহ করছেন—তাঁদের সর্বাঙ্গে চুয়াচন্দন, পরিমল কুঙ্কুম, ফাগুরঙ্গ—সঙ্গীতের অমৃত-লহরীতে দিক্‌দিগন্তর আচ্ছন্ন।

খেলত ফাগু বৃন্দাবন চান্দ।
ঋতুপতি মনমথ মনমথ ছান্দ।

বসন্তকালীন রাসেও সেই মিলনের আনন্দ। পরিকল্পনা এখানে উল্লাসের আধিক্যে মুখর, সম্ভোগবর্ণনার মধ্যে কবিকল্পনা যেন 'আহ্লাদে আটখানা' হয়ে উঠেছে। উল্লাসরসের পদে গোবিন্দদাস অদ্বিতীয়—সমালোচকের এই অভিমত যথার্থ।[1]

॥ ৮ ॥

গোবিন্দদাসের কয়েকটি রসোদ্‌গারের পদ আছে। এ জাতীয় পদ রচনায় কোন বৈষ্ণব কবি-ই তেমন সাফল্যলাভ করতে পারেন নি। কারণ মিলনলীলার স্থূল বর্ণনা কোন কবি-কল্পনাকে তেমন জাগ্রত করতে পারে না। কিন্তু গোবিন্দদাসের রসোদ্‌গারের পদগুলি রচনাপারিপাট্যে অতি সুন্দর হয়ে উঠেছে। উপমাদি অলঙ্কারের সাহায্যে তিনি বর্ণিতব্য স্থূল বস্তুকে উপভোগ্য করে তুলেছেন। এখানেই তাঁর কবিকলার সার্থকতা। বলা যেতে পারে যে, গোবিন্দদাসের কবিকৃতির এখানে অগ্নিপরীক্ষা হয়েছে—আর তাতে তিনি সফলও হয়েছেন। একটি দৃষ্টান্ত—

তনু তনু মিলনে উপজল প্রেম। মরকত যৈছন বেঢ়ল হেম॥
কনকলতায়ে যেন তরুণ তমাল। নব জলধরে যেন বিজুরি রসাল॥
কমলে মধুপ যেন পাওল সঙ্গ। দুহুঁ তনু পুলকিত প্রেম-তরঙ্গ॥
দুহুঁক অধরামৃত দুহুঁ করু পান। গোবিন্দদাস দুহুঁক গুণগান॥

সখীরা যখন রাধাকে সন্দেহ করে জিজ্ঞাসা করছেন—'কাহাঁ শিখলি ইহ রঙ্গ', তখন রাধা উত্তর দেন—

দরশনে লোর নয়নযুগ ঝাঁপি।
করইতে কোর দুহুঁ ভুজ কাঁপি॥

দূর কর এ সখি সো-পরসঙ্গ।
নামহি যাক অবশ করু অঙ্গ॥

—কিন্তু 'বলব না' মনে করেও রাধা রভস-লীলার সব কথা প্রকাশ করে দিচ্ছেন। আসলে বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে শ্রোতাকে আরো আগ্রহান্বিত করে তুলবার জন্যই এই পন্থা। অন্যদিকে সেই মিলনলীলার অপরিসীম মাধুর্য ও নিবিড় আনন্দটুকু সখীদের সামনে প্রকাশ না করেও থাকা যায় না। এখানেই রসোদ্‌গারের তাৎপর্য। রাধা সেই প্রিয়-মিলনস্মৃতি নিজে আস্বাদন করছেন রসোদ্‌গার বর্ণনার মধ্য দিয়ে—

নবঘন কিরণ বরণ নব নাগর মন্দিরে আওল মোর।
লোল নয়ন কোণে মদন জাগায়ল মৃদু মৃদু হাসি ভোর॥
সজনি কি কহব রজনি আনন্দ।
স্বপন বিলোকন কিয়ে ভেল দরশন মঝুমনে লাগল ধন্দ॥...

মিলনের স্মৃতিচারণার মুহূর্তে শ্রীরাধা কানুর প্রেমকে নতুনভাবে অনুভব করছেন। তাঁর হৃদয়মন্দিরে কানু নিদ্রিত, প্রেম-প্রহরীরূপে সেখানে জেগে আছে। গুরুজন-পরিজনের ভয়ও আর নেই। কানুর প্রতি প্রেমের শপথ বাণীই নানাভাবে উচ্চারিত—

হৃদয় মন্দিরে কোন কানু ঘুমাওল প্রেমপ্রহরি রহু জাগি।
গুরুজন গৌরব চৌরসদৃশ ভেল দূরহি দূরে বহু ভাগি॥
সজনি এতদিনে ভাঙ্গল ধন্দ।
কানু অনুরাগ ভুজঙ্গে গরাসিল কুল দাদরি মতি মন্দ॥
আপনক চরিত আপে নাহি সমুঝিয়ে আন করত হোয় আন।
ভাবে ভরল মন পরিজন বাঁচিতে গৃহপতি শপতিক ঠান॥
নয়নক নীর থীর নাহি বান্ধই না জানিয়ে কিয়ে ভেল আঁখি।
যত পরমাদ কহই নাহি পারিয়ে গোবিন্দদাস এক সাখী॥

॥ ৯ ॥

গোবিন্দদাসের বিরহ-পর্যায়ের অনেক পদ আছে। বর্ণনার চাতুর্যে ও ভাবকল্পনার ঐশ্বর্যে পদগুলি উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু বিরহে চিত্রধর্ম অপেক্ষা চিত্তধর্ম প্রধান বলে—হৃদয়ানুভূতির সূক্ষ্ম কারুকার্য সেখানে লক্ষ্য করা যায়। বিরহে সৌন্দর্যের পরিমণ্ডল নয়, চিত্তগহনের নিবিড় অনুভূতিটুকুর অলঙ্কৃত প্রকাশেই কাব্য সার্থক হয়ে ওঠে। গোবিন্দদাসের কবিধর্ম বহিরঙ্গ বর্ণনায় পথ খুঁজে পায়। বিদ্যাপতিও অনুরূপ। কিন্তু বিরহের পদে বিদ্যাপতি অলঙ্করণের লোভ অনেকটা সম্বরণ করে রাধার হৃদয়ের নিবিড় বেদনার বাঙ্ময় রূপের রসঘন প্রকাশে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু গোবিন্দদাস এ ক্ষেত্রে গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন নি। হৃদয়ানুভূতির যে রাজ্যে উপনীত হলে সব কথা হারিয়ে যায়, অথচ 'না বলা বাণী'-ই যেখানে শতভাষী হয়ে ওঠে—গোবিন্দদাস সে পথ অনুসরণে

তৎপর নন। তাঁর রাধা এ স্তরেও আপন বেদনায় অস্থির হয়ে উঠেছেন। আর আমাদের কবি সেই শাশ্বত বেদনাকে রঙে-রসে মণ্ডিত করে প্রকাশের জন্য তৎপর হয়ে উঠেছেন। তবে তুলির এক এক আঁচরে গোবিন্দদাস সেই নিত্যবেদনাকে রূপায়িত করেছেন। তাতে বিশ্বপ্রকৃতিও রাধার হৃদয়বেদনায় আকুল হয়ে উঠেছে।

মিলনের পরম লগ্নে রাধার মনে অমঙ্গল আশঙ্কা সংকেতিত হচ্ছে। মথুরা থেকে কে যেন এসেছে। তাকে দেখে—রাধার দেহ-মন কেঁপে উঠেছে, মন চঞ্চল হয়ে পড়েছে—নিদ্রা হয়েছে দূরীভূত।

কিয়ে ঘর বাহির চীত না রহ থির
জাগর নি'দ নাহি ভায়।
গাঢ়ল মনোরথ তৈখন ভাঙ্গত
কিয়ে সখি করব উপায়॥
কুসুমিত কুঞ্জে ভ্রমর নাহি গুঞ্জরে
সঘনে রোয়ত শুকসারি।
গোবিন্দদাস আনি সখি পুছহ
কাহে এত বিঘিনি বিথারি॥

মাধব কঠিন কর্তব্যের আহ্বানে মথুরা চলে যাবেন—অক্রূর এসেছেন তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়ার জন্য। নাম অক্রূর, কিন্তু ব্রজনারীদের কাছে তিনি ক্রূরতার প্রতিমূর্তি। তাঁর আগমনবার্তা ঘরে ঘরে অমঙ্গল ঘোষিত করেছে। আগামীকাল প্রভাতে কৃষ্ণ চলে যাবেন। সখীগণ মন্ত্রণা করেন—'রচহ উপায় যৈছে নহ প্রাতর মন্দিরে রহু বনমালী।' শ্রীরাধা আর্তনাদ করে উঠেন—যার জন্য তিনি গুরুজনগঞ্জনা উপেক্ষা করেছেন, কুলবতীর ধর্ম জলাঞ্জলি দিয়েছেন, মণিময় মন্দির ছেড়ে, অভিসারের দুস্তর বাধা অতিক্রম করে, 'কণ্টক কুঞ্জে জাগি নিশি বাসর পন্থ নেহারত মোরি'—সেই কঠিন-প্রাণ-কৃষ্ণ আজ অক্লেশে তাঁকে ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। আবার কখনো রাধার মনে হচ্ছে—'হরি নহ নিরদয় রসময় দেহ। কৈছন তেজব নবিন সনেহ॥ দোষ কৃষ্ণের নয়, পাপী অক্রূরের। তিনিই ষড়যন্ত্র করে এই বিপত্তি ঘটিয়েছেন। কিন্তু মাধবকে আটকে রাখা গেল না। হরি মথুরাপুরে চলে গেলেন। তাঁর অন্তর্ধানে দিক্‌দিগন্তর শূন্যতায় পরিপ্লাবিত হয়ে গেল। শ্রীমতী ডুকরে কেঁদে ওঠেন—

হরি কি মথুরাপুর গেল।
আজু গোকুল শূন ভেল॥...
হাম সাগরে তেজব পরাণ।
আন জনমে হব কান॥
কানু হোয়ব যব রাধা।
তব জানব বিরহক বাধা॥

বিরহের নিদারুণ তাপে জর্জরিত শ্রীরাধার এই অভিশাপ-বাণী অতি দুঃখ থেকে উৎসারিত। এই উক্তির মধ্য দিয়েই তাঁর বিরহের তীব্রতা অনুভব করা যায়। রাধা আর্তনাদ করেন—প্রেম-অঙ্কুরের উদ্গম হতে না হতেই রৌদ্রে তা শুকিয়ে গেল। যুগল পলাশের অবকাশ ঘটল না। কৃষ্ণ রাধার জীবনে প্রতিপদের চাঁদের মত উদয় হয়েই অস্ত গেলেন—রাধাকে নিবিড় অন্ধকারে ঢেকে রেখে। কণামাত্র সুখের আশাও রাধার পূর্ণ হল না। মাধব এমন নিঠুর হলেন—

প্রেমক অঙ্কুর জাত আত ভেল না ভেল যুগল পলাশা।
প্রতিপদ চাঁদ উদয় যৈছে যামিনী সুখ লব ভৈ গেল নিরাশা॥
সখি হে অব মোহে নিঠুর মাধাই।
অবধি রহল বিছুরাই॥
কো জানে চাঁদ চকোরিণী বৈঞ্চব মাধবি মধুপ সুজান।
অনুভবি কানু পিরীতি অনুমানিয়ে বিঘটিত বিহি নিরমাণ॥
পাপ পরাণ আন নাহি জানত কানু কানু করি ঝুর।
বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব গোবিন্দদাস রসপূর॥

শ্রীমতি বিলাপ করেন; এখন বিলাপই তাঁর একমাত্র সম্বল। সখিকে সম্বোধন করে তিনি বলেন—সখি, আমার প্রিয়তম প্রাণ থেকে প্রিয়। কিন্তু সেই বজ্রসম নিঠুর হৃদয় মাধব তো আজও এলেন না। "নখর খোয়ায়লু দিবস লিখি লিখি। নয়ন আন্ধুয়া ভেল পিয়া পথ দেখি॥" কিন্তু, তবু, প্রিয় এলেন না। আমার দোষগুণ কি, কিছুই জানি না। তবু প্রিয় আমাকে পরিত্যাগ করেছেন। এখন—

হেন জন নাহি কহয়ে পিয়া পাশ॥
হেন মনে হোয়ে সখি যাঙ সেই দেশ।

রাধা বিপাকে পড়েছেন। তাঁর নয়নে নিদ্রা ও বয়ানে হাসি নেই। তিনি জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছেন। প্রিয়হারা দিনগুলি কেমন করে কাটবে, তাও তিনি জানেন না। অভাগিনী রাধার বিধি প্রতিকূল।

পিয়া গেল মধুপুর হাম কুলবালা। বিপথে পড়ল যৈছে মালতিক মালা॥
কি কহসি কি পুছসি শুন প্রিয় সজনি। কৈছনে বঞ্চব ইহ দিন রজনি॥
নয়নক নিন্দ গেও বয়নক হাস। সুখে গেও পিয়া সঙ্গে দুখ মঝুপাশ॥
যত ছিল মনোরথ সব ভেল বাদ। পরিহরি গেল বন্ধু বিনি অপরাধ॥
হাম নারি অভাগিনী বিহি ভেল বাম। পিয়া গেল মধুপুর ন পূরল কাম॥

ছয় ঋতু, বারো মাস ধরে রাধার অন্তহীন বিরহদশা বয়ে চলে। প্রেমানল বেড়েই যায়। শেষ পর্যন্ত রাধা ঠিক করেন—মরণেই তিনি শান্তি পাবেন।—

মরদেহে যাকে পান নি—মৃত্যুর পরে সর্বভূতে মিশে গিয়ে তিনি সেই দয়িতের নিবিড় প্রেমস্পর্শ লাভ করবেন। প্রভু অরুণচরণে যেদিকে যাবেন, সেই মৃত্তিকায় আমি মিশে থাকব। যে সরোবরে তিনি নিত্যস্নান করেন, আমি যেন সেই সরোবরের জল হয়ে থাকি। যে দর্পণে প্রভু আপন মুখ দেখেন, আমার দেহ তাতে জ্যোতি হয়ে থাকুক। মরণে রাধার দুঃখ নেই। কারণ বিরহও তো মরণতুল্য—"এ সখি বিরহ মরণ নিরদন্দ। ঐছে মিলই যব গোকুলচন্দ্র ॥" তবু এই সান্ত্বনা যে, মরণে বরং তিনি কৃষ্ণকে কাছে পাবেন।

॥ ১০ ॥

অবশেষে সব দুঃখের অবসান হ'ল। কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার মানস-মিলন ঘটল। আজ প্রিয় আসবেন—তার সব শুভসংকেত অঙ্গে ব্যক্ত হচ্ছে। রাধার দৃঢ় বিশ্বাস—কৃষ্ণ অবশ্যই আসবেন।

উলসিত মঝু হিয়া আজু আওব পিয়া দৈবে কহল শুভবাণী।
শুভসূচক যত প্রতি অঙ্গে বেকত অতয়ে নিচয় করি মানি।
শুন সজনি আজু মোর শুভদিন ভেল।
সুখসম্পদ বিহি আনি মিলায়ব ঐছন মতিগতি ভেল ॥

তার জন্য প্রস্তুতি চলছে। বহিরঙ্গ সাজসজ্জার সঙ্গে মিলেছে অন্তরের বাঁধাভাঙ্গা উল্লাস। কারণ—'প্রাণ প্রাণ হরি নিজ ঘরে আওব।' অবশেষে প্রিয়মিলনে সব উচ্ছ্বাস, সব আকুলতা মিলিয়ে গেল। পরম আনন্দের কলরোল ধ্বনিত হতে থাকল। নদী এসে মিলল সাগরে।

মধুরিম হাস— সুধারস বরিখণে
গদ্‌গদ রোধয়ে ভাষ।
চিরদিনে মিলন লাখগুণ নিধুবন
কহতহি গোবিন্দদাস ॥

পদাবলীর নানা দিক

তত্ত্বের রসপ্রকাশ

বৈষ্ণব পদাবলী বৈষ্ণবতত্ত্বের রসপ্রকাশ। প্রাক্-চৈতন্য যুগের বৈষ্ণব পদাবলীতে তত্ত্ব-ভাবনা তেমন প্রখর ছিল না। বরং জীবন-রসে তা ছিল উচ্ছল। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেন—'প্রাচীন বৈষ্ণব প্রেম-কবিতায় ধর্মের প্রেরণা একান্তই গৌণ ছিল, কাব্য-প্রেরণাই সেখানে আসল কথা।...তাঁহারা কবি ছিলেন, নর-নারীর প্রেম সম্বন্ধে তাঁহারা বিবিধ কবিতা রচনা করিয়াছেন, সেই একই দৃষ্টি—একই প্রেরণা অবলম্বন করিযাই তাঁহারা রাধাকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া কবিতা লিখিয়াছেন।"

কিন্তু চৈতন্যোত্তর যুগে বৈষ্ণব পদাবলীর আবেদন ও তাৎপর্য সম্পূর্ণ পাল্‌টে গেল। শ্রীচৈতন্যদেবের দিব্যজীবনের পাবনী স্পর্শে বৈষ্ণবধর্মের শীর্ণ খাতে নব-জীবনের উত্তাল কলরোল শোনা গেল। এতদিন রাধাকৃষ্ণলীলা অমূর্ত তত্ত্বভাবনা মাত্র ছিল। চৈতন্যদেব রাধাপ্রেমের নিগূঢ় রহস্যের মূর্ত বিগ্রহরূপে দেখা দিলেন। রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব রাধাকৃষ্ণ-লীলারহস্য প্রকটিত করতে আবির্ভূত হ'লেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের মতে, স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ চৈতন্যচন্দ্ররূপে আবির্ভূত। কোন তত্ত্ব, কোন উপদেশ নয়, আপন জীবনসাধনার ঘননিষেকে মহাপ্রভু অমূর্ত রাধাকৃষ্ণলীলা রসরূপে মূর্ত করে তুললেন। অন্যদিকে তাঁর প্রেরণায় বৃন্দাবনের ষড়্‌গোস্বামী প্রভুগণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন ও রসতত্ত্বকে গ্রন্থাকারে বিধৃত করলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম এক সুস্পষ্ট দার্শনিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হল। এরপর থেকে বৈষ্ণব কবিগণ পদ রচনায় সেই তত্ত্বকেই রসরূপ দান করতে লাগলেন। "বৈষ্ণবপদকর্তারা প্রধানতঃ কাব্য-রচনার জন্য পদাবলীর রচনা করেন নাই, সেগুলি তাঁহাদিগের বৈষ্ণব-ধর্মের প্রধান অঙ্গ ব্রজ-লীলা-ধ্যানের আনুষঙ্গিক ফল ও উহার সহায় মাত্র। এ অবস্থায় পদাবলী-রচনা করিতে যাইয়া, শ্রীকৃষ্ণ যে সর্বাবতার-শ্রেষ্ঠ শ্রীভগবান্ ও শ্রীরাধা যে সেই ভগবানের পরা-শক্তি বা পরা-প্রকৃতি—এই মূলীভূত তত্ত্বটি তাঁহারা কদাপি বিস্মৃত হন নাই। পদাবলীর পাঠকও এই তত্ত্বটি বিস্মৃত হইবেন না।" (পদকল্পতরু/৫ম খণ্ড)।

বৈষ্ণবতত্ত্বে, সকল মাধুর্যের ঘনীভূত বিগ্রহ কৃষ্ণ আপন হ্লাদিনী-শক্তি দিয়ে রাধাকে সৃষ্টি করলেন—মূলে রাধাকৃষ্ণে কোন ভেদ নেই। 'রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান। দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ॥' রসলীলার নিমিত্ত সেই অদ্বয় সত্তার দ্বিধা-বিভক্ত রূপায়ণ। আবার লীলার অবসানে 'দুই দেহ, এক আত্মা' একদেহে মিশে গেল। বৈষ্ণব পদাবলী সেই অপরূপ লীলাতত্ত্বেরই বাঙ্ময় রসরূপ—"বিশেষতঃ পদকর্তারা ছিলেন বৈষ্ণব সাধক। কাজেই বৈষ্ণবলীলাতত্ত্বকে অবলম্বন করিয়াই তাঁহারা সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন। রাধাশ্যামের প্রণয়লীলাই পদাবলীর মুখ্য বিষয়বস্তু।" (পদাবলী সাহিত্য)।

কবি কর্ণপূরের অলঙ্কারকৌস্তুভ, রূপ গোস্বামীর ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি মহাগ্রন্থে লীলাতত্ত্ব সূত্রাকারে বিধৃত করা হয়েছিল। তারপর থেকে রাধাকৃষ্ণলীলা-রসাত্মক পদ রচনায় উক্ত গ্রন্থধৃত তত্ত্বগুলিই বৈষ্ণবকবিদের উপজীব্য হয়ে উঠল। ফলে একই ভাব বহু কবির কণ্ঠে বহুভাবে ধ্বনিত হতে লাগল। বস্তুত, এ কারণেই বৈষ্ণব পদাবলী সম্প্রদায়গত কাব্যকলার বাহনমাত্র হয়ে উঠল।

বৈষ্ণবকবিগণ মূলত রাধাকৃষ্ণের লীলারসাত্মক পদ রচনাতেই অধিক আগ্রহ দেখিয়েছেন। বৈষ্ণব মতে,

মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কোন ভেদ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥

পদকর্তা এই কথাই বলেছেন—ছন্দোবদ্ধ বাণীরূপে—

হিয়ার মাঝারে মোর এ'ঘর মন্দির গো
তাতে রতন-পালঙ্ক বিছা আছে।
অনুরাগের তুলিকায় বিছানো হ'য়েছে তায়
তাতে শ্যামচাঁদ ঘুমায়্যা রয়েছে॥...
এ বুক চিরিয়া যাবে বাহির করিয়া দিব
তবে শ্যাম মধুপুরে যাবে॥

পদাবলী ভক্তিরসের কাব্য;—এই ভক্তি আসলে প্রেম-ভক্তি—যা সাধ্যবস্তু হিসাবে সর্বোত্তম। এই প্রেমভক্তির আবার শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচটি স্তর। বৈষ্ণবভক্ত তত্ত্বের সঙ্গতিসূত্রে পদাবলীর রস আস্বাদন করেন ভক্তিসাধনার অর্ঘ্য হিসাবে। পদকর্তাগণও রসতত্ত্ব-প্রবক্তা মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রেমভক্তির বিভিন্ন স্তর—বিশেষ করে সর্বসাধ্যসার কান্তাপ্রেমের স্তর-পারম্পর্য ছন্দায়িত করেছেন। পূর্বরাগের পদে অখিলরসামৃতসিন্ধু, পরম নায়ক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ, অভিসার পর্যায়ে নানা বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে সেই পরম স্বরূপের উদ্দেশে যাত্রা, নিবেদন পর্যায়ে সর্ব সমর্পণ, প্রেম-বৈচিত্ত্যে প্রিয়কে পেয়েও হারানোর ভয়, বিরহ-স্তরে প্রিয়তমকে হারিয়ে সব-শূন্যতার অনুভূতি। নিদারুণ বেদনার পরম উপলব্ধির মধ্য দিয়ে চলে রাধার নিজেকে মিশিয়ে দেওয়ার সাধনা। —মহাভাবস্বরূপিণী রাধার জীবনচিত্র—

যাঁহা পহুঁ অরুণ চরণে চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণী হইয়ে মঝু গাত॥...
এ সখি বিরহ মরণ নিরদন্দ।
ঐছনে মিলই যব গোকুল চন্দ॥...

"এই যে শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করবার জন্য মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধিকার আত্মবিলুপ্তির সাধনা, এরই মধ্য দিয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছে। এইজনাই বৈষ্ণব-মহাজন-পদাবলী গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের রসভাষ্য বলে স্বীকৃত হয়েছে।" (ডঃ সতী ঘোষ)।

প্রাক্, সমসাময়িক ও পরচৈতন্য বৈষ্ণব পদাবলীর তুলনা

কালগত বিচারে সমগ্র বৈষ্ণব পদাবলীকে আমরা তিনভাগে বিভক্ত করতে পারি—প্রাক্‌চৈতন্য, চৈতন্য সমসাময়িক ও চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলী। শুধু কালের দিক থেকে নয়, আদর্শ ও মর্জির দিক থেকেও এই পার্থক্য সুচিহ্নিত। এই পার্থক্যের মূল স্বরূপও আমাদের জানা প্রয়োজন।

(১) চৈতন্যপূর্বযুগের কবির কোন বিশেষ সাম্প্রদায়িক আদর্শগত প্রেরণা ছিল না। আর গোষ্ঠীগত প্রেরণা না থাকার জন্যই চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবির ব্যক্তিক অনুভূতির প্রকাশে পদাবলী হয়ে উঠতে পেরেছে বিশিষ্ট লক্ষণের অধিকারী। কিন্তু চৈতন্যোত্তর যুগের কবি-সম্প্রদায় চৈতন্যদেবের আড়ালে দাঁড়িয়ে রাধা-কৃষ্ণলীলার মাধুর্য উপভোগ করেছেন। তাঁদের মানস-সংস্কৃতিতে চৈতন্য-জীবন-সাধনা যে বৈভবের সঞ্চার করেছিল, তার ফলে ধর্মকেন্দ্রিক পটভূমিকায় সংস্থাপিত রাধাকৃষ্ণলীলা নতুন রূপে রূপায়িত ও আস্বাদিত হ'তে থাকল। এর ফলেই আমরা দেখি, বৈষ্ণব কবিতায় ভাব ও রূপকলার ক্ষেত্রে এক অভিনব পরিবর্তনের সূচনা। একদিকে যেমন বল্গাহীন আবেগোচ্ছ্বাসের তূর্য সীমায়িত হ'ল চৈতন্যজীবনতাৎপর্যের গণ্ডীতে, অপরদিকে আবার বৈষ্ণব কবিতায় নরনারীর প্রেমের প্রাকৃত ও সংকীর্ণ আবেদন সমুন্নতি লাভ করল চৈতন্যজীবনমহিমার দ্বারাই। গৌরচন্দ্রিকার পদে তারই সূচনা।

(২) রাধাকৃষ্ণলীলা সম্পর্কে কোন ধর্মবিশ্বাস প্রাক্ চৈতন্যযুগে না থাকলেও চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি-জয়দেবের পদ আস্বাদন করা চলে। সেখানে 'হরিস্মরণে সরসং মনো'—এর সঙ্গে 'বিলাসকলাসু কুতূহলম্'—এর আবেদন উপলব্ধ হয়। কিন্তু বৈষ্ণবতত্ত্ব সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকলে চৈতন্যোত্তর যুগে বৈষ্ণব পদাবলীর পূর্ণ রসাস্বাদন সম্ভব নয়।

(৩) প্রাক্‌চৈতন্য যুগে ভক্ত-কবির মানসে মুক্তি-বাঞ্ছাই ছিল প্রধান। বিদ্যাপতির পদে আমরা পাই :

ভনয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয়া পদপল্লব করি অবলম্বন
তিল দেহ এক দীনবন্ধু॥

কিন্তু চৈতন্যোত্তর যুগের প্রার্থনার পদে মুক্তি-বাঞ্ছার চিহ্নও থাকল না। সাধকের কাছে তখন—'মুক্তি-বাঞ্ছা কৈতব প্রধান। যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান॥' ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি এবং গোপীদিগের অনুগত হয়ে রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবার সুযোগ লাভ—তাদের চরম প্রার্থনার বিষয় হয়ে দাঁড়াল।

(৪) প্রাক্‌চৈতন্যযুগে কৃষ্ণের মাধুর্যভাবের সঙ্গে ঐশ্বর্যভাবের মিশ্রণও দেখা যায় সাহিত্যে। পরচৈতন্যযুগে ঐশ্বর্যভাব তিরোহিত হ'ল। কৃষ্ণপ্রেম চরম ও পরম পুরুষার্থ বলে পরিগণিত হ'ল। বলা হোল—'প্রেম মহাধন। কৃষ্ণকে মাধুর্যরস করায় আস্বাদন॥' সাধ্যাবধি সুনিশ্চিত এই প্রেমের স্তর পরম্পরায় আবার রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি। বস্তুত, মধুররসের সাধনাই বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠ সাধনা বলে পরিগণিত হ'ল।

(৫) প্রাক্‌চৈতন্যযুগে রাধা ও চন্দ্রাবলী অভিন্না। কৃষ্ণকীর্তনের একাধিক স্থানে বলা হয়েছে 'রাইচন্দ্রাবলা'। কিন্তু পরচৈতন্যযুগে রাধা নায়িকা, চন্দ্রাবলী প্রতিনায়িকা। অধিকন্তু, প্রাক্‌চৈতন্যযুগের সামান্যা নায়িকা রাধা পরচৈতন্যযুগে মহাভাবস্বরূপিণী রাধাঠাকুরাণীতে রূপান্তরিত। 'কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্তিরূপ করে আরাধনে। অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে॥'

(৬) চৈতন্যোত্তর যুগের সাধকবৃন্দ চৈতন্যদেবের ভগবত্তায় বিশ্বাসী ছিলেন। স্বরূপ দামোদরের কড়চায় তাঁর আবির্ভাবের যে কারণ অনুমিত হ'ল, সেই বিশ্বাসের বাঙ্ময় রূপদানই তখন কবি-সাধকদের প্রধান কর্তব্য হয়ে উঠল।

(৭) প্রাক্‌চৈতন্য যুগের বৈষ্ণব কবিগণ অনেকেই ছিলেন লীলাশুক। শুকপক্ষীর মত রাধাকৃষ্ণলীলা তাঁরা মানসনয়নে দর্শন, আস্বাদন ও বর্ণন করেছেন। যেমন, লীলাশুক বিল্বমঙ্গল ও জয়দেব। কিন্তু পরচৈতন্য যুগের বৈষ্ণব কবিগণ গোপীভাবে ভাবিত—রাগানুগা মার্গের সাধক।

(৮) প্রাক্‌চৈতন্যযুগের অমূর্ত-তত্ত্ব-ভাবনা বিষয়ীকৃত হয়েছিল চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনে। তাই পরচৈতন্যযুগে কবিগণ—চৈতন্যজীবনবিভার দ্বারা রাধাপ্রেমের চিত্র অঙ্কিত করেছেন। এ কারণেই চৈতন্যদেব মধুর-বৃন্দা-বিপিন-মাধুরী-প্রবেশ-চাতুরি সার।'

(৯) প্রাক্‌চৈতন্য যুগের পদাবলী সম্ভোগাখ্য শৃঙ্গার রসাশ্রিত ; কিন্তু পরচৈতন্য যুগের পদাবলীতে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের পরিস্ফূর্তি লক্ষণীয়। মহাপ্রভু বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের সাক্ষাৎ বিগ্রহ। সমসাময়িক ও পরচৈতন্য বৈষ্ণব-কবিকুলের তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য নিরূপণে দেখা যায় যে, সমসাময়িক বৈষ্ণবসাধকের চোখে চৈতন্যদেবের ভগবৎ স্বরূপের সঙ্গে মানবিক রূপটিও মিশ্রিত ছিল। সমসাময়িক ভক্তবৃন্দ চৈতন্যদেবের ভগবৎস্বরূপে বিশ্বাসী হলেও পরিপূর্ণভাবে তাঁর তত্ত্বস্বরূপ নিরূপণের সুযোগ পান নি। এর প্রথম কারণ, শ্রীচৈতন্যদেব এ বিষয়ে ভক্তদের বিন্দুমাত্র উৎসাহকেও প্রতিহত করেছেন। দ্বিতীয় কারণ, তাঁরা চাক্ষুষ দর্শনে মহাপ্রভুর নভোস্পর্শী ব্যক্তিত্বের যে প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়েছিলেন, তার মধ্যে তাঁর মানবপরিচয়টি একেবারে অজ্ঞাত ছিল না। 'নিমাই সন্ন্যাসের কবিতায় তাঁদের আকুল ক্রন্দনে বৈষ্ণবতত্ত্ব ও ভক্তি অপেক্ষা মানবিক বেদনার রোলই উচ্চকণ্ঠ হ'য়ে উঠেছে।' (ক্ষেত্র গুপ্ত)। অনুরূপ কারণে, মাতার জন্য চৈতন্যদেবের আকুলতা ভক্তদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। ধর্ম-বুদ্ধি অপেক্ষা মানববুদ্ধি জয়ী না হলে তা সম্ভব নয়।

উভয় পর্যায়ের কবিবৃন্দই গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ রচনা করেছেন। কিন্তু সমসাময়িক যুগের কবিবৃন্দ গৌরাঙ্গদেবের যে চিত্র অঙ্কিত করেছেন, তা একান্ত ভাবে সজীব ও প্রত্যক্ষ ;

তার প্রকাশভঙ্গী পারিপাট্যহীন ও সরল। কারণ তাঁদের কাব্যিক অভিজ্ঞতা (Poetic experience) ছিল ব্যক্তিক ও প্রত্যক্ষ। তাই সেখানে কল্পনা ও মাণ্ডনিকতার অবসর ছিল অতি সংকীর্ণ। ফলে বর্ণনা সরল ও অনাড়ম্বর। কিন্তু পরচৈতন্যযুগের গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদে বিষয়বস্তুর মহিমা অভিন্ন হলেও মণ্ডন-পারিপাট্য এবং চৈতন্যোত্তর যুগের দার্শনিক ও আলংকারিক ঐতিহ্যের চরণপাত অদৃশ্য থাকেনি। বৃন্দাবনের ষড়্গোস্বামী কর্তৃক বিধৃত গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শনিক ও রসতত্ত্ব বহুল প্রচারিত হওয়ার পর যত পদ রচিত হয়েছে, তা সবই সেই তত্ত্বের রসরূপ। ফলে বহুক্ষেত্রে তত্ত্বের সুস্পষ্ট প্রকাশ থাকলেও তা কাব্য হয়ে উঠতে পেরেছে কদাচিৎ। গতানুগতিক প্রথাবদ্ধতার জলাভূমিতে আটকে পড়ে সপ্তদশ শতাব্দীর পরে বৈষ্ণব কবিতা কোন কোন ক্ষেত্রে কৃত্রিমতায় পর্যবসিত হয়ে পড়ল। বিশেষ করে, সহজিয়া সাধনার পঙ্কপল্লবে বৈষ্ণবের সুউচ্চ আদর্শবাদ যেমন, বৈষ্ণব কবিতা তেমনি তার ঔজ্জ্বল্য অনেক পরিমাণে হারিয়ে ফেলল।

রোমান্টিকতা ও বৈষ্ণব কবিতা

রোমান্টিকতার সংজ্ঞা : "The Romantic spirit can be defined as an accentuated predominance of emotional life, provoked or directed by the exercise of imaginative vision and in its turn stimulating or directing such exercise. Intense emotion coupled with an intense display of imagery, such is the frame of mind which supports and feeds the new literature." আবেগপ্রাণতা, কল্পনার ঐশ্বর্য, মানস তুরগের বাধাবন্ধনহীন গতি, অতীত প্রীতি, বিস্ময়বোধ, প্রকৃতির বৈচিত্র্য আস্বাদন, অজানার প্রতি তীব্র আকর্ষণ, অধরাকে না পাওয়ার বেদনা ও নৈরাশ্য—রোমান্টিকতার লক্ষণ। রোমান্টিক কবি বর্তমান পরিবেশে অসুস্থমনা হ'য়ে ওঠেন, আদর্শ জগতের সন্ধান পান অতীত বা ভবিষ্যতের মানসলোকে। রোমান্টিক কাব্যের ক্ষেত্রে এই 'feeling of nostalgic strangeness' একটি বিশেষ লক্ষণ। রোমান্টিক কবির আত্মবোধ অতি প্রখর। কারণ অনুভূতি ও কল্পনার সাহায্যেই সৃষ্ট হয় রোমান্টিকতার অন্যান্য লক্ষণ। এ কারণে রোমান্টিকতার সংক্ষিপ্ত অথচ জোরালো সংজ্ঞা হ'ল : 'An extraordinary development of imaginative sensibility.'

বৈষ্ণব কবিতা রোমান্টিক কিনা, এ নিয়ে আলোচনার অন্ত নেই। একদা রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলীকে মর্তপ্রেমানুভূতির অতি সূক্ষ্ম প্রকাশরূপে বিচার করেছিলেন। আধুনিক সমালোচকও বলেন : 'সাহিত্য হিসাবে যখন বিচার করিব, তখন বলিব বৈষ্ণব কবিতা বিশুদ্ধ রোমান্টিক প্রেম কবিতা।'

ধর্মগীতি রোমান্টিক কবিতার লক্ষণাক্রান্ত হয়ে উঠতে পারে। চর্যাপদে গুহ্যসাধন-তত্ত্বের প্রকাশ হলেও, রোমান্টিক গীতিকবিতার সুরমূর্ছনা তার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। দক্ষিণ ভারতের আলোয়ার সম্প্রদায়ের ভজন গাথা, সুফীদের ধর্মসঙ্গীত রোমান্টিকতার

লক্ষণ-যুক্ত। ঈশ্বরকে প্রেমিক, ভক্তের নিজেকে প্রেমিকা জ্ঞানে এই ভজন দেহকেন্দ্রিক জীবনরসের আধারেই পরিবেশিত। ব্লেকের কবিতায় ধর্মচেতনা রোমান্টিকতার পানপাত্রে পরিবেশিত হয়েছে।

বৈষ্ণব পদাবলীর রসমূল্য তার তত্ত্বমূল্য অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়। তত্ত্বজ্ঞানহীন রসিকের কাছে বৈষ্ণব পদাবলী বিশুদ্ধ রোমান্টিক প্রেম-কবিতা হিসাবে আস্বাদিত হওয়ার পক্ষে কোন বাধা থাকে না। সেই দৃষ্টিতে নরনারীর মিলন বিরহের শাশ্বত রূপায়ণ বৈষ্ণব পদে। পূর্বরাগ, অভিসার, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য, নিবেদন, ভাবসম্মিলন—এই প্রেম-চেতনারই বিচিত্র ও অতিসূক্ষ্ম প্রকাশ। নিত্য নবায়মান বৈচিত্র্যের মাঝে প্রেমের আস্বাদন-মূল্য বৃদ্ধি পায়। মর্ত-প্রেমের বাতায়নে দৃষ্ট যে জীবনরহস্য উপলব্ধ হয়, প্রেয়সীর নয়ন-পল্লবের চকিত ঝলকে যে সৌন্দর্য উন্মোচিত হয়, তা প্রতি মুহূর্তেই প্রেমিককে নিত্য নতুন অনুরাগের মহিমায় অভিষিক্ত করে তোলে। বৈষ্ণবকবি প্রেমের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপটি রঙে রসে মণ্ডিত করে তুলেছেন। প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন-বিরহের আনন্দ অশ্রুজল-গাথা-সমৃদ্ধ রোমান্টিক প্রেমের কবিতা হিসাবে এর সৌন্দর্যও তুলনাহীন।

কিন্তু মর্তপ্রেমের রোমান্টিক রসরহস্য বৈষ্ণব পদাবলীকে আবৃত করলেও একে পুরোপুরি রোমান্টিক কবিতা আখ্যা দেওয়ার পক্ষে বাধা আছে। বৈষ্ণব পদাবলী বৈষ্ণব তত্ত্বের রসভাষ্য। বৈষ্ণব মহাজন রাধাকৃষ্ণলীলাকে বাঙ্ময় রসরূপ দিয়েছেন সাধনার অঙ্গ হিসাবে। সুতরাং ধর্মবিবিক্ত রোমান্টিক কাব্যসৌন্দর্যের আকররূপে বৈষ্ণব পদাবলীর বিচার করতে গেলে তা হবে খণ্ডিত। তাছাড়া বৈষ্ণব পদাবলী গোষ্ঠীবদ্ধ কবিকলা—একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্ম ও দর্শনের কাব্যরূপ। কবিগণের হৃদয়ানুভূতি প্রকাশের কোন সুযোগও এখানে নেই। রাধাকৃষ্ণের লীলা দর্শন ও চিত্রণ করতে হোত শুক অথবা সখী ভাবে। কিন্তু রোমান্টিক প্রেমকবিতা ব্যক্তিগত কামনা-বাসনার রসরূপায়ণ। তৃতীয়ত, রোমান্টিক প্রেমকবিতা দেহকেন্দ্রিক। দেহের রহস্যে বাঁধা যে অদ্ভুত জীবন কবিকে উদ্দীপ্ত করে, রোমান্টিক কবি নানা চিত্রকল্পের সাহায্যে তাকেই চিত্রিত করেন। মর্ত-প্রেমচেতনা এখানে বড় কথা। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীর ক্ষেত্র স্বতন্ত্র। বৈষ্ণবতত্ত্বে, রাধাকৃষ্ণ অপ্রাকৃত, চিন্ময়—লৌকিক জীবনপাত্রে তাঁদের লীলাবিলাস চিত্রিত হলেও অলৌকিক রহস্যরাজ্যের দিকেই তা ইঙ্গিত করে। সুতরাং রাধাকৃষ্ণলীলাকে মর্ত প্রেমিক-প্রেমিকার মানদণ্ডে বিচার করা চলে না। চতুর্থত, রোমান্টিক প্রেমকবিতায় কল্পনার যে বিপুল ঐশ্বর্যের সমারোহ দেখানো সম্ভব, বৈষ্ণব কবিতায় তা নয়। কারণ বৈষ্ণব মহাজন কবির লেখনীতে গোড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্বকথাকে কাব্যে প্রকাশ করতে হোত। বিভিন্ন কবি একই বক্তব্যকে একই উপমা ইত্যাদির সাহায্যে প্রকাশ করেছেন। অনুকৃতির তাই এত ছড়াছড়ি। মর্তজীবনবাসনার উষ্ণতা উপজীব্য হিসাবে এ কবিতায় লক্ষ্য করা যায় না। তাই নানা দিক থেকে বৈষ্ণব কবিতাকে নিছক রোমান্টিক কবিতা হিসাবে অভিহিত করতে আমাদের আপত্তি আছে।

তবে অপ্রাকৃত, চিন্ময় রাধাকৃষ্ণলীলাকে মহাজন কবি জীবনানুগ করে চিত্রিত করেছেন।

ব্রজলীলার অলৌকিক রহস্য মর্ত্যপ্রেমের আঙ্গিক ও ভাষাতে তাঁরা প্রকাশ করেছেন, বোধ হয় অন্য প্রকাশ-পথের সন্ধান পান নি বলেই। মানবজীবনরসের পানপাত্রে বৈষ্ণব মহাজন কবি সেই অতীন্দ্রিয়, লোকাতীত প্রেমকে পরিবেশন করেছেন সত্য। লৌকিক সৌন্দর্যের পথ বেয়ে বৈষ্ণব পদাবলী অলৌকিকের রাজ্যে নিয়ে গেলেও লৌকিক সৌন্দর্যচিত্রও আমাদের মুগ্ধ করে। তাই অন্তরে তত্ত্বকথা থাকলেও বাইরের রূপবৈচিত্র্য আমাদের আকৃষ্ট করে। শ্রদ্ধেয় সমালোচক তাই বলেন—

"বৈষ্ণব পদাবলীর পশ্চাদ্‌পটে যদি সদাসর্বদা নিত্য বৃন্দাবনের কিশোর-কিশোরীর অখণ্ডসত্তা বিরাজ করিতেছে, তবুও নিসর্গ সৌন্দর্য, রাধাকৃষ্ণের নিবিড় মিলন-রস এবং তীব্র বিরহবেদনা ক্ষণেকের জন্যও ভাববৃন্দাবনকে মর্ত্যধূলিতলে টানিয়া আনে।' (ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)।

ভাবের গভীরতা, আন্তরিকতা, মন্ময়তা ও মর্ম-স্পর্শিতার বৈশিষ্ট্যে বৈষ্ণব কবিতা অনবদ্য। কল্পনার সুউচ্চ মহিমার সাহায্যে বৈষ্ণব কবি রাধাকৃষ্ণলীলার ভাবটি রঙ্গে ও রসে মণ্ডিত করে তুলেছেন। তবু তত্ত্বভাবনার কথা মনে রাখলে বৈষ্ণব কবিতাকে রোমান্টিক বলা যুক্তিসহ হয় না। কারণ ধর্মতত্ত্বের উপস্থাপনা কাব্যরস স্ফুরণের পক্ষে ব্যত্যয় হয়ে পড়ে। বিদগ্ধ সমালোচক বলেন—

"বৈষ্ণবপদকর্তারা প্রধানতঃ কাব্য-রচনার জন্য পদাবলী রচনা করেন নাই ; সেগুলি তাঁহাদিগের বৈষ্ণব-ধর্মের প্রধান অঙ্গ ব্রজ-লীলা-ধ্যানের আনুষঙ্গিক ফল ও উহার সহায় মাত্র।" (পদকল্পতরু। ৫ম)।

কিন্তু বৈষ্ণবতত্ত্ব প্রকাশে আমাদের বৈষ্ণব কবি যে পথ বেছে নিয়েছেন, নিঃসন্দেহে তাতে রোমান্টিকতা প্রকাশের অবকাশ আছে। "বৈষ্ণব কবিতা নানারূপ পার্থিব সৌন্দর্যের পথ বাহিয়া চলিয়াছে -- কিন্তু তাহার পরম লক্ষ্য সেই অজ্ঞেয় দুরধিগম্য মহাসত্য।" সেই অজ্ঞেয়, দুরধিগম্য পরম সত্যের রূপায়নচেষ্টায় জাগ্রত হয়েছে কবি-কল্পনার সমধিক ঐশ্বর্য, বিস্ময়বোধ, না পাওয়ার বেদনা ও নৈরাশ্যবোধ।

সুতরাং তত্ত্বদৃষ্টিতে বৈষ্ণব কবিতাকে রোমান্টিক বলা না গেলেও রোমান্টিক চেতনার স্ফূর্তি শত কলাপের মত বিকশিত হয়েছে বৈষ্ণব কবিতার ছত্রে ছত্রে। রোমান্টিক প্রেম-কবিতার নিরিখে তার আস্বাদন-সাফল্য তাই দুর্লভ নয়।

লীলাশুক ও বৈষ্ণব কবিতা

বৈষ্ণব কবিতা পাঠের সময় পাঠক লক্ষ্য করেন, এর ভণিতাংশ। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা কাব্য-কবিতায় কবিগণ ভণিতা ব্যবহার করতেন। বৈষ্ণবপদের ক্ষেত্রে এই ভণিতা কিন্তু বিশেষ অর্থবহ। নিছক নাম প্রচারের জন্য বৈষ্ণব কবি ভণিতা ব্যবহার করেন নি। তাঁদের এই ভণিতা অংশে একটি বিশিষ্ট তত্ত্ব ফুটে উঠেছে। প্রাক্‌চৈতন্য যুগে এই তত্ত্বটি হ'ল লীলাতত্ত্ব বা লীলাবাদ ; পরচৈতন্য যুগে হ'ল পরিকরবাদ। এ বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা যাক্।

প্রাক্‌চৈতন্য যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন গড়ে ওঠেনি, একথা সত্য। কিন্তু বাংলার বৈষ্ণব ভাবনায় তত্ত্বকথা কিছু স্থান পেয়েছিল, একথাও অবিসংবাদিতরূপে সত্য। দ্বাদশ শতকের কবি জয়দেব শুধু তাঁর কবিপ্রতিভার পরিচয় দিতেই 'গীতগোবিন্দ' লেখেন নি। তিনি নিজেই বলেছেন: যাঁরা হরির স্মরণে মন সরস করতে চান এবং বিলাসকলায় যাদের কৌতূহল আছে, তারাই কোমলকান্ত পদাবলী পাঠ করে আনন্দ পাবেন। যমুনাকূলে কেলিরত রাধাকৃষ্ণের লীলা চিত্রণ করেছেন জয়দেব। এই লীলাকীর্তন করার মধ্যেও একটু বৈশিষ্ট্য বর্তমান। "রাধাকৃষ্ণের যুগল হইতে নিজেকে একটু দূরে সরাইয়া রাখিয়া লীলাদর্শন, লীলা-আস্বাদন এবং লীলার জয়গান—ইহাই যেন ভক্তের প্রার্থিততম বস্তুরূপে দেখা দিয়াছে।" (ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত)

উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যটি দাক্ষিণাত্যের কবি বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' গ্রন্থে সার্থক-রূপে দেখা দিল। বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের উপাধি ছিল 'লীলাশুক'। এবং সেখান থেকেই 'বৈষ্ণব কবিগণ লীলাশুক'—কথাটি চলে আসছে। সাধক-কবিগণের লীলাশুকত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন: 'সাধক কবির পরিচয় হইল মধুর বৃন্দাবনলীলাকে অদূরের কদম্ববৃক্ষ হইতে দর্শন এবং আস্বাদন এবং শুকের ন্যায় মধুর কাব্যকাকলীতে তাহারই মাধুর্য বর্ণন।' উপকথা বর্ণিত শুকপক্ষী দূর থেকে বর্ণিত ঘটনা সব কিছুই লক্ষ্য করত, পরে অবিকল তার বর্ণনা দিত। বৈষ্ণব সাধক কবিগণের পক্ষেও এ কথা প্রযোজ্য। রাধাকৃষ্ণলীলায় তাঁরা অংশ গ্রহণ করেন নি, করার স্পৃহাও তাঁরা মনে পোষণ করতেন না। তাঁদের একমাত্র কামনা ছিল দূর থেকে রাধাকৃষ্ণলীলার দর্শন, তজ্জাত আনন্দময় অনুভূতির আস্বাদন এবং লীলা বর্ণন। লীলাশুকত্বের একটি দৃষ্টান্ত 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' থেকে উদ্ধৃত করা যাক:

অতঃপর রাধা সনে, আর গোপাঙ্গনা সনে,
করে কৃষ্ণলীলা সবিস্ময়।
সে শোভা দেখিয়া লীলা, শুক অতি সুখ পাইলা,
হর্ষভাবে শ্লোক উচ্চারয়।

কিংবা,

এইরূপ সখীবাণী, শুনিতেই সুনয়নী,
তারে পুছে উৎকণ্ঠিত হৈয়া।
লীলাশুক সেইভাবে, কহিতে লাগিলা তবে,
এক শ্লোক অপূর্ব করিয়া॥

এই লীলাদর্শনের উপলব্ধিজাত আবেগেই বিল্বমঙ্গল ঠাকুর অমৃতের সিন্ধু কৃষ্ণ-মাধুর্য বর্ণনা করতে গিয়ে শুধু আকুলি বিকুলি করেছেন, শুধু 'মধুর' 'মধুর'—এই কথা উচ্চারণ করেছেন—

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো-
মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্ ।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্ ॥

এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' গ্রন্থখানি মহাপ্রভুর খুব আদরের ধন ছিল। দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণকালে শ্রীচৈতন্যদেব এই গ্রন্থের সাক্ষাৎ পান এবং এর একখানি নকল আনেন। জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদের সঙ্গে এ গ্রন্থখানিতেও প্রভু নিত্য আনন্দ লাভ করতেন।

কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের প্রভাবে পর-চৈতন্য যুগে সাধকদের লীলারস আস্বাদনের ক্ষেত্রে একটু স্বাতন্ত্র্য দেখা দিল। এ সময় লীলারস আস্বাদনের ক্ষেত্রে পরিকরবাদের তাৎপর্য প্রবর্তিত হ'ল। সাধারণ ক্ষেত্রে ভক্তের মনোভাব, 'আমিত চাহি না রাধা হতে হব রাধার পরাণ পিয়া।' রাগানুগামার্গে সখী ও মঞ্জরী-ভাবে ভজনাই তাদের কাম্য হ'য়ে দেখা দিল। এর অর্থ—বৃন্দাবনের গোপীদের অনুগত হ'য়ে রাধাকৃষ্ণের সেবা। সেই সেবাবাসনা চরিতার্থ করার আনন্দেই ভক্তহৃদয় লীলারসমাধুর্য আস্বাদনের সুযোগ লাভ করেন। নরোত্তম দাসের পদে এই কামনা যথাযথ রূপলাভ করেছেন :

হরি হরি, হেন দিন হইবে আমার।
দুহুঁ-অঙ্গ পরশিব দুহুঁ-অঙ্গ নিরখিব
সেবন করিব দোহাঁকার ॥
ললিতা বিশাখা সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে
মালা গাঁথি দিব নানা ফুলে।
কনক সম্পুট করি কর্পূর তাম্বুল পূরি
যোগাইব অধর-যুগলে ॥

সুতরাং, চৈতন্যোত্তর যুগের সাধক-কবিগণ লীলা দর্শন, আস্বাদন ও বর্ণনার জন্য প্রাক্‌চৈতন্যোত্তর যুগের সাধক কবিগণের মত দূরত্ব বজায় রাখতে পারলেন না। লীলা-দর্শনের আকাঙ্ক্ষা তাঁদের ছিল, কিন্তু সেই লীলার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে নিয়েছিলেন তাঁরা—'দুই রূপ মনোহারী দেখিব নয়ন ভরি নীলাম্বরে দিব সাজাইয়া।' এই সব কবি সখীভাবে রাধাকে বা কৃষ্ণকে উপদেশ দিয়েছেন, তাঁদের মিলনে সহায়তা করেছেন, বিরহে সান্ত্বনা দিয়েছেন, আবার নিজেরাও আনন্দ-বেদনা অনুভব করেছেন। সুতরাং তাঁরাও সেই লীলার অংশভাগী হ'য়ে পড়লেন। অবশ্য শুক পক্ষীর মত দর্শন ও আস্বাদন স্পৃহাও তাঁরা চরিতার্থ করেছেন, তার বর্ণনাও করেছেন। কিন্তু স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

গোবিন্দদাস কহই ধনি অভিসার
সহচরী পাওল বোধ।

কিংবা, জ্ঞানদাস কহে কানুর পিরীতি
মরণ অধিক শেল।

অথবা, গোবিন্দদাস কহ কানু ভেল গদ্গদ
হেরইত রাই বয়ান ॥

এখানে গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস—সখী। সখী ভাবেই তাঁরা রাধাকে অভিসারে উপদেশ দিয়েছেন, কানুর মরণশেল পিরীতি নিজেরা অনুভব করেছেন এবং রাধাকৃষ্ণের মিলন-দৃশ্য নিরীক্ষণ করেছেন। ডাঃ দাশগুপ্ত বলেছেন: "দ্বাদশ শতকের লীলাশুক ও জয়দেবের কাব্যরচনার ভিতরেই আমরা স্বরূপ-লীলার প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাইলাম, এই স্বরূপ-লীলার প্রতিষ্ঠার উপরেই প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সকল সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব। ...লীলাকেও তাই তাঁহারা সত্য এবং নিত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। পরিকররূপে এই লীলা-স্মরণ ও লীলা আস্বাদন—ইহাই হইল গৌড়ীয় ভক্তগণের পরম সাধন ও সাধ্য...।" তাই পরচৈতন্য-যুগের বৈষ্ণবপদের ভণিতাংশে পরিকররূপে লীলারস আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষা প্রতীয়মান।

সুতরাং, পরচৈতন্যযুগের বৈষ্ণব ভক্ত-কবিদের আর লীলাশুকত্বের বৈশিষ্ট্য বজায় থাকল না। গোপীর অনুগত সাধনার অভিব্যক্তিরূপেই চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব পদাবলী বিশিষ্ট হ'য়ে উঠল।

ছন্দ

ছন্দ কবিতার বিভূতি। ছন্দোস্পন্দন কবিতার ভাবকে লীলায়িত করে, লাবণ্যের সুস্মিত প্রকাশ ঘটায়। কবির মনের মণিকোঠায় কোন ভাব যখন দানা বেঁধে ওঠে, তখন অকৃত্রিম সেই ভাবধারা প্রকাশিত হয় ধ্বনিরূপে। সেই ধ্বনিপ্রবাহ যতি, অর্ধযতি প্রভৃতির নিয়মাধীন হয়। গভীর ভাবের ক্ষেত্রে নিয়ম-বন্ধন স্বতঃস্ফূর্ত—সচেতন মনে অক্ষর-গণনার প্রয়োজন বোধ করেন না কবি। গুরুগম্ভীর বা তরল—ভাব যে প্রকার, ছন্দও হয় তার অনুযায়ী। ভাবোচ্ছ্বাসকে ছন্দের অনায়াস-বন্ধনে আবদ্ধ করাতেই কবিতার লাবণ্যময় রসমধুরতা সৃষ্টি সম্ভব। বৈষ্ণব কবিদের পদ এর ব্যতিক্রম নয়।

আধুনিক বিচারে, বৈষ্ণবপদাবলীতে তানপ্রধান বা পয়ার-জাতীয়, ধ্বনিপ্রধান বা মাত্রাবৃত্ত এবং স্বরমাত্রিক—এই তিন প্রকার ছন্দের উদাহরণই লক্ষ্য করা যায়। তবে মাত্রায় হ্রাস-বৃদ্ধিও বহুল পরিমাণে লক্ষিত হয়। কারণ পদগুলি রচিত হয়েছিল, কবিতা নয়, গান হিসাবে। আবৃত্তিকালে অনেক সময় মাত্রা বেশী বা কম হয়; কিন্তু সুরের তান-লয় বিস্তারে তা থাকে না। এবারে কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক্।

তানপ্রধান: (ক) ৮+৬ মাত্রার:

মন মোর আর নাহি | লাগে গৃহ কাজে।
নিশি দিশি কাঁদি তবু | হাসি লোক মাঝে ॥

কালার লাগিয়া হাম | হব বনবাসী।
কালা নিল জাতি কুল | প্রাণ নিল বাঁশী॥

(খ) লঘু ত্রিপদী (৬+৬+৮):

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
অবনী বহিয়া যায়।
ঈষত হাসির তরঙ্গ হিল্লোলে
মদন মূরুছা পায়॥

(গ) দীর্ঘ ত্রিপদী (৮+৮+১০):

চূড়াটি বান্ধিয়া উচ্চ কে দিল ময়ূর পুচ্ছ
ভালে সে রমণী মনোলোভা।
আকাশ চাহিতে কেবা ইন্দ্রের ধনুকখানি
নব মেঘে করিয়াছে শোভা॥

বৈষ্ণবপদে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের সমারোহ লক্ষণীয়। ব্রজবুলি ভাষা অবলম্বনে এই ছন্দ রাজকীয় ঐশ্বর্যরূপ লাভ করেছে। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে যৌগিক অক্ষর ও স্বর সাধারণত দুই মাত্রা, মৌলিক স্বর একমাত্রার। বৈষ্ণব পদে এই রীতি বর্তমান। তবে সুরতালের প্রযোজনে মাত্রার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটানো হয়েছে অনেক ক্ষেত্রেই। তাছাড়া মাত্রাবৃত্ত ছন্দে যে ধ্বনিমাধুর্য ফুটিয়ে তোলা সম্ভব, তার ফলে কীর্তনের রসঘন রূপটি সহজেই জমাট বাঁধতে পারে। উদাহরণ—

(ক) ১৬ (৮+৮) মাত্রা:

২ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ২
মন্দির বাহির | কঠিন কপাট
চলইতে শঙ্কিল | পঙ্কিল বাট॥
তঁহি অতি দূরতর | বাদর দোল।
বারি কি বারই | নীল নিচোল॥

(খ) ২৫ মাত্রা (৭+৭+১১):

১১ ১ ১ ১১১ ২ ১ ২ ১১
গগনে অবঘন | | মেহ দারুণ
১১১ ২ ১ ১ ১১১১
সঘন দামিনী চমকই।
কুলিশ পাতন শবদ ঝনঝন
পবন খরতর বলগই॥

(গ) ২৮ মাত্রা (৮+৮+১২) :

২ ১১ ১১ ২ ১ ১১১ ২ ১ ১
নীরদ নয়নে | নীর ঘন সিঞ্চনে।
১১১ ১১১ ১১২২
পুলক মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ মকরন্দ | বিন্দু বিন্দু চুয়ত।
বিকশিত ভাব কদম্ব ॥

(ঘ) ৩৪ মাত্রা (১০+১০+১৪)—পাঁচ মাত্রার চাল :

২১১ ১ ২ ১ ২ ১১ ১ ১ ১ ২১ ২
তুঙ্গমণি মন্দিরে | ঘন বিজুরি সঞ্চরে।
২ ১ ১ ১ ১১১ ১ ১২ ২
মেঘ রুচি বসন পরিধানা।

(ঙ) ৪৭ মাত্রা (১২+১২+১২+১১) :

মঞ্জু বিকচ কুসুম পুঞ্জ
মধুপ শব্দ গঞ্জি গুঞ্জ
কুঞ্জর গতি গঞ্জি গমন
মঞ্জুলকুলনারী।

স্বরঘাতপ্রধান ছন্দটি ধামালি ছন্দ নামে পরিচিত। এর লয় দ্রুত। কোন গুরুগম্ভীর ভাব এ ছন্দে প্রকাশ করা যায় না। তাছাড়া লঘুগুরু ভেদে সব অক্ষরই এতে একমাত্রিক। এক দল (syllable) একমাত্রা—এই ছন্দের হিসাবে। বৈষ্ণবপদকর্তা লোচন দাস এই ধামালি ছন্দের প্রবর্তন করেন। এতে প্রতি চরণে চারটি পর্ব, প্রতি পর্ব চার মাত্রার, শেষ পর্বটি অপূর্ণপদী :

চাইলে নয়ন | বাঁধা রবে | মন চোরা তার | রূপ।
হাস্যবয়ান রাঙা নয়ান এই না রসের কূপ ॥
চাইলে মেনে মরবি ক্ষেপে কুল সে রবে নাই।
কুলশীল সে রাখবি যদি থাকনা বিরল ঠাই ॥

অলঙ্কার

কাব্যের আত্মা কি—এ নিয়ে আবহমানকাল ধরে বিতর্ক চললেও একথা ঠিক যে, রসের মানদণ্ডেই কাব্যের কাব্যত্ব। রসাত্মক বাক্যই কাব্য। ধ্বনি কাব্যের প্রাণ, রস আত্মা এবং অলঙ্কার কাব্যের ভূষণ। অলম্ শব্দের এক অর্থ ভূষণ। যার দ্বারা ভূষিত বা সজ্জিত করা যায়, তা-ই অলঙ্কার। যত সৌন্দর্য আছে এবং যা সৌন্দর্যের দ্যোতক—তাই অলঙ্কার। কাব্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য কবি অলঙ্কারের আশ্রয় নেন। কবি প্রতিভার

যাদুদণ্ড বলে শব্দ ও অর্থে সৌন্দর্য সন্নিবিষ্ট করে তাদের সৌন্দর্যব্যঞ্জক করে তুলতে পারেন। এ কারণে সাহিত্যের সংজ্ঞা নির্দিষ্ট হয়েছিল—'কাব্যম্ গ্রাহ্যম অলঙ্কারাৎ'।

তবে কাব্যের অলঙ্কার বলতে সাধারণ অর্থে সৌন্দর্য বোঝালেও, বিশেষ অর্থে অনুপ্রাস-উপমা-উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি বিশেষ লক্ষণকে বোঝায়। কবি কর্ণপুরের মতে, কাব্যের অলঙ্কার বা ভূষণ হচ্ছে—উপমাদি প্রমুখ অলঙ্কারসমূহ। আচার্য বামও বলেছেন—'অলঙ্কৃতিঃ অলঙ্কারঃ। করণব্যুৎপত্ত্যা পুনঃ অলঙ্কারশব্দোঽয়ম্ উপমাদিষু বর্ততে'—অর্থাৎ অলঙ্কৃতিই অলঙ্কার। করণ-ব্যুৎপত্তির দ্বারা এই অলঙ্কারশব্দ দ্বারা উপমা প্রভৃতিকেই বোঝায়।

বৈষ্ণব পদাবলীতে অলঙ্কারের প্রাচুর্য লক্ষণীয়। রসের মানদণ্ডে বৈষ্ণবপদাবলী শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের অঙ্গীভূত। অলঙ্কারের সার্থক প্রয়োগে কাব্যরস যেন আরো অধিক আক্ষিপ্ত হয়েছে। রসাভিব্যক্তির জন্য কবিগণ যেসব অলঙ্কার ব্যবহার করেছেন, তা কাব্যের বহিরঙ্গ ব্যাপার হ'য়ে থাকে নি। 'রসাদীন্ উপকুর্বন্তেলঙ্কারাস্তেঽঙ্গদাদিবৎ'—রসাদির পুষ্টিসাধন করে অলঙ্কার অঙ্গদাদি-ভূষণের ন্যায় কাজ করে'—বিশ্বনাথের এই উক্তি বৈষ্ণব-পদে সর্বথা সার্থকতা লাভ করেছে। কাব্যে শব্দ যখন সৌন্দর্যের পটভূমিকা হয়, তখন হয় শব্দালঙ্কার, আর সৌন্দর্যের পটভূমিকা যখন হয় অর্থ, তখন অর্থালঙ্কার। এদের আবার বিভিন্ন উপবিভাগ আছে। কয়েকটি উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করলে বৈষ্ণব-পদের রস-সৃজনে অলঙ্কারের অবদান যে যথেষ্ট, তা স্পষ্ট বোঝা যাবে।

'কান্ত কাতর কতহুঁ কাকুতি করত কামিনী পায়।'—অনুপ্রাস। ক, ত-এর অনুপ্রাসের ঝঙ্কারে হৃদয়ের আকুতি ও বেদনা উচ্চকিত হয়ে উঠেছে।

'নন্দনন্দন চন্দচন্দনগন্ধনিন্দিত অঙ্গ'—এটিও অনুপ্রাসের উদাহরণ। নন্দ ও নন্দনের রূপমাধুরী হৃদয় সরোবরে যে তুফান তুলেছে, ন্দ, নন্দ, চন্দ-এর অনুপ্রাসের দ্বারা সে উল্লাস ও আবেগ আরো রসায়িত হয়েছে।

কানুর পীরিতি চন্দনের রীতি অধিক সৌরভময়—পূর্ণোপমা। চন্দন যতই ঘষা যাক, তার সৌরভ আরো বেড়ে যায়। কানুর পীরিতিও তাই। এর মাধুর্য ক্রমাগতই বেড়ে চলে।

'তড়িত বরণী হরিণ নয়নী দেখিনু আঙিনা মাঝে'—লুপ্তোপমা। উপমেয় রাধা এখানে অনুপস্থিত। রাধার গাত্রবরণ বিদ্যুতের ন্যায়, নয়ন হরিণের নয়নের ন্যায় চকিত চঞ্চল। উপমার এক আঁচরে রাধার অপার সৌন্দর্যরাশি যেন সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

'কণ্টকগাড়ি কমলসমপদতল মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি'—লুপ্তোপমা। সাধারণ ধর্ম লুপ্ত।

'রূপের পাথরে আঁখি ডুবি সে রহিল। যৌবনবনে মন হারাইয়া গেল॥'—রূপক অলঙ্কার। রূপের সঙ্গে পাথারের, যৌবনের সঙ্গে বনের অভেদ কল্পনা করা হয়েছে। পাথার অতল, সহজে তার তলদেশের নাগাল পাওয়া যায় না। তেমনি যমুনাপুলিনে দৃষ্ট কৃষ্ণের অগাধ রূপরাশিতে রাধা নিমগ্ন হয়ে গেছেন, থই পাচ্ছেন না অর্থাৎ কিছুতে বিস্মৃত হতে পারছেন না সেই অতুলনীয় রূপরাশি। আবার গহীন বনে প্রবেশ করলে যেমন

বাইরে আসার পথ হারিয়ে ফেলে পথিক, তেমনি কৃষ্ণের যৌবনরূপ বনে রাধাও তাঁর মন হারিয়ে ফেলেছেন, এখন শুধু আকুলি-বিকুলি করছেন।

কুল মরিযাদ- কপাট উদঘাটলু

তাহে কি কাঠকি বাধা। —রূপক অলঙ্কার। কুল-মর্যাদার সঙ্গে কপাটের তুলনা করা হয়েছে। সখিগণ উৎলা রাধাকে বলছেন, মন্দির-বাহিরে কঠিন কপাট, তাছাড়া পথেও নানা বাধা-বিপত্তি, এসময়ে তাঁর অভিসারে যাওয়া উচিত নয়। তার উত্তরে রাধা বলছেন, কুলমর্যাদারূপ কপাট যে ভাঙতে পেরেছে, অর্থাৎ অন্তরের সঙ্কোচ ও সামাজিক মর্যাদাবোধ যে ত্যাগ করতে পেরেছে, শয়ন মন্দিরের কপাটের বাধা তার কাছে কিছুই নয়। এর দ্বারা কৃষ্ণের প্রতি রাধার প্রেমের গুরুত্ব, গাঢ়ত্ব ও আকর্ষণের তীব্রতা সূচিত হচ্ছে।

শীতের ওড়ণী পিয়া গিরীষের বা।

বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না॥ —মালারূপক। কৃষ্ণ রাধার সর্বস্ব, এ কথা বুঝাতে মালারূপকের সাহায্যে কবিকল্পনা সমধিক সার্থক হয়েছে।

চঞ্চললোচনে বঙ্ক নেহারণি অঞ্জনশোভন তায়।

জনু ইন্দীবর পবনে ঠেলল অলিভরে উলটায়॥ — বাচ্যোৎপ্রেক্ষা। উপমেয়—অঞ্জন, লোচন, বঙ্কনেহারণিকে যথাক্রমে উপমান—অলি, ইন্দীবর, উলটায়—এর সঙ্গে অভেদ বলে সংশয় জন্মানোয় কবিকল্পনার চমৎকারিত্ব সৃষ্টি হয়েছে। জনু সংশয়-বাচক শব্দ।

কি পেখলু নটবর গৌরকিশোর।

অভিনব হেম- কলপতরু সঞ্চরু

সুরধনী-তীরে উজোর॥—প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা। সংশয়বাচক শব্দ অনুপস্থিত।

এলাইয়া বেণী ফুলের গাথনি

দেখয়ে খসায়ে চুলি।

হসিত বয়ানে চাহে মেঘ পানে

কি কহে দুহাত তুলি॥

ভ্রান্তিমান্ অলঙ্কার। প্রবল সাদৃশ্যবশত উপমেয় কৃষ্ণকে উপমান চুল ও মেঘ বলে ভ্রম হচ্ছে রাধিকার।

'রাই রাই করি সঘনে জপয়ে হরি তুয়া ভাবে তরু দেই কোর'—এটিও ভ্রান্তিমান্। এখানে কৃষ্ণ রাধাভ্রমে তরুকে আলিঙ্গন করেছেন। উপরের দুটি উদাহরণের একটিতে রাধার, অন্যটিতে কৃষ্ণের প্রেমতন্ময়তার সুন্দর উদাহরণ।

দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।

তিল আধ না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥

—বিরোধাভাস। আপাতদৃষ্টিতে এ উক্তি পরস্পরবিরোধী। কারণ মিলনের মুহূর্তে

আবার বিচ্ছেদ ভেবে কান্না কেন ? কিন্তু গূঢ়ার্থে ও তাৎপর্যে এ বিরোধের অবসান হয়। এ বিচ্ছেদবেদনার আভাস প্রেমবৈচিত্ত্যের কারণে।

রসের সায়রে আমারে ডুবায়ে অমর করহ তুমি—বিরোধাভাস। রাধার প্রেমরসে ডুবে কৃষ্ণ আনন্দের ঘনীভূত মাধুর্য লাভ করতে চান। কান্তাশিরোমণি রাধার সাহচর্যে কৃষ্ণ যে আনন্দ পান, অন্যত্র তা লভ্য নয়।

'সবে বলে মোরে কানু কলঙ্কিনী গরবে ভরিল দে'—বিরোধাভাস। সাধারণ ভাবে রাধা কলঙ্কিনী, কারণ তিনি পরপুরুষ কৃষ্ণের প্রতি আসক্তা হয়েছেন। এর দ্বারা কৃষ্ণের প্রতি তাঁর আত্যন্তিক আসক্তিই দ্যোতিত হচ্ছে—যা রাধার পক্ষে গর্বের বস্তু।

'বদন থাকিতে না পারে বলিতে তেঁঞি সে আবালা নাম'—বিভাবনা। প্রসিদ্ধ কারণ ছাড়াই এখানে কার্যের উৎপত্তি।

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল॥

—বিষম অলঙ্কার। কার্য থেকে আশানুরূপ ফললাভ হয় নি। আক্ষেপানুরাগের এই পদটি আক্ষেপজনিত বেদনার অভিঘাতে রাধাপ্রেমের গভীরত্বই ধ্বনিত হচ্ছে।

চিকুরে গরএ জলধারা—
মুখশশী ভয়ে কিয়ে কাঁদে আঁধিয়ারা ?

—সন্দেহ অলঙ্কার। উপমেয় ও উপমান দুটিতেই সংশয়ের ফলে কবিকল্পনার চমৎকারিত্ব সৃষ্ট হয়েছে।

পদনখ হৃদয়ে তোহারি।
অন্তর জ্বলত হামারি॥—অসঙ্গতি। কার্য ও কারণ ভিন্ন আশ্রয়ে বর্তমান। এর দ্বারা হৃদয়ানুরাগের তীব্রতা প্রকাশিত।

নিরুপম হেম জিনি উজোর গোরা তনু
অবনী ঘন পড়ি যায়। —ব্যতিরেক। উপমেয়-গোরাতনু, উপমান-নিরুপম হেম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলে বর্ণিত। নিরুপমহেম, তার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গোরাতনু, অতএব গোরাতনুর লাবণ্য ও সৌন্দর্য অনুমেয়।

'চম্পকশোন— কুসুম কনকাচল
জিতলে গৌরতনু লাবণিরে।' —এটিও ব্যতিরেক অলঙ্কার। উপমেয় গৌরতনু, উপমান—চম্পক, শোন, কনকাচল।

কতহুঁ মদন তনু দহসি হামারি।
হাম নহুঁ শঙ্কর, হো বর নারী॥—নিশ্চয় অলঙ্কার। উপমান 'শঙ্কর'কে নিষিদ্ধ করে উপমেয় 'বরনারী'র প্রতিষ্ঠা। মদন-দহনে-অস্থির রাধার হৃদয়বেদনা প্রকাশিত।

রন্ধনশালায় যাই তুয়া বঁধু গুণ গাই।

ধোঁয়ার ছলনা করি কাঁদি ॥ —অপহ্নুতি। 'ছলে' শব্দের দ্বারা উপমেয় 'ধোঁয়াকে' অস্বীকার করে উপমান 'কান্না'র প্রতিষ্ঠা।

অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব কি করব বারিদ মেহে।

ই নব যৌবন বিরহে গমায়ব কি করব সো পিয়া লেহে ॥

—দৃষ্টান্ত অলঙ্কার। তপন তাপে অঙ্কুর শুকিয়ে যাওয়া এবং নবযৌবন বিফলে গোঁয়ানো—এদের ধর্ম বিভিন্ন. কিন্তু তাৎপর্য বুঝতে পারলে সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

গীতিকবিতা

বৈষ্ণব পদাবলী গীতিকবিতা কিনা, এ নিয়ে বিতর্কের অবকাশ থাকলেও এর গীতি-ধর্ম বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। বাঙ্গালী মানসে যে গীতি-প্রবণতার সুর চর্যাপদের যুগ থেকে আরম্ভ করে সাহিত্যধারায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে প্রবাহিত হয়ে আসছিল, বৈষ্ণব পদাবলীতে তা উত্তাল কলরোলে পরিণত হয়। বৈষ্ণব পদাবলীর গীতিকাব্যিক লক্ষণ বিচারের পূর্বে গীতিকবিতার স্বরূপ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়োজন আছে।

লিরিক বা গীতকবিতার উদ্ভব গেয়-কবিতা হিসাবে। প্রাচীনকালে 'Lyre' নামে এক প্রকার বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে গীত কবিতাকে গীতিকবিতা বলা হ'ত। 'Lyric Poetry, in the original meaning of the term, was poetry composed to be sun' to the accompaniment of lyre or harp' সেই হিসাবে প্রাচীন ব্যালাড, এমন কি মহাকাব্যকেও, গীতিকবিতা বলা যায়। এই নিরিখে বৈষ্ণবকবিতা অবশ্যই গীতিকবিতা। কারণ, মূলত গান হিসাবেই এই কবিতার জন্ম হয়েছিল। সুনির্দিষ্ট রাগরাগিণীর সাহায্যে গীত বৈষ্ণবপদের আবেদন ও ব্যঞ্জনা শ্রোতাকে এক রহস্যময়তার আবেশভরা মাধুর্যের জগতে নিয়ে যায়। প্রত্যেকটি বৈষ্ণবপদের প্রারম্ভে গান্ধার, বরাড়ী, ধানশী, ভৈরবী, বসন্ত—প্রভৃতি রাগরাগিণীর উল্লেখ এর গেয়ধর্মের ইঙ্গিত-ই বহন করে।

কিন্তু আধুনিক গীতিকাব্যের বৈশিষ্ট্য একেবারে স্বতন্ত্র। এখনকার গীতিকবিতার সঙ্গে গানের কোন সম্পর্ক নেই। আসলে গীতিকবিতা এমন এক বিশেষ ধরনের রচনা, যাতে 'the poet is principally occupied with himself'. কবির ব্যক্তিমনের নিবিড় অনুভূতি যখন ছন্দায়িত প্রকাশের মাধ্যমে বিশ্বমনের হয়ে ওঠে, তখন-ই হয় গীতিকবিতা। কাব্যিক বলতে—ভাবাবেগ ও কল্পনাকে বুঝায় (By poetical we understand the emotional and imaginative')। গীতিকবিতা ও গেয়-কবিতার পার্থক্য বঙ্কিমচন্দ্র অতি সুন্দর ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন:

"গীত হওয়াই গীতিকাব্যের আদিম উদ্দেশ্য; কিন্তু যখন দেখা গেল যে, গীত না হইলেও কেবল ছন্দোবিশিষ্ট রচনাই আনন্দদায়ক এবং সম্পূর্ণ চিত্তভাব-ব্যঞ্জক, তখন গীতোদ্দেশ্য দূরে রহিল, অ-গেয় গীতিকাব্য রচিত হইতে লাগিল।

অতএব গীতের যে উদ্দেশ্য, যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্য, তাহাই গীতিকাব্য। বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতা মাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য।" গীতকবিতা 'চিত্তভাবব্যঞ্জক'—অর্থাৎ কবির মনে সুখদুঃখের তরঙ্গ-বিক্ষোভের বাঙ্ময় রস-রূপায়ণ। এ-কথাই পাশ্চাত্য সমালোচক বলেন ভিন্ন ভাষায়—'for a lyric, to be good of its kind, must satisfy us that it embodies a worth feeling, it must impress us by the convincing sincerity of its utterence, while its language and imagery must be characterised not only by beauty and vividness, but also by propriety, or the harmony which in all art is required between the subject and its medium' গীতিকবিতায় একটি মাত্র ভাবের গাঢ়বদ্ধ প্রকাশ হয় অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরে। কারণ ভাবের অতিবিস্তার ঘটালে তার সংহতি, গাঢ়ত্ব ও ব্যঞ্জনা অনেক পরিমাণে শিথিল হয়ে পড়ে। কোন তত্ত্বকথা নয়, গভীর আবেগের সংযত প্রকাশেই গীতি-কবিতার সাথকতা। গীতিকবি হৃদয় থেকে হৃদয়ে তাঁর বক্তব্যকে সঞ্চার করেন—এই যে হৃদয়ের সুরে গান গেয়ে ওঠা, তাতে ব্যক্তিক মনের অনুভূতিতেও সর্বকালের, সর্বদেশের মানুষের মনের কথা প্রতিধ্বনিত হয় (' they embody what is typically human rather than what is merely individual and particular and that thus every reader finds in them the expression of experiences and feelings in which he himself is fully able to share'

আধুনিক গীতিকবিতা গান না হলেও সঙ্গীতধর্মিতা এর অন্যতম গুণ। 'লিরিকের একটা মস্ত গুণ এই যে, সম্পদে বিপদে সুখে দুঃখে তা মনে মনে গুণগুণিযে কিংবা মুখে মুখে আউড়িয়ে অনেক সান্ত্বনা পাওয়া যায়। আর সেই সঙ্গে এই মর্তলোকেই এক স্বর্গলোক রচনা করে দুদণ্ড পার্থিব ব্যাপারের হাত এড়ানো যায়।" (বাংলা লিরিকের গোড়ার কথা / পৃঃ ৯)

লিরিকের উদ্দেশ্য—চিত্তে আনন্দরসের সঞ্চার। নিছক কোনও তত্ত্বকথা নয়, ব্যক্তি-হৃদয়ের অনুভূতির নিবিড় ও গভীর ভাবরসের সোনার কাঠির ছোঁয়াচে পাঠকের মনে যে বোধের উদ্বোধন হয়, তা আনন্দের। নিবিড় রসোপলব্ধির দ্বারাই এই আনন্দের আস্বাদন সম্ভব। গবেষকের ভাষায়—"কিন্তু তত্ত্বকথা শোনানো বা কোনো কিছু প্রতিপন্ন করতে যাওয়া লিরিকের কাজ নয়। তার কাজ হচ্ছে নিছক আনন্দ প্রকাশ করা, আর সেই আনন্দের ধ্বনির দ্বারা অপরের মনের ভিতর আনন্দ জাগিয়ে তোলা।" (ঐ, পৃঃ ৭)। এজন্যই গীতিকবিতায় আত্মভাবলীন মন্ময়তার প্রাধান্য।

বৈষ্ণব কবিতায় গীতিকবিতার সৌরভ, মূর্চ্ছনা ও মাধুর্য স্পষ্টই অনুভব করা যায়। বিশেষ করে প্রাক্-চৈতন্যযুগের কবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদে গোষ্ঠীগত ভাবনা প্রধান না হয়ে ওঠায় সেখানে অনেক ক্ষেত্রেই কবিমানসের নিবিড় ভাবানুভূতির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। এমনকি পর-চৈতন্যযুগের কবিরাও অলৌকিক রাধাকৃষ্ণপ্রেমকে মর্তজীবনপাত্রে

পরিবেশন করায় তাতে মানবজীবনোক্ততা অননুভূত থাকে না। বৈষ্ণব পদকর্তা যখন রাধার কণ্ঠে গেয়ে ওঠেন—"এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর। এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর"—তখন নিখিল বিরহী-হৃদয়ের নিদারুণ মর্মবেদনা দিক-দিগন্তর পরিপ্লাবিত করে তুলে। সেই শূন্যতার বেদনার উপলব্ধি ভাববৃন্দাবন অপেক্ষা মর্তজীবনবেদনাকেই মনে করিয়ে দেয়। রাধাকে তখন মনে হয়—নিখিল বিরহী হৃদয়ের প্রতীক। তাছাড়া বৈষ্ণবকবিতা গেয়কবিতা হিসাবে সার্থক, একথা ঠিক। এর সংগীতমাধুর্যকে অস্বীকার করা যায় না। পাঠ্য গীতিকবিতার রসমূল্যেও বৈষ্ণব পদাবলী সার্থক এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বৈষ্ণব-পদাবলীর এই সর্বজনীন আবেদনের দিকটি সমালোচক সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন :

"বৈষ্ণব পদাবলীর রস গ্রহণ করিতে গেলে আমাদের বৈষ্ণবভাবাপন্ন হইবার আবশ্যক নাই, কৃষ্ণকে অবতার বা অবতারী মানিবার প্রয়োজন নাই, এমন কি নাস্তিক হইলেও দোষ নাই। মানুষের হৃদয়ের যে প্রবৃত্তি মৌলিক সেই ভালো লাগাকে চিরন্তন করিয়া ভালোবাসিবার ঈপ্সা বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেরণার উৎস।" (ডঃ সুকুমার সেন)।

"বৈষ্ণব পদাবলী সর্বাংশে উৎকৃষ্ট গীতি-কাব্যের লক্ষণাক্রান্ত"-৺সতীশচন্দ্র রায়ের মন্তব্য। বঙ্কিমচন্দ্রও উৎকৃষ্ট গীতিকবিতা হিসাবে বৈষ্ণবকবিতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। মানবজীবনের সুখ-দুঃখ-মিলন-বিরহের শাশ্বত বাণী-চিত্র হিসাবে বৈষ্ণব পদাবলী চিরন্তন রস ও ভাবমূল্য বহন করে।

তবু তত্ত্বতঃ বৈষ্ণব পদাবলীকে পুরোপুরি গীতিকবিতা বলতে আমাদের আপত্তি আছে। বৈষ্ণব পদাবলী বৈষ্ণবতত্ত্বের রসভাষ্য। বৈষ্ণবপদকর্তারা রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার তত্ত্বরূপকে কাব্যাকারে প্রকাশ করেছেন। অপ্রাকৃত রাধাপ্রেমকে তাঁরা প্রাকৃত ভাষায় প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন—অন্য কোন উপায় ছিল না বলেই। তত্ত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তি নিছক লৌকিক প্রেমকবিতা হিসাবে বৈষ্ণব পদাবলী আস্বাদন করে আনন্দ পাবেন, একথা হয়তো ঠিক। কিন্তু তত্ত্বের সঙ্গতিসূত্রে পদাবলী আস্বাদনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনেক বেশী। গীতিকবিতায় কবিমনের বিশেষ অনুভূতির প্রকাশ ঘটে। সেদিক থেকেও বৈষ্ণব পদাবলীকে গীতিকবিতা বলা চলে না। কারণ এতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসতত্ত্ব কাব্যাকারে প্রকাশিত হয়েছে। কবিদের ব্যক্তিমনের উপলব্ধি প্রকাশের সুযোগ এখানে আদৌ ছিল না। সম্প্রদায়ের অনুগত এইসব ভক্তকবি একান্তভাবেই রাধাকৃষ্ণের চরণে নিবেদিত-প্রাণ; তাঁদের যা-কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষা—সবই মঞ্জরীভাবের সাধনায়; নিজের প্রাণের ভাব নিজের ভাষায় প্রকাশের সুযোগ তাঁদের ছিল না। কিন্তু গীতিকবিতা ভাব ও প্রকাশভঙ্গীর দিক থেকে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। গীতিকবির ভাব একান্তভাবেই তাঁর নিজের, প্রকাশভঙ্গীও তাই। এ ছাড়া পাঠ্য হিসাবেও সব বৈষ্ণবপদ-ই উৎকৃষ্ট নয়। গেয় হিসাবে বৈষ্ণব পদাবলী রচিত। অজস্র বৈষ্ণব কবি পদ রচনা করেছিলেন—তাঁদের সকলেই প্রথম শ্রেণীর কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন না—ফলে তত্ত্বের বাক্য অনেক ক্ষেত্রেই রসাত্মক কাব্য হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া গানের জন্য রচিত বলে অনেক ক্ষেত্রে—বিশেষ

করে, ব্রজবুলিতে লিখিত পদসমূহে—ছন্দের মাত্রায় হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটানো হয়েছে, যা সুরের বিস্তারের মাঝে খাপ খেয়ে যায়, কিন্তু সাধারণভাবে পড়তে গেলে পাঠকের পক্ষে বিশেষ অসুবিধার কারণ ঘটে। "কিন্তু গায়কের কণ্ঠের মুখাপেক্ষী হইয়া গীতিকবিতা রচিত হয় না। বৈষ্ণব পদাবলীর অধিকাংশ রচিত হইয়াছে সুরের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া।" (কালিদাস রায়)। তাছাড়া গীতিকবিতা ছোট কি বড় হবে—তার কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই,—কবিমনের অন্তর্নিহিত ভাবটি সম্পূর্ণভাবে পরিস্ফুট হ'তে যেটুকু পরিসর প্রয়োজন, গীতিকবিতা সেই হিসাবেই ছোট-বড় হয়। তবে সংকীর্ণ পরিসরে ভাবটি নিটোল, ঘনবদ্ধ ও গাঢ়-রসায়িত অধিক হয়, এই মাত্র। সেই হিসাবেও বৈষ্ণব পদাবলী গীতিকবিতা নয়। কারণ গানের জন্য রচিত বলে একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে তাকে শেষ করতে হ'ত।

সুতরাং স্পষ্টই সিদ্ধান্ত করা চলে যে, আবেগের গভীরতা, আন্তরিকতা ও মর্মস্পর্শিতা এবং প্রকাশভঙ্গীর অসামান্যতায় বৈষ্ণব কবিতা প্রথম শ্রেণীর গীতিকবিতার লক্ষণাক্রান্ত হলেও সঠিক অর্থে গীতিকবিতা একে বলা চলে না।

গীতিনাট্য

'পদকল্পতরু'-সম্পাদক ৺সতীশচন্দ্র রায় বলেছেন—"বৈষ্ণব পদাবলী যেরূপ নায়ক-নায়িকার ও সখা-সখীদিগের উক্তি-প্রত্যুক্তি-প্রধান পালার আকারে সজ্জিত হইয়াছে এবং কীর্তনিয়ারা অনেক সময়েই যেভাবে কীর্তনের পালাগুলি গান করিয়া থাকেন, তাহাতে ঐ পালাগুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীতি-নাট্য (opera) বলাই সঙ্গত।" (৫ম খণ্ড/পৃঃ ২৫৩)।

গীতিনাট্য বলতে—নাটকের লক্ষণাক্রান্ত কাব্যপ্রাণ ছন্দোবদ্ধ রচনাকে বুঝায়। এতে সংলাপাংশ থাকে অতি সামান্যই—কখনো বা আদৌ থাকে না। গীতিসর্বস্বতাই তার বিশেষত্ব। সমালোচকের ভাষায়—'there will be a bit of dialogue spoken without music leading to another musical item or number as such things are habitually called.'। গীতিনাট্যে সমবেত সঙ্গীত, একক সঙ্গীত, দ্বৈত সঙ্গীত প্রভৃতির মাধ্যমে কাহিনী ও চরিত্রের বিবর্তন সাধিত হয়। এছাড়া—গীতিনাট্যের বিষয়বস্তুতে বাস্তবতার ছোঁয়াচ থাকলেও প্রকাশরীতির মাধ্যম সঙ্গীত বলে তা অতিবস্তুনিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারে না— "An opera cannot be strictly realistic, because it depends on music for its expression and music is intelligible as music only when it has a certain formality or structure." গীতিনাট্যকে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায় যে, 'ইহা সুরে নাটিকা'। অর্থাৎ এতে গীতিসুর প্রধান নয়, নাট্যবস্তু সুরের মাধ্যমে রূপায়িত হয়েছে মাত্র।

বৈষ্ণব পদাবলী গীতিকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত হলেও তার মধ্যে নাট্যলক্ষণের পরিচয়ও রয়েছে। প্রাক্-চৈতন্যযুগের কাব্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য—এর নাট্যধর্ম। ফলে শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর পার্ষদদের নিয়ে একাধিকবার এর অভিনয় করেছিলেন বলে জানা যায়। কিন্তু বিভিন্ন বৈষ্ণবপদ খণ্ড-কবিতা হিসাবে রচিত হলেও তার মধ্যে

নাট্যধর্মটিও অনুপস্থিত থাকে নি। এর কারণ—বৈষ্ণব পদাবলী বিভিন্ন ভাবের পালাবদ্ধ রসকীর্তন। বিভিন্ন রসপর্যায় অনুযায়ী বৈষ্ণব পদকর্তারা পদ রচনা করেছেন। ফলে এক একটি রসপর্যায়কে যদি এক একগাছি মালা বলা যায়, তাহলে পদগুলি প্রত্যেকটি এক একটি ফুল। বহু ফুলের সমবায়ে একটি মালিকা গঠিত হয়েছে। পদগুলিতে আবার নায়ক-নায়িকা বা সখা-সখীদের উক্তি-প্রত্যুক্তির মাধ্যমে নাট্যিক দ্বন্দ্বের ক্রমোন্নতিও সাধিত হয়েছে। শুধু উক্তি-প্রত্যুক্তি থাকলেই তা নাটক হয় না—দ্বন্দ্ব সংঘাতের মাধ্যমে জীবনের বাঙ্ময় রস-রূপায়ণ হচ্ছে নাটক।—তাছাড়া "A drama is never really a story told to an audience; it is a story interpreted before an audience by a body of actors" (Nicoll)। বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে এই নাট্যিক রূপটি উপস্থিত। একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক্। দুর্যোগপূর্ণ রজনীতে শ্রীরাধা অভিসারের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। সখীরা তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করতে চেষ্টা করছেন। তাঁরা বলছেন—

মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট॥
সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার।...ইত্যাদি।

তার উত্তরে রাধা বলছেন—

'কুল-মরিয়াদ-কপাট উদঘাটলু' তাহে কি কাঠকি বাধা'—ইত্যাদি।—এখানে এই উক্তি-প্রত্যুক্তি নাটকীয়-কৌতূহল উদ্দীপক এবং ঘটনা ও চরিত্রের পরিচায়কও বটে। এরূপ দৃষ্টান্ত অজস্র মিলে।

তবু বৈষ্ণব পদাবলীকে গীতিনাট্য বলা চলে না। কারণ পদগুলি বিচ্ছিন্ন খণ্ড কবিতা মাত্র। এর নাট্যমূল্য কিছু থাকলেও গীতিমূল্যই প্রধান। তাছাড়া এতে সামগ্রিক ঘটনা—আদি-মধ্য-অন্ত—সমন্বিত নাট্যবৃত্তরূপে উপস্থাপিত হয় নি। সুতরাং বৈষ্ণব পদাবলীকে গীতিনাট্য বলা চলে না যুক্তিযুক্ত ভাবেই।

সমুদ্রগামী নদীর ন্যায়

বৈষ্ণব পদাবলী বৈষ্ণবতত্ত্বের রসভাষ্য। অপ্রাকৃত, চিন্ময় রাধাকৃষ্ণ প্রেমতত্ত্বকে বৈষ্ণবকবি বাঙ্ময় রসরূপ দিয়েছেন। বৈষ্ণব মতে, রাধা কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির অংশ। কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি। তার মধ্যে তিনটি শক্তি প্রধান—স্বরূপ, জীব ও মায়াশক্তি। স্বরূপ শক্তির আবার তিনটি অংশ—সৎ, চিৎ ও আনন্দ। মহাভাবময়ী শ্রীরাধা কৃষ্ণের এই আনন্দশক্তির পরিপূর্ণ বিকশিত রূপ। মূলে রাধাকৃষ্ণ এক ছিলেন—লীলার জন্য তাঁদের এই দ্বিধা-সত্তারূপ। কেননা — 'একোহম্ বহুস্যাম'—একের দ্বারা লীলা হয় না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—'আমায় নৈলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হত যে মিছে'।

কৃষ্ণের অসংখ্য লীলাবৈচিত্র্যের মধ্যে—'সর্বোত্তম নরলীলা নরবপুঃ তাঁহার স্বরূপ'। রাধাকৃষ্ণ-যুগলরূপ এই লীলারই ঘনীভূত রসবিগ্রহ। তত্ত্বতঃ, মূলে তাঁরা এক—'রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান। দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ॥' কিন্তু একদা লীলায়

কারণে তাঁরা দ্বিধাসত্তায় প্রকটিত হয়েছিলেন। 'লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ।' কবি-সমালোচকের ভাষায় এই দ্বৈতরূপের পরিচয়—

"যে লীলানন্দ উপভোগের জন্য ভগবানের নররূপ ধারণ, তাহা কাব্যের ভাষায় মানবিক আনন্দ। তাহাতে আনন্দও আছে, বেদনাও আছে। নিরবচ্ছিন্ন আত্মানন্দ ভোগের চেয়ে এই বেদনান্তরিত বিরহের দ্বারা উপচীয়মান নবনবায়মান আনন্দের তীব্রতা ঢের বেশী—নিরবচ্ছিন্ন আলোকের চেয়ে আলো-আঁধারি, এমনকি মাঝে মাঝে আঁধারও যেমন স্পৃহণীয় হয়ে ওঠে। সেই রসসত্তার তীব্র আনন্দ ভক্তগণকে দান করিবার জন্য ভগবানের হ্লাদিনীর সহিত দ্বৈত ব্যবধান।" (কালিদাস রায়)।

লীলার জন্য রাধাকৃষ্ণ দ্বিধাবিভক্ত হয়েছিলেন। এই দ্বিধাসত্তা নানা অবস্থাবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে আবার পরিশেষে এক দেহে, এক আত্মায় মিশে যায়। সমগ্র বৈষ্ণব পদাবলী এই দ্বৈতসত্তার অদ্বয়ত্বে প্রতিষ্ঠার সাধনা। বৈষ্ণবপদকর্তাগণ সেই অপ্রাকৃত, চিন্ময় লীলা-বৈচিত্র্য প্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যম খুঁজে না পেয়ে প্রাকৃত নরনারীর বিচিত্র প্রেমলীলার মানদণ্ডকে অবলম্বন করেন। বৈষ্ণব পদাবলীতে তাই দেখি—স্বর্গ ও মর্ত, অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত—রূপবৈচিত্র্য এক বেণীবন্ধনে বাঁধা পড়েছে। তদ্‌গত-চিত্ত বৈষ্ণব ভক্ত মর্তজীবন-বোধের নিরিখে সেই অপ্রাকৃত ভগবদ্‌লীলা আস্বাদন করার চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।' রবীন্দ্রনাথের মতে বৈষ্ণব ভক্ত মর্তজীবনের সংকীর্ণ বাতায়ন পথে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছেন।—'বৈষ্ণব ধর্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেম সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে।... এই সমস্ত পরমপ্রেমের মধ্যে একদা সীমাতীত লোকাতীত ঐশ্বর্য্য অনুভব করিয়াছে।' আসলে রবীন্দ্রনাথের চেতনায় বৈষ্ণবতত্ত্বের স্বরূপটি যথাযথ ধরা পড়েনি, বলা যায়। বৈষ্ণব সাধক লৌকিক প্রেমের সীমায় অলৌকিক লীলারূপকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন। অলৌকিককে তাঁরা টেনে এনেছেন ধূলিধূসর লৌকিক জগতের প্রেক্ষাপটে। লৌকিককে অলৌকিক বলে কখনো তাঁরা ভুল করেন নি। লৌকিকের সাদৃশ্যে ভাবেরও সাদৃশ্য বলে বিচ্ছিত্তি বা মনের ভ্রম ঘটেছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের দ্বিধাসত্তা কেমন করে বিচিত্র পথ অতিক্রম করে পরিশেষে অদ্বয় সত্তায় মিশে গেল, তারই বাঙ্ময় রসরূপ চিত্রিত হয়েছে। পূর্বরাগ পর্যায়ে শ্রীরাধার যে দুর্জয় জীবনসাধনা শুরু হয়েছিল, অভিসার, নিবেদন, মাথুরের পথ বেয়ে তা ভাবসম্মিলনে গিয়ে শেষ হয়েছিল। এতদিনকার নানা দুঃখবেদনা, সুখ-আনন্দের উত্তাল কলরোল পরিসমাপ্তি লাভ করল মিলনের মহাসমুদ্রে। দূরবগাহী মিলনের আশ্লেষে সব বেদনা, সব আর্তি, সব কথাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়—পরমপ্রাপ্তির সার্থকতায় মিলিয়ে যায় হৃদয়ের উচ্ছলতা। সমালোচক তাই বলেন—

"বৈষ্ণব কবিতা সমুদ্রগামী নদীর ন্যায়। নদী চলিয়াছে; দুই দিকে তটভূমি, তাহা আনন্দ-কলরবে মুখরিত হইয়া নদী চলিতেছে, .. কিন্তু নদী যখন মোহনায় আসিল, তখন সে-সমস্ত দৃশ্য সে পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে,...সম্মুখে দুর্ভেদ্য প্রহেলিকার মত অসীমের

প্রতীক মহাসমুদ্র। বৈষ্ণব কবিতা নানারূপ পার্থিব সৌন্দর্যের পথ বাহিয়া চলিয়াছে—কিন্তু তাহার পরম লক্ষ্য সেই অজ্ঞেয় দুরধিগম্য মহাসত্য।...বৈষ্ণব কবিতা এইভাবে জানা পথ দিয়া লইয়া অজানার সন্ধান দেয়।" (দীনেশচন্দ্র সেন)

ব্রজবুলি

ব্রজবুলি একপ্রকার কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা। বাংলাদেশে বৈষ্ণব পদাবলীর জনপ্রিয়তার মূলে এই ভাষার দান বর্ণনাতীত। মৈথিল ও বাংলা ভাষার সংমিশ্রণে সৃষ্ট ব্রজবুলি ভাষার লালিত্য, মাধুর্য্য ও ধ্বনিঝঙ্কার যে মাদকতার সৃষ্টি করে, তা পাঠক ও শ্রোতার মনকে সহজেই কেড়ে নেয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর মহাকবি বিদ্যাপতি এক কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষার প্রয়োজন অনুভব করে অবহট্ট ভাষায় পদ রচনা করেছিলেন। তিনি এই অবহট্ট ভাষার পদ রচনার কারণ সম্পর্কে বলছেন—'দেসিল বঅনা সব জন মিঠ্‌ঠা। তে তৈসন জম্পও অবহট্টা॥'—দেশী বচন সকলেরই মিস্ট লাগে। তাই সেইরূপ 'অবহট্ট' ভাষায় বলছি। আত্মবিশ্বাসে ভরপূর বিদ্যাপতি এই কৃত্রিম ভাষার সর্বাতিশায়িতা সম্পর্কে বলেছেন—

বালচন্দা বিজ্জাবই ভাষা। দুহু নহি লগ্‌গই দুজ্জন হাসা॥
ও পরমেশ্বর হরশির সোহই। ঈ নিচ্চয় নায়র মন মোহই॥

—শিশুচন্দ্র ও বিদ্যাপতির ভাষাকে দুর্জনেরা পরিহাস করে কিছু করতে পারবে না। চন্দ্র পরমেশ্বর শিবের কপালে শোভা পায়। এই ভাষা নিশ্চয়ই বিদগ্ধ-জনের মন জয় করবে।

অবহট্ট ভাষা সম্পর্কে বিদ্যাপতি যে কথা বলেছিলেন, ব্রজবুলি ভাষা সম্পর্কে তা আরো অধিক সত্য। এই ভাষার শ্রুতিমাধুর্য এবং ছন্দের দুলুনি, অনুপ্রাসের ঝঙ্কার—এর ফলে ব্রজবুলি ভাষা রসিক ও ভক্তমহলে বিশেষ আদৃত হয়েছিল। বস্তুত, ব্রজবুলির ভাষার পথ দিয়েই সাধক কবি রাধাকৃষ্ণলীলার অসীম সৌন্দর্য-সমুদ্রের একপ্রান্তে নিয়ে যান পাঠক মনকে। সুতরাং ব্রজবুলি ভাষার উদ্ভবের ঐতিহাসিক পটভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন।

বৈষ্ণব পদাবলীর ইতিহাস খুব প্রাচীন। 'গাথা সত্তসই'-এর প্রকীর্ণ শ্লোকে রাধাকৃষ্ণের প্রেমানুরাগের যে চিত্র আছে, পদাবলীর এটাই সম্ভবত প্রাচীন উৎস। তারপর দ্বাদশ শতকে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'-এর পর্যায় অতিক্রম করে চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের পদাবলীতে তা সার্থক রূপ পরিগ্রহ করেছিল। আধুনিক ভারতীয় ভাষায় বৈষ্ণবপদ রচনা করেন মিথিলার আর এক সভাকবি উমাপতি ওঝা — বিদ্যাপতির আবির্ভাবের একশ পঁচিশ বছর আগে, চতুর্দশ শতকে। তবে ব্রজবুলির বিকাশের জন্য অপেক্ষা ছিল বিদ্যাপতির।

ব্রজবুলি নামটি আধুনিককালের দেওয়া। উনবিংশ শতাব্দীতে ঈশ্বর গুপ্ত সর্বপ্রথম এই নাম ব্যবহার করেন। ব্রজবুলি ভাষার মাধুর্য লক্ষ্য করে মনে করা হ'ল যে, বৃন্দাবনের

গোপগোপীরা সম্ভবত এই ভাষায় কথা বলতেন। ব্রজের বুলি বলে এর নাম হ'ল ব্রজবুলি। অবশ্য এই ধারণার ঐতিহাসিক তাৎপর্য কিছু না থাকলেও এই ভাবগত ও রস-গত ব্যাখ্যার কিছুটা মূল্য আছে, এ ধারণা অসঙ্গত নয়। ব্রজবুলির উৎপত্তি সম্পর্কে একটি মতবাদ প্রচলিত আছে যে, বাংলাদেশে বিদ্যাপতির পদের বিকৃত রূপই ব্রজবুলি। এ ধারণাও ভুল। কেননা তা'হলে এই বিকৃত ভাষা একটি সাহিত্যিক উপভাষা-রূপে সারা উত্তর ভারতে বিস্তৃতি ও সমাদর লাভ করতে পারত না। ভাষাতত্ত্ববিদ গ্রীয়ারসনের ও প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসুর অনুসরণে উক্ত অভিমত ডঃ সুকুমার সেন প্রথমে সমর্থন করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি নিজেই এই অভিমত খণ্ডন করেছেন দুটি কারণে—প্রথমত, বিদ্যাপতির সময়ের মৈথিলীভাষার সঙ্গে ব্রজবুলির সাদৃশ্যও যেমন আছে, তেমনি বৈসাদৃশ্যও কম নেই। দ্বিতীয়ত, বাংলা-মিথিলায় ছাত্রদের যাতায়াতের ও দুই দেশের ঘনিষ্ঠতার ফলে মৈথিলী ভাষার ঠাট নিয়ে অল্পদিনের মধ্যেই বাংলায় একটি নতুন কাব্য-ধারার সৃষ্টি হয়েছিল, এ ধারণাও ঠিক নয়। কারণ—

"ব্রজবুলি যদি মৈথিলীর অনুকরণ হ'ত, তাহলে প্রথম দিকের রচনায় মৈথিলীর সঙ্গে মিল ঘনিষ্ঠতর হত এবং ক্রমশ সে মিল কমে আসত। আসলে কিন্তু ঠিক তার বিপরীত। বাঙালীর লেখা সবচেয়ে পুরানো পদাবলীতে দেখি যে, সেখানে মৈথিলীর সঙ্গে মিল ততটা ঘনিষ্ঠ নয় যতটা পরবর্তীকালের পদাবলীতে। গোবিন্দদাসের পূর্বগামীদের ব্রজবুলি রচনায় বাংলা ও অ-বাংলা অংশ প্রায় সমান সমান। এখন কি করে বলি যে, ব্রজবুলির উৎপত্তি মৈথিলীরই অনুকরণে।" (সুকুমার সেন)।

আচার্য সেন তাই সিদ্ধান্ত করেছেন—"সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কবিতা খ্রীষ্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত আর্যাবর্তের সর্বত্র প্রচারিত ছিল, বিশেষ করে ভারতের পূর্বাঞ্চলে। এই চার-পাঁচ শ বছর ধরে আর্যাবর্তে অর্থাৎ পশ্চিমে গুজরাট থেকে পূর্বে কামরূপ পর্যন্ত সমসাময়িক কথ্যভাষার সর্বভূমিক সাধুরূপ অবলম্বন করে একটি সাহিত্যিক ভাষা প্রচলিত হয়েছিল। এই ভাষাকে সেকালের ও একালের পণ্ডিতেরা নানা নামে অভিহিত করেছেন—প্রাকৃত, অপভ্রংশ, অর্বাচীন অপভ্রংশ, অপভ্রষ্ট, অবহট্‌ঠ, দেশী, ভাষা ইত্যাদি। এর মধ্যে অবহট্‌ঠ নামটিই সবচেয়ে উপযোগী বলে মনে হয়। সমসাময়িক রচনায়ও এই নামটি পাওয়া যায়। বৈষ্ণব পদাবলীর অপেক্ষাকৃত পূর্বতন রূপ বিদ্যমান ছিল অবহট্‌ঠ—এ অনুমান অপরিহার্য।...এই অবহট্‌ঠ থেকেই ব্রজবুলির উৎপত্তি হয়েছে।" (বিচিত্র সাহিত্য ; পৃঃ ৫৮, ৬০)।

বাংলাদেশে সুলতান হোসেন শাহের আমলে যশোরাজ খান প্রথম ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করেন। পদটি—"এক পয়োধর চন্দন লেপিত আর সহজই গোর'—ইত্যাদি। উড়িষ্যায় এ-ভাষায় প্রথম পদ রচনা করেন মহাপ্রভুর ঘনিষ্ঠজন রামানন্দ রায়—'পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল'। মিথিলায় ব্রজবুলিতে প্রথম লেখার কৃতিত্ব উমাপতি ওঝার—চতুর্দশ শতকের প্রথম দিকে। আসামে শঙ্করদেব এ পথের দিশারী। তিনি উমাপতির 'পারিজাতহরণ' নাটকের অনুসরণে ওই নামেই লেখেন নাটক। শঙ্করের ব্রজবুলিতে রচিত

পদ—'হরি হরি পিয় মোরি বৈরি অধিক ভেল, করলি অন্তরে অপমানা'—বিশেষভাবে উল্লেখ্য। ডঃ সেন সিদ্ধান্ত করেছেন : "ব্রজবুলির উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল নেপাল তীরহুত মোরঙ্গের রাজসভায়।" কারণ তুর্কি-আক্রমণের ফলে নেপালে বিহার ও বাংলাদেশের বহু পণ্ডিত আশ্রয় নেন। "লক্ষ্মণসেনের রাজ্য নষ্ট হবার পরে বৈষ্ণব-গীতিকাব্যের এই সভাসিদ্ধ প্রথা চলে আসে নেপালে তীরহুতে ও অন্যান্য প্রান্তীয় রাজ ও সামন্ত সভায়। নেপালে ব্রজবুলি পদাবলীর চর্চা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত চলে আসছিল। নেপালের রাজারাও ব্রজবুলিতে পদ লিখতেন।"

সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতে ব্রজবুলি ভাষা চলিত হলেও বাংলাদেশেই তা পুষ্পিত ও পল্লবিত হয়েছে সর্বাপেক্ষা অধিক। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত পাওয়া প্রথম পদের কথা আগেই বলেছি। সেটি পঞ্চদশ শতকের। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে অজস্র বৈষ্ণব কবি ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করেছিলেন। এ'দের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কবি গোবিন্দদাস। তিনি 'ব্রজবুলি তথা বৈষ্ণব পদাবলীতে নূতন জীবন সঞ্চার করলেন।' এই ব্রজবুলি ধারার শেষ পরিণতি উনবিংশ শতাব্দীতে রচিত 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'তে।

"ব্রজবুলি ভাষা কোমল, কান্ত, মধুর সুখশ্রাবী! তদুপরি অপ্রাকৃত রাধাকৃষ্ণলীলার মাধুর্য প্রকাশের জন্য পদকর্তাগণ সর্বজনব্যবহৃত সাধারণ ভাষা ব্যবহারের পরিবর্তে এই ভাষা ব্যবহারের দ্বারা সেই লীলার গূঢ়তা ও রহস্যময়তার প্রতিই যেন ইঙ্গিত করিয়াছেন। ইহা ছাড়া শ্রীচৈতন্যদেবের সময় হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম সমগ্র আর্যাবর্তে প্রচারিত হইয়াছিল। বিশেষত বৃন্দাবন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের কেন্দ্রস্থল হওয়ায় আর্যাবর্তেও বঙ্গীয় পদাবলী-সাহিত্য প্রচারের প্রয়োজন হইয়াছিল।...সেজন্য কবিরা এমন ভাষার আশ্রয় লইলেন, যাহা আর্যাবর্তের সকল লোকেরই সহজে বোধগম্য হইতে পারে।" (কালিদাস রায়)। এছাড়া 'কীর্তন সঙ্গীতের রসমূর্চ্ছনা ও সুরের অলঙ্করণের পক্ষে ব্রজবুলি অধিকতর উপযোগী' বলেও ব্রজবুলিতে পদ রচিত হয়েছিল।

ব্রজবুলির ভাষাতাত্ত্বিক বিশেষত্ব সম্বন্ধেও সংক্ষেপে কিছু জানা প্রয়োজন—

(১) তৎসম ও অর্ধতৎসম শব্দের বহুলতা।

(২) অ-এর তিন প্রকার উচ্চারণ—সংবৃত, বিবৃত (হ্রস্ব) এবং অতিসংক্ষিপ্ত।

(৩) ই, ঈ-এর-হ্রস্ব-দীর্ঘ—দু'প্রকার উচ্চারণ।

(৪) দ্বিবচনের বিভক্তিহীনতা।

(৫) দ্বিত্ব-ব্যঞ্জনের লোপ।—ধিক্কার>ধিকার ; উত্তর>উতর ; উন্মত্ত>উনমত।

(৬) প্রথমার একবচনে প্রায়ই বিভক্তি থাকে না ; দ্বিতীয়ার বিভক্তি লুপ্ত ; তৃতীয়ার এ, হি, হি'—বিভক্তি যুক্ত হয়।

(৭) পঞ্চমীতে সেঁ, সঞে—বিভক্তির প্রয়োগ।

(৮) ষষ্ঠীতে ক, কা, কি, কে বিভক্তির ব্যবহার।

(৯) সপ্তমীতে এ, হি, হিঁ বিভক্তির প্রয়োগ অথবা বিভক্তি-লোপ।

(১০) পদমধ্যাস্থিত খ, ঘ, থ, ধ, ভ অনেক সময় 'হ' হয়। মেঘ>মেহ, লঘু>লহু, নাথ>নাহ।

(১১) 'ম' ব্যতীত অন্য স্পর্শ বর্ণের পূর্বে থাকলে শ, ষ, স প্রায়শ লোপ পায়। নিশ্চয়>নিচয়, নিশ্চল>নিচল, অস্থির>অথির, দুস্তর>দুতর।

(১২) বহুবচন বুঝাতে সব, কুল, সমাজ, মেলি ইত্যাদির ব্যবহার। সখী সব, সখি সমাজ।

(১৩) সমাস-বন্ধনে ধরা-বাধা নিয়ম নেই—উল্‌টা-পাল্‌টা পদের মধ্যে সমাস হয়,—'মণ্ডিত—মালতি-মাল', কিন্তু হওয়া উচিত 'মালতি—মাল-মণ্ডিত'।

(১৪) 'অব' যোগে ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়াপদ গঠিত—কহব, চলব। বর্তমানকালে—হ', উ, ওঁ, সি, ই, অই, ই, অত ইত্যাদি সহযোগে; অতীতকালের ক্রিয়াপদ—অল, ই, ও, উ, লা—যোগে ক্রিয়াপদ গঠিত।

এছাড়া ব্রজবুলির ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য আরো অজস্র আছে। সে সম্পর্কে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন, ডঃ সুকুমার সেন, কবিশেখর কালিদাস রায়, সতীশচন্দ্র রায়, বৈষ্ণবাচার্য হরিদাস দাস বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। আমাদের আলোচনা তাঁদের প্রবন্ধসমূহকে অনুসরণ করে।

কীর্তন

কীর্তন গান বলতে বিশেষ করে বৈষ্ণব পদাবলী কীর্তনকে বোঝালেও এর আভিধানিক অর্থ স্তুতি, প্রশংসা, যশোগাথা। কীর্তন ও কীর্তি শব্দ একই উৎসজাত। শ্রীমদ্‌ভাগবতে কৃষ্ণের মহিমাগান প্রকাশে কীর্তন শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। সুন্দর দেহ, ময়ূরপুচ্ছের শিরোভূষণ, কর্ণমূলে কর্ণিকা-পুষ্প, পরিধানে কনকোজ্জ্বল পীতবাস, গলে মালা, অধরে বেনু—এ হেন অবস্থায় কৃষ্ণ বৃন্দাবনে প্রবেশ করলেন। চারদিকে ধ্বনিত হচ্ছিল তখন গোপবৃন্দের প্রশংসাগীতি। কারো কারো মতে, 'কীর্তিলহরী' কথা থেকে এসেছে 'কীর্তন' কথাটা। 'কীর্তিলহরী'র অর্থ দেবতা বা বরেণ্য মহামানবের উদ্দেশে কীর্তিগাথা বা যশোগান। তবে ভগবানের লীলাকীর্তন অর্থে-ই কীর্তন শব্দটি বিশেষ ভাবে প্রযুক্ত হ'য়ে থাকে। ভাগবতে কীর্তন নবধা ভক্তির অন্যতম :

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণো স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥

সুতরাং উচ্চকণ্ঠে ভগবানের নাম বা গুণাদির গাথাই কীর্তন নামে অভিহিত। রূপ গোস্বামী কৃত সংজ্ঞা : 'নামলীলাগুণাদীনং উচ্চৈর্ভাষা তু কীর্তনম্।' সনাতন গোস্বামী বলেছেন : "সঙ্কীর্তনং নামোচ্চারং গীতং স্তুতিশ্চ নামময়ী।"

বাংলাদেশে কীর্তনের ইতিহাস চর্যাপদের আমল থেকেই শুরু হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দের' সুরতাল কীর্তনের ঢঙে রচিত। বড়ু চণ্ডীদাসের 'কৃষ্ণকীর্তন' কোন্ শ্রেণীর, তা নামেই বোঝা যায়। চৈতন্য-চরিতামৃতে উল্লিখিত আছে :

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ॥

এখানে ভগবানের নামকীর্তনের দ্বারা কীর্তন শব্দের মহিমা প্রকাশিত হয়েছে বলা যায়।

॥ ২ ॥

কীর্তন তিন প্রকার—নামকীর্তন, লীলাকীর্তন, সূচককীর্তন। সমবেতভাবে ভগবানের নাম ও গুণাদির গানই হোল নাম-সংকীর্তন। প্রাক্‌চৈতন্য যুগে সংকীর্তন প্রথা ছিল। চৈতন্যদেবের জন্মলগ্নে নবদ্বীপ হরিনাম গানে মুখরিত হয়েছিল। তবুও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই সংকীর্তনের প্রবর্তক। কারণ প্রণালীবদ্ধ ভাবে কীর্তনগান মহাপ্রভুর আগে প্রচারিত হয় নি। তাছাড়া মহাপ্রভুই সর্বপ্রথম বিশ্ববাসীকে শোনালেন যে, কলিযুগে নামকীর্তনই সার এবং নামের ফলেই কৃষ্ণপদে মন উপজিত হয়। গয়া থেকে ফিরে এসে চৈতন্যদেব হরিনামে মেতে উঠলেন। শ্রীবাসের অঙ্গনে হরিনামের যে ক্ষীণধ্বনি উঠত, মহাপ্রভুর যোগদানের ফলে উত্তাল হ'তে থাকল তার কলনিনাদ। চৈতন্যদেব পূর্ববঙ্গেই সর্বপ্রথম নামকীর্তন প্রচার করেন বলে জানা যায়। বৃন্দাবন দাস লিখেছেন :

'আজানুলম্বিত ভুজদ্বয়, কনকসুন্দর কান্তি, কমলায়ত অক্ষি, সংকীর্তন প্রবর্তক, যুগধর্ম-পালক, জগৎপ্রিয়ংকর, করুণার অবতার প্রভু চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দকে বন্দনা করি।'

বাস্তবিকপক্ষে চৈতন্যদেবই ছিলেন সংকীর্তন প্রবর্তক। তিনি বহিরঙ্গ সনে নামকীর্তন এবং অন্তরঙ্গ সনে লীলারস আস্বাদন করতেন। ভক্তগণ তাঁর কাছে কোন উপদেশ প্রার্থনা করলে তিনি তাদের কৃষ্ণনাম করতে বলতেন :

কীর্তন করিহ সভে হাতে তালি দিয়া॥
হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥

শ্রীবাসঅঙ্গনে কীর্তনকালে চৈতন্যদেব তিনটি সম্প্রদায় গঠন করেন। কাজিদলনের সময় কীর্তনদল চার ভাগে বিভক্ত হয়েছিল। নীলাচলে অবস্থানকালে চৈতন্যদেব নাম-কীর্তনে অংশগ্রহণ করতেন। সুতরাং বৃন্দাবন দাসের প্রশস্তি—"চৈতন্যচন্দ্রের এই আদি সংকীর্তন। ভক্তগণ নাচে নাচে শ্রীশচীনন্দন॥"—বিশেষ অর্থব্যঞ্জক। নাম সংকীর্তনের মহিমা মহাপ্রভুই জগৎসমক্ষে প্রকটিত করেন :

সংকীর্তনযজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ আরাধন।...
চিত্তশুদ্ধি সর্বভক্তি সাধন উদ্‌গম॥

কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন ॥

বৈষ্ণবভক্তের যাচ্ঞা—মোক্ষ নয়, প্রেম। 'প্রেমভক্তি সর্বসাধ্যসার'। তদ্গত চিত্তে নামকীর্তনের ফলে ভক্তচিত্তে শুদ্ধপ্রেমের উদ্গম হয়। যবন হরিদাসের উক্তিতেও জানা যায় যে 'নামের ফলে কৃষ্ণপদে মন উপজয়।' কলিযুগে নামসংকীর্তনই একমাত্র ধর্ম। চৈতন্যদেবও এই শিক্ষা দিয়েছেন: 'হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।'

লীলাকীর্তনকে রসকীর্তন বা পালাকীর্তনও বলা হয়ে থাকে। রাধাকৃষ্ণ-লীলারসের যে-কোন একটি পর্যায়ের পদ পালাবদ্ধ করে গান করা হয়। রসপর্যায় যেন সূতো, পদগুলি ফুল। এদের সহযোগে অখণ্ড একটি মাল্য রচিত হয়। বিভিন্ন মহাজনের উৎকৃষ্ট পদগুলি কীর্তনীয়া একত্র সন্নিবেশিত করেন। এই সজ্জাকরণে ক্রমানুসারিতা ও সংযুক্তি বজায় থাকে। রসাভাস যাতে দেখা না দেয়, সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হয়।

রসকীর্তন চৈতন্যদেবের সময় থেকেই প্রচলিত। অন্তরঙ্গসনে তিনি রস আস্বাদন করতেন, একথা চৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত আছে। কিন্তু সে রসকীর্তনের সঠিক পরিচয় এখনও পাওয়া যায় না। চৈতন্যদেবের তিরোভাবের প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে খেতুরীর মহোৎসবে নরোত্তমদাস পালাকীর্তনকে নতুনরূপে উন্নীত করলেন। রসকীর্তনের প্রারম্ভে গৌরচন্দ্রিকা গাওয়ার রীতিও নরোত্তম প্রবর্তন করেন। বিশুদ্ধ রাগরাগিণীর সমাবেশে রসকীর্তনকে মার্গসঙ্গীতের সুরে উন্নীত করে কীর্তনের ভিত্তি-ভূমি নরোত্তম সুদৃঢ় করে দিলেন।

কীর্তনে চৌষট্টি রস আছে। শৃঙ্গার বা মধুর রসের দুটি বিভাগ—বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ। বিপ্রলম্ভ আবার চার প্রকার—পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস। এদের প্রত্যেকটি আবার আট প্রকার। সম্ভোগেরও চারটি শ্রেণী—সংক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ, সম্পন্ন, সমৃদ্ধিমান। এদের আবার আটটি করে উপবিভাগ। তাহলে একুনে চৌষট্টি বিভাগ দাঁড়াল।

অপরপক্ষে নায়িকার আটপ্রকার অবস্থার বৈচিত্র্যভেদেও চৌষট্টি প্রকার রসের পরিকল্পনা করা হয়ে থাকে। আটপ্রকার নায়িকা, যথা—অভিসারিকা, বাসকসজ্জিকা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্তৃকা, স্বাধীনভর্তৃকা। এদের প্রত্যেকটির আবার আটটি করে উপবিভাগ। তাহলেও চৌষট্টি প্রকার হোল।

রাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীন নিত্যলীলাই রসকীর্তনের উপজীব্য। কৃষ্ণের জন্মলীলা থেকে ভাবসম্মিলন পর্যন্ত লীলার যে-কোন একটি পর্যায় অবলম্বন করে পালাগায়ক কীর্তন গান করেন।

নামকীর্তন ও রসকীর্তন ছাড়াও সূচককীর্তন নামে আর একপ্রকার কীর্তন আছে। কোন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-ভক্ত ও মহাজনের তিরোভাব মহোৎসবে তাঁর লীলাবিষয়ক যে কীর্তন করা হয়, তাকে বলে সূচককীর্তন। মহাজনস্মৃতিবন্দনার এটি একটি বিশেষ রীতি।

॥ ৩ ॥

লীলাকীর্তনের ছয়টি অঙ্গভেদ কল্পিত হয়েছে—কথা, দোঁহা, আখর, তুক, ছুট, ঝুমুর।

এক পদ শেষ করে অন্যপদ গাওয়ার আগে এই দু'পদের যোগসূত্রস্বরূপ কথা ব্যবহৃত হয়। কথার দ্বারা কখনো-বা দুরূহ পদকে ব্যাখ্যা করা হয়।

কোন পদ গান করার সময় গায়ক পয়ার, ত্রিপদী, চৌপাঈ ছন্দের সংস্কৃত শ্লোক দু'চার পংক্তি আবৃত্তি করেন। একে বলে দোঁহা। মূল সুরের রসমাধুর্যকে পুষ্ট ও মধুর করে তোলা দোঁহার কাজ। আর আখর কীর্তনের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। পদাবলীর মর্মের দুর্বোধ্যতা আখরের দ্বারা রসিক মনের কাছে জলের মত সহজ হয়ে যায়। ব্রজবুলি, সংস্কৃতপদ, কিম্বা কোন গূঢ় রহস্যপূর্ণ পদ গানের মধ্যে ভাবাবিষ্ট গায়ক গদ্যে অথবা পদে মূল তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। আখরের বৈচিত্র্য পদাবলী কীর্তনকে উপভোগ্য করে তোলে। মার্গসঙ্গীতের তান ও কীর্তনের আখর প্রায় একই প্রকার। আর তুককে বলা হয় মিলনাত্মক আখর। পদকীর্তন করতে করতে গায়ক ছন্দোবদ্ধ দু'এক চরণ গেয়ে থাকেন। কখনও বৈষ্ণব-কাব্য থেকে নিয়ে, কখনো বা স্বরচিত পদাংশ গান করেন গায়ক। তুক গুরু-পরম্পরায় চলে আসছে। সম্পূর্ণ পদ না গেয়ে হাল্‌কা চালে পদের অংশ বিশেষ গাওয়াকে ছুট বলে। বড়তালের গানের মাঝে তাল ফেরতা ছোটতালের গান ছুট নামে আখ্যাত। অনেক সময় একাধিক কীর্তনীয়া যখন পদাবলী কীর্তন করেন, তখন প্রচলিত নিয়মানুসারে মিলন গাওয়া যায় না, ঝুমুর গেয়ে আসর রাখতে হয়। সর্বশেষ গায়ক মিলন গেয়ে পালা শেষ করেন। সাধারণত দু'চার ছত্র পয়ার, ত্রিপদীর অংশ বিশেষ ঝুমুর নামে কথিত হয়।

॥ ৪ ॥

সম্প্রদায়ভেদে কীর্তনের পাঁচটি ঘরানার উদ্ভব হয়েছে—গড়েরহাটী, মনোহরশাহী, রেনেটী, মন্দারিণী ও ঝাড়খণ্ডী। গড়েরহাটী কীর্তনরীতির উদ্ভব রাজশাহী জেলায় গড়েরহাটী পরগণার অন্তর্গত খেতুরীতে। নরোত্তম দাস এই পদ্ধতির প্রবর্তক। তিনিই সর্বপ্রথম কীর্তনকে ধ্রুপদের রাগতাল যুক্ত করে প্রচার করেন। এই রীতির কীর্তনের লয় বিলম্বিত, ছন্দ দীর্ঘ, তাল ১০৮। এতে আখরের প্রাধান্য লক্ষণীয়।

বর্ধমান জেলার মনোহরশাহী পরগণার নাম থেকে মনোহরশাহী সম্প্রদায়ের নামকরণ হয়েছে। খেতুরী-প্রত্যাগত জ্ঞানদাস প্রভৃতি আরো কয়েকজন রাঢ়ের প্রাচীন কীর্তনধারার সংস্কার করে এই রীতির প্রবর্তন করেন। এই ধারায় কীর্তনের লয় অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত, রীতি খেয়ালজাতীয়, তাল সংখ্যা ৫৪, আখরের বৈচিত্র্যসম্পন্ন।

বর্ধমান জেলার রাণীহাটী পরগণায় 'রেণেটী' পদ্ধতির প্রথম উদ্ভব। এ রীতির প্রবর্তক পদকর্তা বিপ্রদাস ঘোষ। এর লয় ও মাত্রা দ্রুত ও সরল, সুর অনেক তরল, আখরের বিশেষ প্রাধান্য নেই, তাল সংখ্যা ২৬। এ রীতিকে টপ্পা গানের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

বৈষ্ণব দাস, উদ্ধব দাস এ রীতিকে বিশেষ সমৃদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু ইদানীং তা প্রায় অবলুপ্তির পথে।

মেদিনীপুরের সরকার মন্দারণের নামানুসারে মন্দারিণী পদ্ধতির নামকরণ। এটি রাঢ়ের প্রাচীন সুর। ঠুংরির ছাঁচে গ্রথিত মন্দারিণী কীর্তনের সুরের তাল সংখ্যা ৯। এ রীতি এখন প্রায় অবলুপ্ত। কীর্তনীয়া নিজস্ব পদ্ধতির সঙ্গে এ পদ্ধতির অনেক সময় মিশ্রণ করে গান করে থাকেন।

ঝাড়খণ্ডী পদ্ধতি রাঢ়ের একটি প্রাচীন সুররীতি। লোকসঙ্গীতের এই সুরকে সংস্কার করে কবীন্দ্র গোকুল এ রীতির প্রতিষ্ঠা করেন। এখন এ সুর লুপ্ত।

বৈষ্ণব পদাবলীর পরিপূর্ণ রসোপলব্ধি হয় কীর্তন গানের মাধ্যমে। ভাব, ভাষা, ছন্দ, সুর, তাল, লয় গানের আসল সম্পদ। এ সকল গুণসমৃদ্ধ পদাবলী কীর্তন-গান রসজ্ঞ শ্রোতাকে লোকোত্তর ব্যঞ্জনার সন্ধান দেয়। কীর্তনের সুরলহরী রসজ্ঞ শ্রোতাকে নিয়ে যায় পার্থিব জগৎ থেকে অপার্থিব সৌন্দর্যলোকে। এখানেই পদাবলীর সার্থকতা।

বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয়
কিছু অভিমত

অধ্যাপক শ্রীমান্ সনাতন গোস্বামী এম. এ., লিখিত 'বৈষ্ণব পদাবলী' গ্রন্থখানির কিয়দংশ পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করিলাম। বৈষ্ণব পদাবলীর মাধুর্য্য অনির্বচনীয় হইলেও শ্রীমান্ গ্রন্থকার তাহার বিভিন্ন দিক থেকে বিশ্লেষণ করিয়া যে বিচার ধারা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা প্রশংসনীয়।

বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে যে ছন্দোনর্ত্তন আছে, তাহা সংস্কৃত সাহিত্যকেও প্রভাবান্বিত করিয়াছে। সঙ্গীত, তাল ও লয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইলেও তালসহ সুরসংযোগ ও পদগুলির স্বরসংযোগে পুনঃপুনঃ আবৃত্তিজনিত যে মধুর আকর্ষণ দ্বারা মানবচিত্তকে মোহিত করে, তাহা ভক্ত শ্রোতৃগণের অবিদিত নহে।

শ্রীমান্ গোস্বামী গ্রন্থকার প্রকৃত অধিকারী হওয়ায় তাঁহার লেখনী মুখে প্রকাশিত বিশ্লেষণাত্মক বিষয়গুলি বাঙ্গলা সাহিত্যের একটি অপরিহার্য অঙ্গ এবং সঙ্গীতেরও অবশ্য-জ্ঞাতব্য সন্দর্ভরূপে গণ্য হওয়া উচিত। আমি এই শুভেচ্ছা প্রকাশ করি, এই গ্রন্থের বহুল প্রচার হউক এবং বৈষ্ণব পদাবলীর মাধুর্য্যপানে পাঠকশ্রেণী পরিতৃপ্ত হউন।

২রা অগ্রহায়ণ, ১৩৮১ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ

"জয় জগবন্ধু হরি"

'বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয়' গ্রন্থখানি শিরে ধারণ করিলাম। গ্রন্থকার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সনাতন গোস্বামী মহোদয় গ্রন্থখানি আমাকে পাঠাইয়াছেন অভিমত পাইবার আশায়। এই জাতীয় গ্রন্থ সম্বন্ধে আমাদের অভিমত দেওয়া কঠিন। মিশ্রী দ্বারা যাহাই তৈয়ারী হয় তাহাই মিষ্টি লাগে। মধুমাখা বৈষ্ণব পদ লইয়া যিনি যাহা লিখেন তাহাই মধুময় মনে হয়।

গ্রন্থকার গ্রন্থটি লিখিয়াছেন নিজের অনুভবানন্দে, কাহাকেও শিক্ষা দিবার জন্য নহে। আত্মানুভূতির সাবলীল প্রকাশ বলিয়া মধুময় বস্তু আরও মধুস্রাবী হইয়াছে।

বৈষ্ণব পদাবলীর প্রাণসর্বস্ব শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর। লেখক যে গৌরসুন্দরকে ভালোবাসিয়াছেন তাহা ঢাকিয়া রাখিতে পারেন নাই। এই ভালবাসার শক্তিতেই তিনি রাধা-প্রেমের নিগূঢ় তাৎপর্য, গৌরাবির্ভাবের অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ প্রয়োজন নিবিড় ভাবে আস্বাদন করিয়াছেন। সেই আস্বাদনের আলোকে উজ্জ্বল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়াছেন প্রাক্‌চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর বিপুল পদাবলী সাহিত্যকে। গৌরচন্দ্রিকার কৃপাচন্দ্রিকায় উদ্ভাসিত বলিয়া তাঁহার প্রত্যেকটি বিশ্লেষণ হইয়াছে, সুষ্ঠু, সুন্দর ও সুগভীর।

কবি পরিচিতি প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যের পূর্ববর্তী দুইজন ও পরবর্তী দুইজন কবির প্রতিভা ও কাব্যমাধুর্য বিশ্লেষণে লেখক যে মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা শুধু নিরবদ্য নয়, শিক্ষাপ্রদও সুখদও বটে।

বৈষ্ণব কবিরা যে কেবল কবি নহেন, মঞ্জরী আনুগত্যে লীলাকুঞ্জে প্রবিষ্ট আবিষ্ট সাধক,—এই গভীর তত্ত্বটি উপলব্ধি করিয়া অধ্যাপক মহোদয় আমাদের অন্তরঙ্গগণ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। তাই অন্তর হইতে বলিতে ইচ্ছা জাগে, গৌরকৃপাপূত ভবদীয় লেখনীমুখে আরও মধুধারা প্রবাহিত হইয়া তাপদগ্ধ জীবকে স্নিগ্ধ করুক।

মহানাম মঠ ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

নবদ্বীপ

বৈশাখী পূর্ণিমা, ১৩৮১

গ্রন্থকার বৈষ্ণব পদাবলীর পরিচয় দিতে যাইয়া বৈষ্ণব ধর্মের উদ্ভব, বিস্তার সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে যে সব শাস্ত্রবাক্যের উদ্ধৃতি দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও মনীষার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য পদাবলী সাহিত্যের এরূপ সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণায়বয়ব চিত্র এই জাতীয় গ্রন্থে প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। ভাষা সহজ ও সরল, প্রকাশ ভঙ্গিমা সুন্দর। গ্রন্থটি সুখপাঠ্য—সহজবোধ্য। পাঠের সঙ্গে সঙ্গে বক্তব্য বিষয় অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। এই বিষয়ে জিজ্ঞাসু পাঠক-পাঠিকাকে আমরা গ্রন্থপাঠে সাদর আহ্বান জানাই। পাঠে পদাবলীর তত্ত্ব ও রসাস্বাদনে তাঁহারা তৃপ্ত হইবেন। গ্রন্থটি বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্যের মূল্যবান অবদান বলিয়া গৃহীত হইবে।

শ্রীমদ্ শিশিরকুমার ব্রহ্মচারী

(শ্রীসুদর্শন / জ্যৈষ্ঠ ১৩৮১)

আপনার বই 'বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয়' পেয়েছি। বইটি বেশ ভালো হয়েছে। এতে আপনার পাঠ-পরিধি, অনুসন্ধিৎসা ও নিরলস বিদ্যাচর্চার পরিচয় আছে। বইটি ছাত্রদের খুব কাজে লাগবে।

ডঃ জীবেন্দ্রবিনোদ সিংহরায়

১৪. ১. ৭৪

'বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয়' ছাত্রদের পক্ষে খুবই উপযোগী হইয়াছে। সাধারণ পাঠকও ইহা দ্বারা উপকৃত হইবেন। সংক্ষিপ্ত হইলেও পদাবলীর রস-আস্বাদনে যে যে বিষয়ের জ্ঞান প্রয়োজন, গ্রন্থখানিতে সেগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে। গৌরচন্দ্রিকা, প্রেমতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, নায়িকা বিভাগ, কবি-পরিচয় ও কাব্যমূল্য—প্রভৃতি বিষয় বিচার তথ্যানুগ হইয়াছে। আমি বইখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী

৩. ১. ৭৪

আপনার পাঠানো বই 'বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয়' পেয়েছি। গ্রন্থখানি মনোনিবেশ সহকারে পড়লাম। আপনার সুচিন্তিত, শ্রমসাধ্য গ্রন্থ বলে ঐ বিশেষ বিষয়ে অনুরাগী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এবং আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রভূত উপকারে আসবে।

ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম

১৯. ১২. ৭৩

প্রথম বইখানি (বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয়) অবশ্যই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স এবং পোস্টগ্রাজুয়েট ক্লাশের ছাত্র-ছাত্রীদের সহায়ক গ্রন্থ (Reference Book)-রূপে তালিকাভুক্ত হতে পারে। তাছাড়া জিজ্ঞাসু পাঠকও অনেক নূতন তথ্য ও তত্ত্বের সংগে পরিচয় লাভের সুযোগ পাবেন, এটা তো নিঃসন্দেহে আনন্দের সংবাদ।

ডঃ গোলাম সাকলায়েন

১৮. ১. ৭৪

তোমার 'বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয়' গ্রন্থখানি পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আদ্যোপান্ত পড়িলাম। মনে হইল প্রধানতঃ ছাত্রদের উপর লক্ষ্য রাখিয়াই বইখানি লিখিয়াছ। ছাত্রদের বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ এই বই ছাত্রদের উপকারে লাগিবে। শিক্ষকের বিনা সাহায্যেই তাহারা পদাবলীর রস পর্য্যায় আদি বহু বিষয় শিখিতে পারিবে। কীর্তন শুনিতে ভালোবাসেন, বৈষ্ণব পদাবলী পাঠে অনুরাগ আছে, এমন বহু সাধারণ জনও বইখানি পড়িয়া উপকৃত হইবেন। তোমার রসবোধ, তথ্যনিষ্ঠা, বিশ্লেষণ নিপুণতা বইখানিকে সুপাঠ্য ও সুখপাঠ্য করিয়াছে।

ডঃ শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

সাহিত্যরত্ন, ডি. লিট

৭ই পৌষ, ১৩৮০

'বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয়' গ্রন্থে অধ্যাপক সনাতন গোস্বামী বৈষ্ণব ধর্মের গোড়ার কথা, প্রাক্ চৈতন্য যুগে বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম, শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের তাৎপর্য, গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের মূলসূত্র, প্রেমতত্ত্বের স্বরূপ, ভক্তিরসের সংজ্ঞা ও উপাদান, নায়ক-নায়িকার প্রকরণ, নায়কসখা ও নায়িকার দূতীভেদ, পদাবলীর রসপর্যায়, মুখ্য চারজন কবির পরিচয় ও 'পদাবলীর নানাদিক' পর্যায়ে কিছু প্রশ্নোত্তরমূলক আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সনাতন-বাবুর কৃতিত্ব এই যে, অল্প কথায় মোটামুটিভাবে বৈষ্ণব পদাবলীর যাবতীয় দিক নিয়ে আলোচনা সংবদ্ধ করতে পেরেছেন।

(দেশ/১৭।১১।৭৩)

ইতঃপূর্বে বৈষ্ণব দর্শন ও রসতত্ত্ব নিয়ে পণ্ডিতগণ আলোচনা করলেও তা কি ভাবে পদাবলী সাহিত্যে রূপায়িত হয়েছে, সে আলোচনা বিশেষ হয় নি। সনাতন গোস্বামীর উক্ত গ্রন্থখানি সেই অভাব অনেকখানি পূরণ করবে মনে হয়। গ্রন্থকার প্রথমে বৈষ্ণবধর্মের ঐতিহাসিক ও দার্শনিক পটভূমিকা আলোচনা করে পরে বৈষ্ণবরসতত্ত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এছাড়া পদাবলী সম্পর্কে সব তথ্যই এতে উপস্থাপিত হয়েছে। ভক্তবৈষ্ণব, জিজ্ঞাসু পাঠক ও ছাত্রছাত্রীগণ অধ্যাপক গোস্বামীর এই গ্রন্থ দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।

(যুগান্তর/১।১২।৭৩)

সনাতন গোস্বামী তাঁর 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের মূলসূত্র' ও 'শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের তাৎপর্য' শীর্ষক অধ্যায়ে নিজস্ব সনিষ্ঠ মনন ও মৌলিকতার স্বাক্ষর রাখতে পেরেছেন। বৈষ্ণব পদসাহিত্য যে কেবলমাত্র ছাত্রপাঠ্য নয়, তা যে চিরকালের সর্বশ্রেণীর জ্ঞানীগুণী

পাঠকদের অবশ্য পাঠ্য. আলোচ্যগ্রন্থ তা প্রমাণ করে। বৈষ্ণবীয় তত্ত্ব ও কাব্যত্ব—দুটির সমান মূল্যায়ন এ গ্রন্থের মর্যাদা বাড়িয়েছে। গ্রন্থটি বাস্তবিক অর্থে বৈষ্ণব সাহিত্য রসপিপাসুদের রসতৃপ্তি অনেকাংশে মেটাবে।

(অমৃত/২১।১২।৭৩)

তত্ত্ব ও সাহিত্য—এই দুইয়ের রাসায়নিক সংযোগ ঘটেছে বৈষ্ণব সাহিত্যে। সুতরাং তত্ত্বকে পাশ কাটিয়ে বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোচনা ও বিচার সুষ্ঠু হতে পারে না। অধ্যাপক গোস্বামী একাধারে ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও সাহিত্যিক ক্রম-বিবর্তনের ধারাটিকে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও সুললিত ভাষায় পাঠক সমাজের কাছে তুলে ধরেছেন। পরম নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা সহকারে এই বিশাল সাহিত্যের সঠিক আলোচনা করা এবং এর সর্বাঙ্গীন্ রূপটিকে ফুটিয়ে তোলা যে কত দুরূহ কাজ তা বিশেষজ্ঞ মাত্রই জানেন। যথার্থ পরিতোষের কথা, অধ্যাপক গোস্বামী সেই দুরূহ কাজ অত্যন্ত সীমিত পরিবেশেও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পেরেছেন। কোথাও তত্ত্বালোচনা ও রসালোচনায় স্ববিরোধিতা বা সংঘর্ষ সৃষ্টি হয় নি।

অত্যন্ত অল্প পরিসরে বৈষ্ণব-সাহিত্যের এই জাতীয় সামগ্রিক আলোচনা বড় একটা চোখে পড়ে না। গ্রন্থখানি যে পাঠক সমাজের যথোচিত সমাদর লাভ করবে, এ বিশ্বাস আমাদের আছে। আলোচ্য গ্রন্থখানি বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

(রূপমঞ্চ পত্রিকা/Dec. 1973)

প্রীতিভাজনেষু,

সম্প্রতি আমি নানা গান বাঁধা এবং সে সব গানে সুর দেওয়া নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম, তাই আপনার 'বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয়' পড়বার সময় পাইনি। আরো এই জন্যে যে, এ জাতীয় গভীর অনুভবের রাজ্যে ঢু' মেরেই ক্ষান্ত হওয়া যায় না—সাধ্যমত চেষ্টা করতে হয় সে রাজ্যে প্রবেশের 'পাশপোর্ট' জোগাড় করার। অর্থাৎ অবসর ও ঔৎসুক্য। ঔৎসুক্য আমার ছিল কিন্তু অবসর কই ? যাহোক অবশেষে শ্রীঅরবিন্দের কয়েকটি দার্শনিক নিবন্ধ ও আপনার বৈষ্ণবতত্ত্ব তথা রসালোচনা পড়বার সময় পেলাম। অনেক কথাই বলার ছিল, কেবল দুঃখ এই যে, সাতাত্তর পেরিয়ে সবকিছুই চলতে শুরু করে ঢিমা তেতালায়। তাই সংক্ষেপেই সারতে হবে—গান বাঁধার কাজ তো শেষ হয়নি, একটু ক্ষণিক ছেদ পড়েছে মাত্র।

বৈষ্ণব পদাবলীর নানা গান আমি শিখেছিলাম শ্রী নবদ্বীপ ব্রজবাসী ও শ্রী রেবতীমোহন সেনের কাছে (তিন চারটি)—গরাণহাটী, মনোহরশাহী, রেনেটি। গাইতে গভীর আনন্দ পেতাম—তবে আমার প্রিয়তম কবি চণ্ডীদাস, তারপরেই জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস। বিদ্যাপতি সম্বন্ধে আমি দো মনা। কিন্তু সে থাক্—গুণগ্রাহী ও প্রিয়ংবদ হওয়াই ভালো।

আমার মনে হয়, চণ্ডীদাসই বৈষ্ণব কবিদের মুকুটমণি। তাঁর নানা গান গাইতে চোখে জল এসেছে কতবারই। জ্ঞানদাসেরও দু'একটি গানে। কিন্তু চণ্ডীদাস প্রেমের যে গহন লোকের অধিবাসী, সে-লোকে আর কোনো বৈষ্ণব কবিই ছাড়পত্র পায়নি—জ্ঞানদাসের দু'চারটি অবিস্মরণীয় পদ ছাড়া। তাই বিদ্যাপতির কবিত্ব নিয়ে আমি মেতে উঠতে

পারিনি কোনোদিনই। তাঁর কেবল একটি গানই আমি গাইতাম সাশ্রুনেত্রে : "মাধব বহুত মিনতি করি তোয়।"

দেখুন, আমি এ-যুগের প্রজা নই। গত শতকের শেষে আমার জন্ম। তাই প্রেম, দেশ, প্রীতি সর্বত্রই আমি আদর্শকে খুঁজেছি, কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং খুঁজিনি। অবশ্য রসো বৈ সঃ—রসানাং রসতমঃ—এ সবই আমি মানি, কিন্তু নিছক কবিত্বসিন্ধুর ডুবারি হ'তে আমি নারাজ। ও আমি পারি না—মানে, রসিক হ'তে ভালো লাগলেও রসিক বলতে সচরাচর যা বোঝায়, তার আমি অনুরাগী নই। রস স্বরূপের একটু-আধটু ছিটে ফোঁটা নিয়ে আমি কী করব? আমি যে চাই তাঁর মুখোমুখি হ'য়ে চণ্ডীদাসের সুরে :

"দেহমন আদি সঁপেছি কালিয়া কুলশীল জাতি মান।"

রস রস, ভাব ভাব, কবিত্ব কবিত্ব বলতে আমার প্রাণে উচ্ছ্বাসের ঢেউ খেলে যায় না : একদা আমি একটি গানে গেয়েছিলাম :

তোমায় কী বলো বলিব শ্যামল? বলিবার কথা কিছু কি আছে?
একই কথা শুধু বলি তাই বঁধু : তনুমন প্রাণ তোমায় যাচে।
তনু গায় : প্রতি কণিকা আমার
তোমারি পূজার হোক দীপাধার
জ্বালায়ে নামের শিখাটি অপার
গাহিবে উছলি : "আছে সে আছে,
সুদূর আকাশে শুধু থাকে না সে, মাটির বুকে ও রাজে সে রাজে।"
মন গায় : "প্রতি চিন্তা ভাবনা
সাধিবে চিন্তামণির সাধনা
কেন পুছি : তারে পাব কি পাব না?
কান পেতে শোন্—মুরলী বাজে।
লোক-লাজভয়—বিদায়ে প্রণয়ব্রজে আয় ছেড়ে মিথ্যা কাজে।"
প্রাণ গায় : যত বেদনা বিষাদ
সোনার—হরিণ—কামনা—প্রসাদ
যত অশান্তি জ্বালা অবসাদ
হবে লয় অবগাহন মাঝে :
প্রেম যমুনায় ডুব দিতে পায় ভয় শুধু হায় সে—জানে না যে।

এ হেন ব্যাকুল শরণার্থী বিদ্যাপতির কবিত্বে কতটুকু পথের পাথেয় পেতে পারে বলুন? তাই আমাকে খারিজ করে দিন বৈষ্ণব পদাবলীর বারো আনার অনধিকারী বলে, চণ্ডীদাস চণ্ডীদাস চণ্ডীদাস—একমেবাদ্বিতীয়ম—আমার কাছে।

* * * *

কিন্তু তা বলে যদি ভেবে বসেন বৈষ্ণব কবিতায় আমি থেকে থেকে ডুব দিতে চেষ্টা করিনি তাহলে আমার প্রতি অবিচার করা হবে। আপনার নানা উচ্ছ্বাসে সাড়া দিতে না পারলেও আমি কল্পনা করতে পারি—কেন আপনার মনে নানা বৈষ্ণব পদাবলী রঙের ঢেউ তুলে আনন্দের পাড় ভেঙেছে। কিন্তু আপনাকে আমি হিংসা করিনা, হিংসা করি রামপ্রসাদকে যিনি গেয়েছিলেন :

খুলে দে মা চোখের ঠুলি, দেখি তোর ঐ অভয়পদ।
প্রসাদ মা চায় ঠাঁই রাঙা পায় করিস নে তায় আশাহত॥

কিন্তু লক্ষ্মীটি, তা বলে বেরসিক বলে আমাকে দেগে দেবেন না, আপনার বইটির নানা গুণে আমি সত্যিই মুগ্ধ হয়েছি। সব সময়ই মনের তার উঁচু সুরে বাঁধা থাকে না। যখন নানা বই পড়ি তখন তাদের রসালতায় রস পাই বৈ কি—কিন্তু পেয়ে দুঃখ পাই। মনে পড়ে এক পরম ভাগবতের কথা (যিনি সমাধিস্থ হয়ে মহাপ্রয়াণ করেছেন কয়েক বৎসর পূর্বে): "কবে কৃষ্ণকে পাবেন ? যেদিন কৃষ্ণ ছাড়া আর কোন প্রসঙ্গেই শুধু সাড়া না দেওয়া নয়—যন্ত্রণা হবে শুনতে অকৃষ্ণকথা—কেবল সেদিনই তাঁকে পাবেন।" আমার কেবল মনে হয় সেদিন আমার কি কখনো হবে—এমন জগৎ ছাড়া কৃষ্ণাকুলতা—মা'র চরণে নিজেকে সঁপে দিয়ে বলতে পারা মন মুখ এক ক'রে (আমি শ্যাম ও শ্যামাকে এক করে দেখি না) :

ডাকতে হবে শিশুর মতই কান্না কেঁদে : 'আয় মা কাছে।'
মা'র আদরে দুলব যতই মিলবে মাকে বুকের মাঝে।
মায়ার বাঁধন কাটবে তখন—পড়বে খ'সে চোখের ঠুলি।
মা-কে বরণ করব যখন পড়ে মায়ের নামমাদুলি।
(এ গানটি মাত্র তিন সপ্তাহ আগে বেঁধেছি, পাঠালাম আলাদা।)

হয়ত অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন—এর নাম কি আপনার মূল্যবান বইটির সমালোচনা ? না, নয়। তবে সমালোচক আমি নই—আমি চাই বন্ধুলাভ। রামকে যদি না পাই, তবে যদুকে নিয়ে ঘর করতে আমি নারাজ।

তবু আপনাকে সত্যি সত্যিই প্রশংসা করি—আপনার বৈষ্ণব কাব্যোৎসাহের জন্য। এ বিরল গুণ কজনার থাকে এ নাস্তিক যুগে ? হলই বা ডাইলিউট—কিন্তু "স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।" আপনার উৎসাহ স্বল্প নয়, অনল্প। এমন যত্ন নিয়ে কজন বৈষ্ণব সাহিত্য পড়ে, গবেষণা করে ; দেখতে চায় দর্শনীয়কে, শোনাতে চায় শ্রোতব্য-কে ? ভাষাও সুন্দর। তবে সমাসবদ্ধ নানা পদ আর একটু কম হলে ভালো হত, যথা (২০৫ পৃঃ) "মানবজীবনোৎকৃষ্টতা অননুভূত" থাকে না। এ ধরণের গুরুগম্ভীর ভাষায় আমার মন প্রতিহত হয়—যদিও ক্ষেত্রবিশেষে দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদ সুষ্ঠু একথা আমি মানি। তাই এ মূল্যবান গবেষণাবহুল বইটির ভবিষ্যৎ সংস্করণে ভাষা আর একটু অসংস্কৃত ঘরোয়া

বাংলায় লেখা হবে এ আশা করবই করব। আরো অনেক কথা বলার ছিল, কিন্তু আর না, গানের সুর নিয়ে বসতেই হবে। ইতি—

ভবদীয় আন্তরিক গুণগ্রাহী শ্রীদিলীপকুমার রায়।

পুঃ। পিতৃদেবের চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে আপনার অনেক মন্তব্যেই আমি সায় দিই, কেবল আমার মনে হয় আসল কথাটিই নেই—যে, তাঁর নাটক পড়লে মন উন্নত হয়, প্রাণ পবিত্র হয়। তাঁর একটি কবিতায় আছে :

পরের দুঃখে কাঁদতে পারা—তাহাই ভবে নরম নয় :
মহৎ দেখে কাঁদতে শেখা—তবেই কাঁদা বন্ধ হয়।

কিন্তু একথা এ-কলাসর্বস্ব যুগে কাকে বলব ? ইতি—

শ্রীদিলীপকুমার রায়

ডঃ সনাতন গোস্বামীর অন্যান্য বই :

বাংলা একাঙ্ক নাটক : রূপ ও রূপকার
কবি ভারতচন্দ্র
বাংলা নাটকের আলোচনা
সম্পাদিত গ্রন্থ :
গৌড়বঙ্গ সংস্কৃতি ও শ্রীচৈতন্যদেব
বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয়
বলিদান
মেবার পতন
প্রসঙ্গ : শ্রুতিনাটক
নির্বাচিত নাট্যসংগ্রহ (তুলসী লাহিড়ী)
ছেঁড়া তার (,, ,,)
দেবী (,, ,,)
বাহুপরী (মন্মথ রায়)

নির্বাচিত একাঙ্ক সংগ্রহ
একাঙ্ক নাট্যগুচ্ছ
আরো একাঙ্কিকা
প্রমীলা একাঙ্কগুচ্ছ
একাঙ্ক সংগ্রহ
অন্য দিগন্ত (১—৫)
যুগ্ম-সম্পাদনা :
কুলীন কুলসর্বস্ব (রামনারায়ণ তর্করত্ন)
বাবু (অমৃতলাল বসু)